বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বদরুল ইমাম

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

(Mineral Resources of Bangladesh)

ড: বদরুল ইমাম
প্রফেসর
ভূতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

BANSDOO Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪০৩/ডিসেম্বর ১৯৯৬

বাএ (৯৬-৯৭ পাঠ্যপুস্তক : ভৌ ও প্র : ৪) ১৪৮৮

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান

ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ
ভৌ ও প্র ১৪৪

DOC Library
Accession No. 16394
Date … Sign …

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
শওকাতুজ্জামান

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

BANGLADESHER KHANIZ SAMPAD (Mineral Resources of Bangladesh) by Dr. Badrul Imam. Professor, Department of Geology. Dhaka University. Dhaka. Published by Gholam Moyenuddin. Director, Textbook Division. Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, December 1996. Price : Taka 80.00.

ISBN-984-07-3497-0

উৎসর্গ

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর
গুলিতে নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের
সহপাঠী বন্ধু বরদা কান্ত তরফদার-এর উদ্দেশে

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় ভূতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের স্বল্পতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এদেশের খনিজ সম্পদের উপর কোনো গ্রন্থ নেই। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ গ্রন্থের প্রকাশনা উপরিউক্ত শূন্যতা পূরণ করতে সহায়ক হবে বলে আশা করি। গ্রন্থটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যসূচির বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি রচনায় এদেশের ভূতাত্ত্বিক কার্যক্রম এবং তার ফলাফলের উপর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এবং রিপোর্টসমূহের সংগৃহীত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে দেশীয় ভূতাত্ত্বিক সংস্থা, যেমন বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাপেক্স, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এবং ব্যুরো অব মিনারেল ডেভেলপমেন্টের ভূবিজ্ঞানিদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এসব সংস্থার চলমান অনুসন্ধান এবং উৎপাদন প্রকল্পসমূহের উপর তথ্যাদি সংগ্রহে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ভূবিজ্ঞানিগণের সঙ্গে আলোচনা করে আমি উপকৃত হয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের 'ডেল্টা স্টাডি সেন্টার' এর পরিচালককে এ কেন্দ্রের কম্পিউটার সুবিধাদি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ভূতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ হুমায়ুন আখতার কম্পিউটার প্রোগ্রামে গ্রন্থটির চিত্রসমূহ পরিমার্জনা করার কাজে সর্বতোভাবে সহায্য করেছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিভাগের সদস্য জনাব সুশীল কুমার দত্ত এবং জনাব মোঃ মজিবুর রহমান ভূইয়া যথাক্রমে কার্টোগ্রাফী এবং টাইপিং কাজে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই

গ্রন্থটি লেখার জন্য আমি অনেক দেশী-বিদেশী লেখক ও গবেষকের গ্রন্থের ও গবেষণা পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। আমি তাঁদের কাছে ঋণী। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে পুস্তকটি যাদের উদ্দেশ্যে প্রণীত হলো এটি তাদের কিছুটা উপকারে এলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। গ্রন্থটির মানোন্নয়নে যে-কোনো গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

বদরুল ইমাম

web

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ সূচনা ১--৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ **বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** ৫--১৫

২.১ ভূমিকা ৫

২.২ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ৬

২.৩ বাংলাদেশের স্তরক্রমবিন্যাস ১০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ **পেট্রোলিয়াম** ১৬--৪৫

৩.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ১৬

৩.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ ১৯

৩.৩ বাংলাদেশের খনিজ তেল সম্পদ ৩৬

চতুর্থ অধ্যায় ঃ **কয়লা ও পীট** ৪৬--৭৩

৪.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ৪৬

৪.২ বাংলাদেশের কয়লা সম্পদ ৪৯

৪.৩ বাংলাদেশের পীট সম্পদ ৬৯

পঞ্চম অধ্যায় ঃ **চুনাপাথর** ৭৪--৮৩

৫.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ৭৪

৫.২ বাংলাদেশের চুনাপাথর সম্পদ ৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ **কঠিন শিলা** ৮৪--৯৮

৬.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ৮৪

৬.২ বাংলাদেশের কঠিন শিলা সম্পদ ৮৫

সপ্তম অধ্যায় ঃ **সৈকত বালি ভারি মণিক** ৯৯--১০৮

৭.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ৯৯

৭.২ বাংলাদেশের সৈকত বালির ভারি মণিক প্লেসার ১০১

অষ্টম অধ্যায় : **চীনামাটি** ১০৯--১১৭

৮.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ১০৯

৮.২ বাংলাদেশে চীনামাটি সম্পদ ১১০

নবম অধ্যায় ঃ **কাচবালি** ১১৮--১২৪

৯.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ১১৮

৯.২ বাংলাদেশের কাচবালি সম্পদ ১১৯

দশম অধ্যায় ঃ **ধাতব খনিজ** ১২৫--১৩০

১০.১ ভূমিকা ১২৫

১০.২ প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলায় ধাতব খনিজের সম্ভাবনা ১২৬

১০.৩ সিলেট এলাকায় ইউরেনিয়াম সম্ভাবনা ১২৮

একাদশ অধ্যায় ঃ **ভূগর্ভস্থ পানি** ১৩১--১৪৩

১১.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি ১৩১

১১.২ বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ ১৩৩

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ১৪৪--১৫০

পরিশিষ্ট ১৫১--১৫৯

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

(Introduction)

একটি দেশের নিজস্ব সম্পদের বহর তার আর্থসামাজিক অবস্থা তথা আন্তর্জাতিক মান-মর্যাদা নির্ণয় করে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহের অন্যতম। কৃষিপ্রধান সীমিত সম্পদের দরিদ্র দেশ হিসেবে বহির্বিশ্বে এর পরিচিতি রয়েছে। অথচ এদেশের ভূ-অভ্যন্তরে নানান ধরনের খনিজ সম্পদের বহর নিতান্ত কম নয়। অতীতের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কারণে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ আহরণের যথেষ্ট উদ্যোগ কখনই গ্রহণ করা হয়নি, বরং তা অবহেলিত হয়েছে। আজ অবধি সম্পাদিত ভূতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে এদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, পীট, চুনাপাথর, ভারি মণিক, কঠিন শিলা, চীনামাটি (কেয়োলিন ক্লে) ও কাচবালিসমূহ খনিজ পদার্থের উল্লেখযোগ্য মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে। অধিকন্তু ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এদেশের ভূ-অভ্যন্তরে উপরিউক্ত খনিজ সম্পদের আরো অনেক মজুত থাকবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

এদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ও ব্যবহার দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা সম্পূর্ণটাই নিজস্ব মজুত থেকে মেটাতে সক্ষম হচ্ছে এবং এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিকট ভবিষ্যতেও বহাল থাকবে। দেশে আবিষ্কৃত ১৯টি গ্যাসক্ষেত্রসমূহের মধ্যে ৭টি থেকে ইতোমধ্যে গ্যাস উৎপাদন চলেছে। জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের এই অবদানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৮৮% ভাগই প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন মূলত গ্যাস নির্ভর হওয়ার ফলে সরকারের তেল আমদানি খাতে প্রতি বছর বৈদেশিক মুদ্রায় প্রায় ২০০০ কোটি টাকার সাশ্রয় হয়। দেশে সার উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবেও প্রাকৃতিক গ্যাস বিশেষ এক ভূমিকা পালন করছে।

এদেশের উত্তর অঞ্চলে ভূগর্ভে বিশাল পরিমাণ উন্নতমানের কয়লা এবং কঠিন শিলার মজুত প্রমাণিত হয়েছে। ইতোমধ্যে জামালগঞ্জ, বড়পুকুরিয়া এবং খালাশপীরে কয়লাক্ষেত্রসমূহে কয়লার মজুত নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে বড়পুকুরিয়ার কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে সেখানে একটি ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই খনি থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লা উত্তোলন শুরু

হলে বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। একইভাবে উত্তরবঙ্গের মধ্যপাড়ায় স্বল্প গভীরতায় কঠিন শিলার যে বিশাল মজুত পাওয়া গিয়েছে, তা উত্তোলনের লক্ষ্যে সেখানে একটি ভূগর্ভস্থ খনি স্থাপন বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। মধ্যপাড়া কঠিন শিলার এ খনি থেকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কঠিন শিলা উৎপাদন শুরু হলে বাংলাদেশ কঠিন শিলা সম্পদেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। উত্তরবঙ্গের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি দুটি এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক তথা অবকাঠামোগত পরিসরে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করবে বলে আশা করা যায়।

এদেশের প্রথম আবিষ্কৃত তেলক্ষেত্র হরিপুর থেকে উৎপাদিত তেলের পরিমাণ দেশীয় চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য বটে, তবে হরিপুর তেলক্ষেত্রের যথার্থ মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন এখনও সম্পন্ন করা হয় নি। ইতোমধ্যে আরো একটি এলাকায় অর্থনৈতিক তেলের মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভূবিজ্ঞানিগণ এদেশের ভূগর্ভে অন্যান্য স্থানেও তেল মজুত আবিষ্কারের আশা ব্যক্ত করেছেন। এখন পর্যন্ত অবশ্য এদেশের তেল চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণটাই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গে ভূগর্ভে চুনাপাথরের বিশাল মজুত আবিষ্কার হওয়ার পর তা উত্তোলনের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়, অবশ্য এই খনি স্থাপন প্রকল্প বৈদেশিক আর্থিক সাহায্যের অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। সিলেট মেগালয় সীমান্ত বরাবর কিছু অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে চুনাপাথরের মজুত পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে চুনাপাথর উৎপাদিত হয়।

দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উপকূল ও সৈকত বরাবর মূল্যবান ভারি মণিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং তা উত্তোলনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়। এছাড়াও দেশে একাধিক এলাকায় ভূপৃষ্ঠে এবং অতি স্বল্প গভীরতায় চীনামাটি (কেয়োলিন ক্লে), কাচবালি ও পীটের উল্লেখযোগ্য মজুত আবিষ্কার হয়েছে।

১.১ চিত্রে বাংলাদেশে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক খনিজ সম্পদসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হয়েছে এবং সারণি ১ -এ সম্পদসমূহের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

এ পুস্তকে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভে কোনো স্থানে খনিজ সম্পদের অবস্থানসমূহ মূলত ঐ স্থানের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ কারণে এ পুস্তকে প্রথমত এদেশের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তথা ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, গঠন, স্তরবিন্যাস ও ইতিহাস সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি খনিজ সম্পদ সম্পর্কে একটি করে অধ্যায় রচিত হয়েছে এবং এ অধ্যায়সমূহে খনিজ সম্পদের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কিত মৌলিক পরিচিতি প্রদান করে বাংলাদেশে তার অবস্থান, মজুত, প্রকৃতি, ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

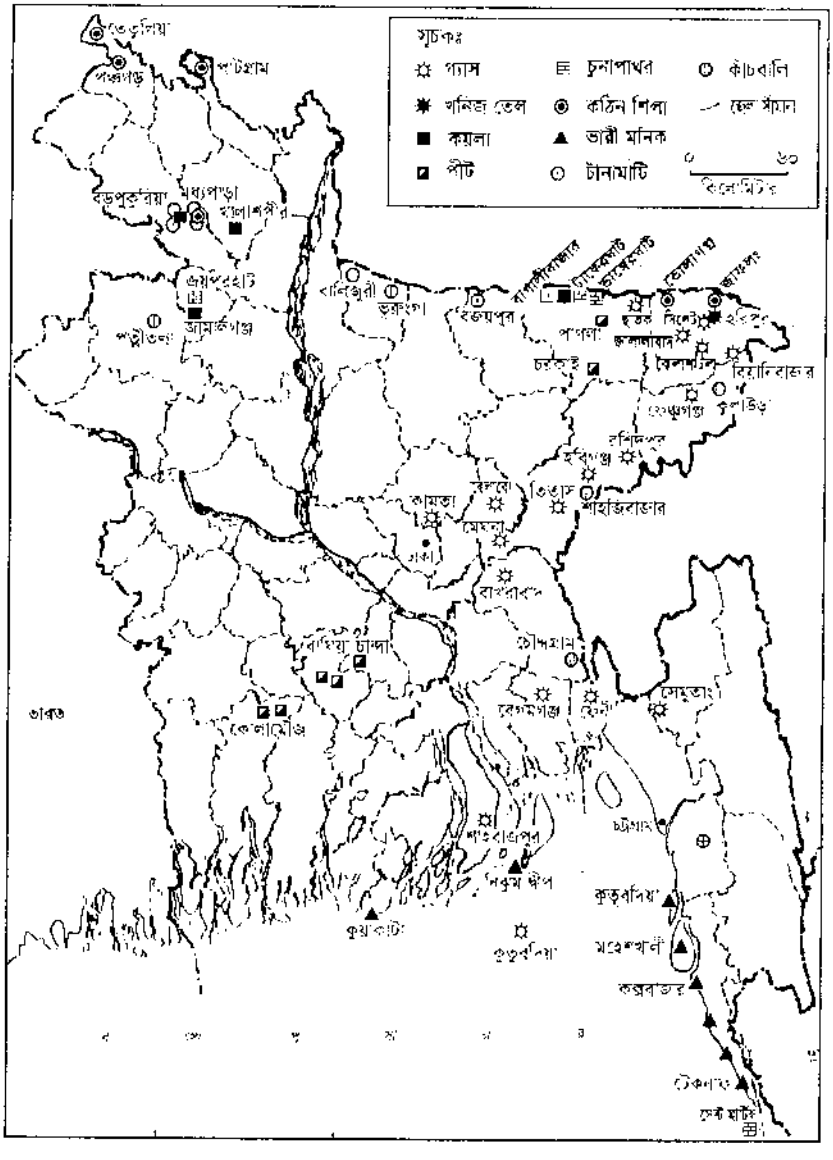

চিত্র ১.১ ঃ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান।

সারণি ১ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান।

মহাযুগ	মিলিয়ন বছর	যুগ	উপযুগ	স্তর এককে	খনিজ সম্পদ
নবজীবীয়	২	কোয়াটারনারি	হলোসিন	পলিমাটি	ভারি মণিক,কাচবালি, কঠিন শিলার নুড়ি, ভূগর্ভস্থ পানি
			প্লেইসটোসিন	মধুপুর ক্লে সংঘ	
		টারশিয়ারি	প্লায়োসিন	ডুপিটিলা সংঘ	চীনামাটি, ভূগর্ভস্থ পানি
				তিপাম সংঘ	
			মায়োসিন	বোকাবিল সংঘ	প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল
				ভুবন সংঘ	প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল
			অলিগোসিন	বরাইল দল	
			ইয়োসিন - পেলিয়োসিন	কোপিলি সংঘ	
				সিলেট লাইমস্টোন সংঘ	চুনাপাথর
				তুরা সংঘ	কয়লা
মধ্যজীবীয়	৬৫	ক্রিটেশাস			
		জুরাসিক			
	২৩০	ট্রায়াসিক			
পুরাজীবীয়		পারমিয়ান		পাহাড়পুর সংঘ	বিটুমিনাস কয়লা
		কার্বোনিফেরাস			
		ডিভোনিয়ান			
		সিলুরিয়ান			
		অর্ডোভিসিয়ান			
		ক্যামব্রিয়ান			
প্রাক-ক্যামব্রিয়ান	৫৭০				কঠিন শিলা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Geological Characters of Bangladesh)

২.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। এদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীধারা বাহিত পলিমাটির সাহায্যে গঠিত সমতলভূমি দিয়ে আবৃত। কেবল পূর্বদিকে সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকার পূর্বাংশ বরাবর পাহাড়শ্রেণি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এদেশের অন্যতম ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদেশের ভূপৃষ্ঠের নিচে বিশাল পুরুত্বের পলল্লিক শিলাস্তরের বিন্যাস যার অধিকাংশই নবজীবীয় মহাযুগে (Cenozoic era) সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির গঠন ও উদ্ভব ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে এই নবীন যুগের ঘটনা।

বাংলাদেশ বৃহত্তর বেঙ্গল বেসিনে (Bengal Basin) অবস্থিত। বেঙ্গল বেসিন পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং উত্তরে শিলং মালভূমির পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বরাবর বিস্তৃত। এ বেসিন মূলত টারশিয়ারি যুগের (Tertiary period) শিলাস্তর দিয়ে পরিপূর্ণ যদিও উত্তরবঙ্গে ভূগর্ভে অতি প্রাচীন পারমিয়ান যুগের (Permian period) শিলাস্তর বিদ্যমান। বেঙ্গল বেসিনের উৎপত্তি হয়েছে ভারতীয় প্লেট (Indian plate) এবং এশিয়ান প্লেটের (Asian plate) সংঘর্ষের কারণে। ইয়োসিন উপযুগের (Eocene epoch) শেষাংশে এ সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকে একদিকে টেথিস সাগরের বিলুপ্তি এবং অপর দিকে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি – এই দুইটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বেঙ্গল বেসিনের জন্ম হয় এবং ক্রমাগতভাবে তা হিমালয় পর্বত থেকে আগত নদীধারা কর্তৃক বাহিত পলিমাটি দিয়ে পূরণ হয়ে বঙ্গ বদ্বীপের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে প্লায়োসিন উপযুগে (Pliocene epoch) এই বেসিনের পূর্বাংশ ভূ-আন্দোলনে আলোড়িত হলে সেখানে পাহাড়শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এ অংশটি ছাড়া বঙ্গ বদ্বীপের বৃদ্ধি ক্রমাগতভাবে দক্ষিণ দিকে ঘটতে থাকে যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

খনিজ সম্পদের উৎস এবং অবস্থানসমূহ ঐ স্থানের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ও স্তরবিন্যাস তথা ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুতসমূহ মূলত পূর্বাংশে ফোল্ড বেল্ট (fold belt) এলাকায় নবীনতর মায়োসিন - প্লায়োসিন উপযুগের শিলাস্তরে অবস্থিত। আবার এদেশের কয়লা সম্পদের

বিশাল মজুতসমূহ একটি ভিন্নতর ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে যথা উত্তরবঙ্গে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান প্লাটফর্ম (platform) এলাকায় অতি প্রাচীন পারমিয়ান যুগের শিলাস্তরে বিদ্যমান। সুতরাং বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করার শুরুতে এদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন, স্তরবিন্যাস এবং ইতিহাসের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করা আবশ্যক।

২.২ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো

বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিক গঠন (geological framework) অনুযায়ী দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় (বাখতিন ১৯৬৬ ; গুহ ১৯৭৮ ; রেইমান ১৯৯৩); যথা ঃ

(১) প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় প্লাটফর্ম (Precambrian Indian platform) অঞ্চল,

(২) বেসিন (basin) বা জিওসিনক্লাইন (geosyncline) অঞ্চল ;

উক্ত দুটি বিভাগের সংযোগস্থল বরাবর উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত সরু মধ্যবর্তী অঞ্চলকে হিঞ্জ জোন (hinge zone) বা কব্জা অঞ্চল বলা হয় (চিত্র ২.১)।

২.২.১ প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় প্লাটফর্ম ঃ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলটি রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা অঞ্চল বরাবর বিস্তৃত। এ অঞ্চলের বিশেষত্ব হলো এটি ভূগাঠনিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল (structurally stable) এবং সেহেতু এর উপর সৃষ্ট পালনিক শিলাস্তরের পুরুত্ব সীমিত এবং বেসিন অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। এখানে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার (basement rock) উপর সর্বনিম্ন প্রায় ১৩০ মিটার পুরু পালনিক শিলাস্তর রয়েছে যার পুরুত্ব ক্রমাগতভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অঞ্চলটি দক্ষিণে হিঞ্জ জোন এবং উত্তরে সাব হিমালায়ান ফোরডীপ (Sub Himalayan foredeep) দিয়ে সীমাবদ্ধ। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলের প্রধান দুটি উপভাগ হলো ঃ (ক) রংপুর স্যাডল (Rangpur saddle) এবং (খ) বগুড়া শেলফ (Bogra shelf) (চিত্র-২.১)।

(ক) রংপুর স্যাডল ঃ এ অঞ্চলটি পূর্বে রংপুর থেকে পশ্চিমে দিনাজপুর অঞ্চল বরাবর বিস্তৃত। এর বিশেষত্ব হলো এখানে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলা অতি অল্প গভীরতা তথা ভূপৃষ্ঠের নিচে মাত্র ১৩০ মিটার থেকে প্রায় ৭৫০ মিটার গভীরতায় বিদ্যমান। এ অঞ্চলটি বস্তুত পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ভারতীয় শিল্ড (Indian shield) এবং পূর্বে মেঘালয়ের শিলং শিল্ড (Shillong shield) এর সংযোগকারী অংশ -- যা মূলত কেবল স্বল্প পুরুত্বের নবীন শিলা দিয়ে আবৃত হয়েছে। সে হিসেবে এ অঞ্চলটিকে গারো-রাজমহল গ্যাপ (Garo-Rajmahal gap) নামে অভিহিত করা হয়; খান (১৯৯১) এই অঞ্চলটিকে দিনাজপুর শিল্ড (Dinajpur shield) হিসেবে নামকরণ করেন। এই অঞ্চলটিতে মধ্যপাড়া স্থানে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কেলাসিত ভিত শিলার

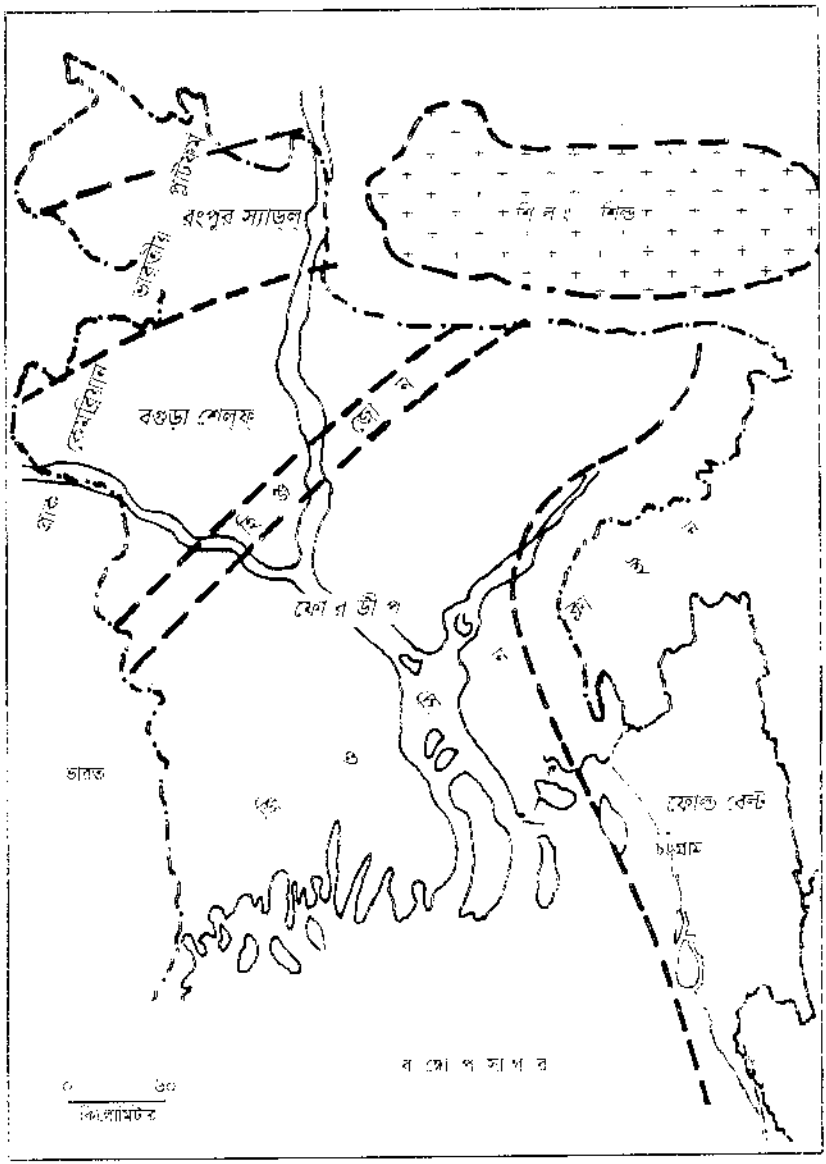

চিত্র ২.১ ঃ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক কাঠামোর বিভাগসমূহ।

(Precambrian crystalline basement) সর্বনিম্ন গভীরতা মাত্র ১২৮ মিটার এবং সেহেতু মধ্যপাড়া স্থানে এ কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য একটি খনি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রংপুর সাউল অঞ্চলটিতে একাধিক চ্যুতি দিয়ে সীমাবদ্ধ গ্রাবেন (graben) জাতীয় বেসিনসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে এবং এই বেসিনসমূহে পারমিয়ান যুগের গন্ডোয়ানা শিলাস্তর (Gondwana rocks) সুরক্ষিত রয়েছে। এ গন্ডোয়ানা শিলাস্তরসমূহ কয়লাবহ এবং এখানে বিশাল পরিমাণ কয়লার মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া নামক স্থানে স্বল্প গভীরতায় প্রাপ্ত এরকম একটি কয়লা মজুত থেকে কয়লা আহরণের জন্য বর্তমানে এখানে একটি কয়লা খনি স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

(খ) বগুড়া শেলফ ঃ এ অঞ্চলটি রংপুর সাউলের দক্ষিণে অবস্থিত এবং এটি দক্ষিণে হিঞ্জ জোন দিয়ে সীমাবদ্ধ (চিত্র ২.১)। প্রায় ১২০ কিলোমিটার প্রশস্ত এ অঞ্চলটি জামালপুর, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া বরাবর বিস্তৃত। এ অঞ্চলটিকে ফোরল্যান্ড শেলফ (foreland shelf) হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

এ অঞ্চলে প্রাক-কামব্রিয়ান ভিত এবং তার উপর অবস্থিত নবীনতর শিলাস্তরসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু। সিলেট চুনাপাথর স্তরে (Sylhet Limestone strata) ১ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি পরিমাণ এ ঢাল সাইসমিক জরিপের সাহায্যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এ অঞ্চলে পাললিক শিলাস্তরের পুরুত্ব উত্তরাংশে ১ থেকে ২ কিলোমিটার এবং তা দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়েছে।

বগুড়া শেলফ অঞ্চলে শিলাস্তরসমূহে ভাঁজজাতীয় ভূতাত্ত্বিক কাঠামো অনুপস্থিত, বরং এখানে একাধিক চ্যুতি (fault) এবং চ্যুতি দিয়ে সীমাবদ্ধ গ্রাবেন (graben) বেসিন রয়েছে। এ গ্রাবেন বেসিনসমূহে কয়লাস্তর সংবলিত পারমিয়ান যুগের গন্ডোয়ানা শিলাস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা মজুত এর একটি উদাহরণ। বগুড়া শেলফ অঞ্চলের দক্ষিণ সীমানায় শিলাস্তরের ঢাল হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়েছে যা হিঞ্জ জোনের অবস্থান নির্ধারণ করে। সমগ্র বেঙ্গল বেসিন বরাবর উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত ২৫ কিলোমিটার প্রশস্ত এই হিঞ্জ জোন বগুড়া শেলফ অঞ্চলকে দক্ষিণে অবস্থিত বেসিন বা জিওসিনক্লাইন অঞ্চল থেকে আলাদা করে।

২.২.২. বেসিন বা জিওসিনক্লাইন ঃ হিঞ্জ জোনের দক্ষিণে বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং পূর্বাংশ বরাবর অবস্থিত বেসিন বা জিওসিনক্লাইন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে পাললিক শিলাস্তরের অত্যধিক পুরুত্ব যা সাধারণভাবে ১২ থেকে ১৫ কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ প্রায় ২০ কিলোমিটারেরও বেশি পুরু। বেসিন অঞ্চলে পাললিক শিলাস্তরের নিচে মহাদেশীয় ভিত শিলার (continental basement) পরিবর্তে মহাসাগরীয় ভিত শিলার (oceanic basement) উপস্থিতি এর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখানে বিশাল পুরুত্বের পাললিক শিলাস্তরসমূহ মূলত নবজীবীয় মহাযুগের

যদিও তার নিচে কিছু ক্রিটেশাস যুগের (Cretaceous period) শিলাস্তর রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বেসিন অঞ্চলে উপরিউক্ত শিলাস্তরের চেয়ে প্রাচীন মধ্যজীবীয় (Mesozoic era) বা পুরাজীবীয় (Paleozoic era) কোনো শিলাস্তরের উপস্থিতি নেই। বেসিন বা জিওসিনক্লাইনাল অঞ্চলকে মূলত দুটি উপভাগে ভাগ করা হয় ঃ (ক) ফোরডিপ (foredeep) অঞ্চল এবং (খ) ফোল্ড বেল্ট (fold belt) বা ভাঁজ অঞ্চল (চিত্র ২.১)।

(ক) ফোরডিপ অঞ্চল ঃ এ অঞ্চলটি হিঞ্জ জোন অঞ্চল থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এটি সিলেট অঞ্চলসহ বঙ্গবদ্বীপের মূল অংশ তথা ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী এলাকা হয়ে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপান অঞ্চল (continental shelf) অন্তর্ভুক্ত করে। ফোরডিপ অঞ্চলটি পূর্বদিকে পাহাড়ি বা বন্ধুর ফোল্ড বেল্ট (fold belt) অঞ্চল দিয়ে সীমাবদ্ধ। ফোরডিপ অঞ্চলটি উত্তরে প্রায় ২০০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার প্রশস্ত। এ অঞ্চলটি মূলত তলায়মান এবং এর কোনো কোনো অংশের তলিয়ে যাবার হার (rate of subsidence) উল্লেখযোগ্য-- যেমন সিলেট উপবেসিন (sub basin)। বেঙ্গল বেসিনে সর্বোচ্চ প্রায় ২২ কিলোমিটার পুরু পাললিক শিলাস্তরের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের মহীসোপান অঞ্চলে অবস্থিত (কারি ১৯৯১)। এই বিশাল শিলাস্তরসমূহের একটি অন্যতম অংশ জমা হয়েছে মায়োসিন-প্লায়োসিন উপযুগে (Miocene-Pliocene epoch) বিদ্যমান বদ্বীপ পরিবেশে যা বর্তমান বঙ্গবদ্বীপেরই পূর্বসূরি।

বেঙ্গল ফোরডিপ অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক কাঠামোসমূহ মূলত ভাঁজজাতীয় (folded) এবং এ ভাঁজসমূহ অতি মৃদু এবং সুপ্ত প্রকৃতির। সাইসমিক জরিপে শনাক্তকৃত এ ভাঁজ-সমূহকে কেবল ভূ-অভ্যন্তরেই শনাক্ত করা যায় এবং এদের মৃদু গঠন ভূপৃষ্ঠে বহিঃপ্রকাশ ঘটায় নি বিধায় এ অঞ্চল মূলত সমতল হিসেবে বিরাজমান। এ অঞ্চলের সুপ্ত ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ (anticlines) খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ফাঁদ হিসেবে উল্লেখযোগ্য এবং ইতোমধ্যেই এরকম বেশ কয়েকটি ঊর্ধ্বভাঁজে শিলাস্তরে প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখযোগ্য মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে -- যেমন কামতা, বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া ইত্যাদি গ্যাসক্ষেত্র। এ অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের নিচে অতি স্বল্প গভীরতায় বর্তমান যুগের পলিস্তরে (Recent alluvium) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পীটের (peat) মজুত পাওয়া গিয়েছে।

(খ) ফোল্ড বেল্ট বা ভাঁজ অঞ্চল ঃ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চলটি ভাঁজ অঞ্চল বা ফোল্ড বেল্ট নামে পরিচিত। সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলের পূর্বাংশ, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে বিপুল পুরুত্বের পাললিক

শিলাস্তরসমূহে ভাঁজ (fold) সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাঁজসমূহ ঊর্ধ্বভাঁজ (anticline) এবং নিম্নভাঁজ (syncline) হিসেবে যথাক্রমে পাহাড় ও উপত্যকা আকারে ভূপৃষ্ঠে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত ফোল্ড বেল্ট উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত একের পর এক ঊর্ধ্বভাঁজ এবং নিম্নভাঁজ দিয়ে গঠিত। এ ভাঁজসমূহের তীব্রতা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমাগতভাবে বেড়েছে এবং এর ফলে পূর্বাংশ পশ্চিমাংশের তুলনায় অধিকতর উচ্চতা ও বন্ধুরতা লাভ করেছে।

ফোল্ড বেল্ট বা ভাঁজ অঞ্চলের পাললিক শিলাস্তরসমূহ ফোরডিপ (foredeep) অঞ্চলের মতই মূলত নবজীবীয় মহাযুগের (Cenozoic era)। এখানে পাহাড় শ্রেণি তথা ঊর্ধ্বভাঁজসমূহে মায়োসিন-প্লায়োসিন উপযুগের শিলাস্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত (exposed)। ফোল্ড বেল্ট অঞ্চলের ভাঁজসমূহ ক্রমাগতভাবে পশ্চিম দিকে মৃদু হয়ে ফোরডিপ অঞ্চলের সাথে মিশে গেছে। পূর্বদিকে এ অঞ্চল বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে নাগালুসাই পর্বতমালা বরাবর যুক্ত হয়েছে।

ফোল্ড বেল্টের ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ পেট্রোলিয়াম গ্যাস ও তেলের ফাঁদ হিসেবে উৎকৃষ্ট এবং এখানে মায়োসিন প্লায়োসিন শিলাস্তরসমূহে উৎকৃষ্টমানের বেলে পাথরের মজুত শিলার (reservoir rocks) আধিক্য রয়েছে। সে হিসেবে সমগ্র ফোল্ড বেল্ট প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের মজুতের সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে বিবেচিত। বস্তুত বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রায় সকল প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র এবং তেলক্ষেত্রসমূহ ফোল্ড বেল্ট অঞ্চলে অবস্থিত। সে হিসেবে এ অঞ্চলটিকে পেট্রোলিয়াম সম্পদে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

২.৩ বাংলাদেশের স্তরক্রমবিন্যাস

বাংলাদেশের ভূ-অভ্যন্তরে পৃথিবীর অন্যতম পুরু পাললিক শিলাস্তর বিদ্যমান। এদেশের উত্তর-পূর্বাংশে সিলেট বেসিন অঞ্চলে সর্বোচ্চ প্রায় ২০ কিলোমিটার পুরু এবং দক্ষিণে উপকূল এলাকার সমুদ্র সীমানায় ভূ-অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ প্রায় ২২ কিলোমিটার পুরু পাললিক শিলাস্তরের সঞ্চয় ঘটেছে (কারি ১৯৯১)। এ বিশাল পুরুত্বের শিলাস্তরসমূহ মূলত নবজীবীয় (Cenozoic) মহাযুগে সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে ভূ-অভ্যন্তরে অধিকতর প্রাচীন মধ্যজীবীয় (Mesozoic) এবং পুরাজীবীয় (Paleozoic) শিলাস্তরসমূহ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পাললিক শিলাস্তরের ক্রমবিন্যাসকে এদেশের ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল বা এককের প্রেক্ষাপটে দুটি ভাগে ভাগ ও বর্ণনা করা যেতে পারে, যথা ঃ (ক) উত্তর-পশ্চিমে ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলের স্তর ক্রমবিন্যাস এবং (খ) দক্ষিণ ও পূর্বাংশের বেসিন অঞ্চলের স্তর ক্রমবিন্যাস। সারণি ২ এবং ৩ -এ উপরিউক্ত দুটি অঞ্চলের স্তর ক্রমবিন্যাস দেখানো হয়েছে।

২.৩.১ উত্তর-পশ্চিমে ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলের স্তরক্রমবিন্যাস ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপর পাললিক শিলাস্তরের পুরুত্ব সীমিত অর্থাৎ রংপুর স্যাডল অঞ্চলে সর্বনিম্ন প্রায় ১২৮

মিটার থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃদ্ধি পেয়ে বগুড়া শেলফ অঞ্চলের দক্ষিণাংশে তা সর্বোচ্চ প্রায় ৭০০০ মিটার পর্যন্ত।

এ অঞ্চলে পারমো-কার্বোনিফেরাস (Permo-Carboniferous) যুগের গন্ডোয়ানা শিলাস্তরই সর্বপ্রাচীন এবং তা একাধিক গ্রাবেন (graben) জাতীয় বেসিনে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপর অসংগতিরূপে (unconformably) বিন্যস্ত রয়েছে (সারণি ২)। এ প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলা মূলত কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা–যেমন নাইস (gneiss), সিস্ট (schist), গ্রানাইট (granite) ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। এর উপর পারমিয়ান যুগের (Permian) গন্ডোয়ানা দলের (Gondwana Group) যে শিলাস্তর রয়েছে তা মূলত মহাদেশীয় বেলেপাথর, কাদাশিলা এবং কয়লাস্তর দিয়ে গঠিত এবং এদের নিচের দিকে কিছু কনগ্লোমারেট (conglomerate) শিলাস্তরও পাওয়া যায়। বেলেপাথরের সাথে স্তরীভূত এই কয়লাস্তরসমূহই এদেশের কয়লা সঞ্চয়ের মূল উৎস। বগুড়া শেলফ অঞ্চলে গন্ডোয়ানা শিলাস্তরের পুরুত্ব মোট ১৭০০ মিটারের বেশি এবং রংপুর স্যাডল অঞ্চলে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মিটার পুরুত্বের গন্ডোয়ানা শিলাস্তর পাওয়া গেছে। এই গন্ডোয়ানা শিলাদলকে নিচ থেকে উপরে কুচমা সংঘ (Kuchma Formation) এবং পাহাড়পুর সংঘ (Paharpur Formation) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় (সারণি ২)।

উপরিউক্ত গন্ডোয়ানা শিলাদলের উপর পর্যায়ক্রমে জুরাসিক (Jurassic), ক্রিটেশাস (Cretaceous) এবং টারশিয়ারি যুগের শিলাস্তরসমূহের বিন্যাস ঘটেছে। অবশ্য রংপুর স্যাডল অঞ্চলে জুরাসিক ও ক্রিটেশাস যুগের শিলাস্তর নেই এবং এখানে অল্প পুরুত্বের টারশিয়ারি শিলাস্তর পারমিয়ান যুগের কয়লাবাহী গন্ডোয়ানা শিলাস্তর অথবা সরাসরি প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কেলাসিত ভিত শিলার উপর বিন্যস্ত রয়েছে।

জুরাসিক যুগের শিলা মূলত ব্যাসাল্ট (basalt) শিলাস্তর দিয়ে গঠিত যাকে ভারতের বিহার অঞ্চলের রাজমহল পাহাড়ি অঞ্চলের নাম অনুসারে রাজমহল ট্রাপ (Rajmahal trap) নামে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের ভূ-অভ্যন্তরে চারটি এলাকা তথা কানসাট (রাজশাহী), পত্নীতলা, কুচমা এবং সিংড়ায় কূপসমূহে এই সংঘের সর্বোচ্চ প্রায় ৫৪০ মিটার পুরুত্ব লক্ষ্য করা গেছে। রাজমহল ট্রাপ সংঘের উপর অবস্থিত শিবগঞ্জ ট্রাপওয়াশ সংঘ (Sibganj Trapwash Formation) মূলত মোটা দানার বেলেপাথর ও লৌহযুক্ত কাদাশিলা দিয়ে গঠিত।

শিবগঞ্জ ট্রাপওয়াশ সংঘের উপর অবস্থিত ইয়োসিন উপযুগের জয়ন্তিয়া শিলাদলকে (Jaintia Group) নিচ থেকে উপরে মূলত বেলেপাথরের সমন্বয়ে গঠিত তুরা স্যান্ডস্টোন সংঘ (Tura Sandstone Formation), মূলত চুনাপাথরের সমন্বয়ে গঠিত সিলেট লাইমস্টোন সংঘ (Sylhet Limestone Formation) এবং মূলত কাদাশিলার

সারণি ২ : বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (প্রাক-ক্যামব্রিয়ান প্লাটফর্ম) স্তরক্রমবিন্যাস।

মহাযুগ	যুগ	উপযুগ	বগুড়া শেলফ (পুরত্ব মিটারে)		রংপুর স্যাডল	শিলালক্ষণ
নবজীবীয়	কোয়াটার-নারি	হলোসিন	পলিমাটি (৬০)		পলিমাটি	বালি, সিল্ট, কাদা
		প্লেইসটোসিন	মধুপুর ক্লে সংঘ (১৫)		মধুপুর ক্লে	মূলত কাদাশিলা
	টারশিয়ারি	প্লায়োসিন	ডুপিটিলা সংঘ (২৭৫)		ডুপিটিলা সংঘ	মূলত বেলেপাথর, কিছু কাদাশিলা
		মায়োসিন	জামালগঞ্জ সংঘ (৪১০)		-	কাদাশিলা ও বেলেপাথর
		অলিগোসিন	বগুড়া সংঘ (১৬০)		-	অংগারময় কাদাশিলা ও বেলেপাথর
		ইয়োসিন	জয়োন্তিয়া দল	কোপিলি সংঘ (৪৫০)	-	মূলত কাদাশিলা, কিছু চুনাপাথর
				সিলেট লাইমস্টোন সংঘ (২৪০)	-	মূলত চুনাপাথর, কিছু বেলেপাথর
				তুরা সংঘ (৩৮০)	-	মূলত বেলেপাথর, কিছু কাদাশিলা ও কয়লাস্তর
মধ্যজীবীয়	ক্রিটেশাস		শিবগঞ্জ ট্রাপওয়াশ সংঘ		-	লৌহময় কাদাশিলা ও বেলেপাথর
	জুরাসিক		রাজমহল ট্রাপ সংঘ (৫৪৬)		-	ব্যাসল্ট, এগ্রোমারেট ও কিছু কাদাশিলা
পুরাজীবীয়	পারমিয়ান		গন্ডোয়ানা দল	পাহাড়পুর সংঘ (৫৫০)	গন্ডোয়ানা দল (৮০০)	মূলত বেলেপাথর, কিছু কাদাশিলা, কয়লাস্তর
				কুচমা সংঘ (১২০০)		
প্রাক-কামব্রিয়ান	আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত কেলাসিত ভিত্ত শিলা					নাইস, গ্রানোডায়োরাইট

সারণি ৩ঃ বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের (বেসিন অঞ্চল) স্তরক্রমবিন্যাস ।

যুগ	উপযুগ	দল	সংঘ (পুরুত্ব মিটারে)	শিলা লক্ষণ
টারশিয়ারি	হলোসিন		পলিমাটি	কাদা,বালি, সিল্ট
	প্লেইসটোসিন		মধুপুর ক্লে সংঘ	মূলত কাদাশিলা
	প্লায়োসিন		ডুপিটিলা সংঘ (২০০০)	মূলত বেলেপাথর,কোথাও নুড়িময়, কিছু কাদাশিলা
		তিপাম দল	গিরুজান ক্লে সংঘ (৭০০)	কাদাশিলা
	মায়োসিন		তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘ (১২০০)	মূলত বেলেপাথর, কিছু কাদাশিলা
		সুরমা দল	বোকাবিল সংঘ (১৫০০)	কাদাশিলা, বেলেপাথর ও সিল্টপাথর
			ভুবন সংঘ (৩০০০)	কাদাশিলা,বেলেপাথর ও কিছু কনগ্লোমারেট
	অলিগোসিন	বরাইল দল	রেনজি সংঘ (৪৫০)	বেলেপাথর ও কাদাশিলা
			ঝেনাম সংঘ (২৪০)	কাদাশিলা ও বেলেপাথর

সমন্বয়ে গঠিত কোপিলি সংঘে (Kopili Formation) ভাগ করা হয়। এদের মধ্যে সিলেট লাইমস্টোন শিলাস্তরই সর্বাপেক্ষা জীবাশ্মবহুল এবং তা প্রায় সমগ্র শেলফ অঞ্চল জুড়ে একটি ভাল চিহ্নিত দিগন্ত (marker horizon) হিসেবে শনাক্ত করা যায়। উল্লেখ্য যে এই সিলেট লাইমস্টোন সংঘের শিলাস্তরই বগুড়া জয়পুরহাট অঞ্চলে বিশাল চুনাপাথরের মজুত ধারণ করে। সিলেট লাইমস্টোন সংঘের পুরুত্ব স্থানভেদে প্রায় ২৫ মিটার থেকে প্রায় ২৪০ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

জয়ন্তিয়া শিলাদলের উপর বেলেপাথর ও কাদাশিলা স্তরের সমন্বয়ে গঠিত অলিগোসিন উপযুগের বগুড়া সংঘ (Bogra Formation) এবং মায়োসিন উপযুগের জামালগঞ্জ সংঘ (Jamalganj Formation) অবস্থান করে। এখানে অলিগোসিন ও মায়োসিন উপযুগের শিলা এককসমূহের পুরুত্ব দক্ষিণ ও পূর্বের বেসিন অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। উল্লেখ্য যে বেসিন অঞ্চলে অলিগোসিন উপযুগের বরাইল দল (Barail Group) এবং মায়োসিন উপযুগের সুরমা দল (Surma Group) বিশাল পুরুত্ব ধারণ করে।

মায়োসিন উপযুগের জামালগঞ্জ সংঘের উপর নরম ও ভঙ্গুর মূলত বেলেপাথর গঠিত ডুপিটিলা সংঘ (Dupi Tila Formation) এবং তার উপর মূলত নরম কাদাশিলায় গঠিত মধুপুর ক্লে সংঘ (Modhupur Clay Formation) অবস্থান করে। এ সমস্তকেই এর উপরে অবস্থিত অল্প পুরুত্বের আধুনিক উপযুগের (Holocene epoch) পলিমাটি আবৃত করে রেখেছে। বাংলাদেশের কেয়োলিন ক্লে বা চীনামাটির মজুতসমূহ ডুপিটিলা শিলাসংঘে পাওয়া যায় এবং কাচবালির মজুতসমূহ আধুনিক যুগের পিডমন্ড পলিস্তরের (piedmont alluvial) মধ্যে অবস্থান করে।

২.৩.২ দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বেসিন অঞ্চলের স্তরক্রমবিন্যাস ঃ বেসিন অঞ্চলে পাললিক শিলার পুরুত্ব যদিও খুব বেশি (সর্বোচ্চ প্রায় ২২,০০০ মিটার) এই শিলাস্তরসমূহ মূলত নবজীবীয় মহাযুগে (Cenozoic era) তথা টারশিয়ারি যুগে (Tertiary period) জমা হয়েছে। বেসিন অঞ্চলে কোথাও অলিগোসিন উপযুগের (Oligocene epoch) চেয়ে পুরানো শিলাস্তর ভূপৃষ্ঠে বা খননকৃত কূপে দেখা যায় নি। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে কেবল জয়ন্তিয়া-তামাবিল এলাকায় ওলিগোসিন উপযুগের শিলাস্তর ভূপৃষ্ঠে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া কেবল দুটি গভীর কূপে (আটগ্রাম এবং রশিদপুর) সর্বোচ্চ গভীরতায় অলিগোসিন উপযুগের শিলাস্তর দেখা গেছে। বেসিন অঞ্চলটি মূলত মায়োসিন - প্লায়োসিন উপযুগের বদ্বীপ পরিবেশে গঠিত বিশাল পুরুত্বের (৫০০০ মিটারের অধিক) শিলাস্তর দিয়ে ভরাট হয়েছে এবং এই শিলাস্তরসমূহই পরবর্তীতে ভূ-আন্দোলনের কারণে ভাঁজ সৃষ্টি করে এদেশের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি বন্ধুরতার সৃষ্টি করেছে। সে হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশের বর্তমান বাহ্যিক ভূপ্রকৃতি ও তার গঠন অপেক্ষাকৃত নবীন -তথা মায়োসিন, প্লায়োসিন এবং কোয়াটারনারি উপযুগের শিলাস্তর দিয়ে গঠিত।

বেসিন অঞ্চলে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলা অলিগোসিন উপযুগের বরাইল দলের অন্তর্ভুক্ত (সারণি ৩)। এই শিলাস্তরসমূহ মূলত বেলেপাথর ও কাদাশিলা দিয়ে গঠিত। ভারতের আসাম রাজ্যের বরাইল পর্বতের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। আসাম অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খনিজ তেলের মজুত এই বরাইল শিলাস্তরে পাওয়া গেছে এবং ভূতত্ত্ববিদগণের ধারণা যে বাংলাদেশের ভূ-অভ্যন্তরেও সমসাময়িক এই বরাইল শিলাস্তরও তেলবাহী। তবে যেহেতু বরাইল শিলাদল বেসিন অঞ্চলে বিশাল গভীরতায় অবস্থান করে, তাই বাংলাদেশে খননকৃত কূপ মারফত এসবকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ হয় নি।

বরাইল শিলাদলের উপর মায়োসিন প্লায়োসিন উপযুগে বদ্বীপ গঠিত শিলাস্তরসমূহ সুরমা দল নামে পরিচিত। এই সুরমা দল একের পর এক বিন্যস্ত প্রায় সমপরিমাণ বেলেপাথর ও কাদাশিলা দিয়ে গঠিত যদিও এতে কিছু পরিমাণ কনগ্লোমারেট (conglomerate) লক্ষ্য করা যায়। সুরমা শিলাদলের মোট পুরুত্ব প্রায় ৩০০০ মিটার থেকে প্রায় ৫০০০ মিটার এবং এই দলকে নিচে ভুবন সংঘ (Bhuban Formation) এবং উপরে বোকাবিল সংঘ (Bokabil Formation) -- এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই দুটি শিলা সংঘকে বাংলাদেশের পূর্বাংশে পাহাড় শ্রেণি গঠন করতে দেখা যায় এবং বেসিন অঞ্চলে প্রতিটি কূপেই এই শিলা সংঘসমূহের বিরাট পুরুত্ব খনন করা হয়েছে। বেঙ্গল বেসিনের পূর্বাংশে পাহাড়ি এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভুবন এবং বোকাবিল সংঘের বেলেপাথর এবং কাদাশিলা স্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত রয়েছে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল গ্যাস ও তেল মজুত এই ভুবন এবং বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের স্তরসমূহে অবস্থান করে।

সুরমা শিলাদলের উপর মূলত প্লায়োসিন উপযুগে মহাদেশীয় নদীবাহিত (continental fluvial) পরিবেশে গঠিত নরম ও ভঙ্গুর বেলেপাথর দিয়ে গঠিত তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘের (Tipam Sandstone Formation) অবস্থান। তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘের পুরুত্ব প্রায় ১২০০ মিটার এবং তা বাংলাদেশের পূর্বাংশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বরাবর ভূপৃষ্ঠে পরিলক্ষিত হয়। এর উপর মূলত নরম কাদা শিলাস্তরের যে আবরণ তাকে গিরুজান ক্লে সংঘ (Girujan Clay Formation) নামে অভিহিত করা হয়।

স্তরক্রম বিন্যাসে এর উপর বিরাট পুরুত্বের (প্রায় ৩০০০ মিটার) মূলত নরম ও ভঙ্গুর হলদে বর্ণের মোটা থেকে মধ্যম দানার বেলেপাথরের তৈরি ডুপিটিলা সংঘ অবস্থান করে। এ সংঘটিও তিপাম সংঘের মত মহাদেশীয় নদীবাহিত পরিবেশে সৃষ্টি হয়। ডুপিটিলা শিলাস্তরের উপর প্লেইসটোসিন উপযুগের (Pleistocene epoch) মধুপুর ক্লে সংঘের অবস্থান এবং সেবকটিকে আবৃত করা অল্প পুরুত্বের আধুনিক উপযুগের পলি (Recent alluvial plain) সমতল বঙ্গভূমির উর্বর আস্তরণ হিসেবে দৃশ্যমান হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

পেট্রোলিয়াম

(Petroleum)

৩.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি

পেট্রোলিয়াম মূলত হাইড্রোজেন এবং কার্বন দিয়ে গঠিত হাইড্রোকার্বন যৌগের সমষ্টি। পেট্রোলিয়াম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ পেট্রা (অর্থাৎ পাথর) এবং ওলিয়াম (অর্থাৎ তেল) থেকে উদ্ভাবিত। পেট্রোলিয়াম বলতে অনেক সময় সাধারণভাবে তরল তেলকে (crude oil) বোঝানো হয়ে থাকলেও বস্তুত এ শব্দটি শিলাস্তরে অবস্থিত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন যা প্রাকৃতিক গ্যাস (natural gas) নামে পরিচিত এবং কঠিন হাইড্রোকার্বন যা অ্যাসফাল্ট নামে পরিচিত, তাও বোঝানো হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল এবং অ্যাসফাল্ট হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের যথাক্রমে বায়বীয়, তরল এবং কঠিন রূপ এবং সে হিসেবে এদের উৎপত্তিগত এবং অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

৩.১.১ প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ প্রাকৃতিক গ্যাস মূলত সর্বাপেক্ষা সহজ ও হালকা হাইড্রোকার্বন মিথেন (methane) গ্যাস দিয়ে গঠিত। প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের সাথে অল্প পরিমাণ অপেক্ষাকৃত ভারি হাইড্রোকার্বন গ্যাস ও যৌগ অবস্থান করে, যেমন ইথেন (ethane), প্রপেন (propane), বুটেন (butane), পেনটেন (pentane) ইত্যাদি। হাইড্রোকার্বন গ্যাস ছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাসে নগণ্য বা সামান্য মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং নাইট্রোজেন গ্যাস উপস্থিত থাকে -- যা তার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করে; বিশেষ করে হাইড্রোজেন সালফাইড ক্ষয়কারক উপাদান হিসেবে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলে উৎপাদনের পর তা আলাদা করে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস থাকলে তাকে টক গ্যাস (sour gas) এবং সামান্য পরিমাণ বা অবর্তমান থাকলে তাকে মিষ্টি গ্যাস (sweet gas) হিসেবে অভিহিত করার রেওয়াজ রয়েছে।

কনডেনসেট (condensate) বলতে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকালে তার থেকে যে অংশটুকু তরল আকার ধারণ করে আলাদা হয়ে যায় তাকেই বুঝায়। ভূগর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাস অবস্থানকালে উচ্চ তাপ এবং চাপে তার সাথে কিছু ভারি হাইড্রোকার্বন গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠে গ্যাস উৎপাদনকালে গ্যাসের চাপ হ্রাস হেতু এই

অপেক্ষাকৃত ভারি হাইড্রোকার্বনসমূহ তরল আকার ধারণ করে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আলাদা হয়ে যায়। বর্ণহীন বা হালকা হলুদ বর্ণের এই কনডেনসেট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসকে তার থেকে প্রাপ্ত কনডেনসেটের পরিমাণের উপর নির্ভর করে শুষ্ক গ্যাস (dry gas) এবং ভেজা গ্যাস (wet gas) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে কনডেনসেটের পরিমাণ খুব কম হলে (প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসে ০.১ গ্যালন কনডেনসেট বা তার কম) তাকে শুষ্ক গ্যাস বলে এবং এতে কনডেনসেটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হলে (প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসে ০.৩ গ্যালন কনডেনসেট বা তার বেশি অর্থাৎ প্রতি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসে ৭ ব্যারেল কনডেনসেট বা তার বেশি) তাকে ভেজা গ্যাস বলে। কনডেনসেট একটি মূল্যবান উপাদান এবং গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদনকালে এই কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে তা থেকে প্রাপ্ত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন বাজারজাত করা হয়।

লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি (LPG) বলতে গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে পৃথককৃত প্রপেন এবং বুটেন অংশটির সমন্বয় বোঝায়। এলপিজি সুবিধাজনকভাবে সিলিন্ডারে ভরে জ্বালানি হিসেবে গৃহস্থলী ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড বা এনজিএল (NGL) বলতে গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদিত গ্যাসকে প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে তার মিথেন অংশটুকু বাদে অবশিষ্ট অংশকে তরলীকরণের মাধ্যমে আলাদা করে যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকে বুঝায়।

লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস বা এলএনজি (LNG) বলতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসকে বুঝানো হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস তরলীকরণ খুব ব্যয়সাপেক্ষ। প্রাকৃতিক গ্যাসকে শূন্য ডিগ্রির নিচে ১৬১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিলে তা তরল আকার ধারণ করে। তরলীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গ্যাসকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে পরিবহণ করা – যা গ্যাসীয় অবস্থায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে উঠে না। বর্তমানে বিশ্বের অনেক প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ দেশ তাদের গ্যাসকে তরল এলএনজি-তে পরিণত করে সমুদ্রপথে জাহাজযোগে সুদূর দেশে রফতানি করে থাকে।

৩.১.২ খনিজ তেল ঃ খনিজ তেল হলো পেট্রোলিয়ামের তরল রূপ। খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাসের মতই হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি, তবে এ হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহ অপেক্ষাকৃত ভারি বলে তা তরল অবস্থায় বিরাজ করে। প্রাকৃতিক গ্যাসে যেখানে প্রকৃতপক্ষে ১ থেকে ৫ টি কার্বন পরমাণু সংবলিত হাইড্রোকার্বন থাকে, খনিজ তেলের হাইড্রোকার্বনসমূহে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা ৫ থেকে ৬০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। খনিজ তেলে এ পর্যন্ত ৬০০ টিরও বেশি হাইড্রোকার্বন যৌগ শনাক্ত করা গেছে।

এই যৌগসমূহ প্যারাফিন (paraffin), ন্যাপথিন (naphene) এবং অ্যারোমেটিক (aromatic) শ্রেণির হয়ে থাকে এবং এই তিন ধরনের যৌগ শ্রেণির তুলনামূলক পরিমাণ খনিজ তেলের গুণাগুণ নির্ধারণ করে; যেমন প্যারাফিন যৌগের আধিক্য ঘটলে তাকে প্যারাফিনিক তেল (paraffinic oil) বলা হয় যা সাধারণত মোমযুক্ত হয়ে থাকে। আবার অ্যারোমেটিক যৌগের আধিক্য সংবলিত অ্যারোমেটিক তেল (aromatic oil) অপেক্ষাকৃত হালকা, মোমবিহীন এবং অধিক পেট্রোলিযুক্ত হয়ে থাকে। খনিজ তেলকে তার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে হালকা তেল (light oil) এবং ভারি তেল (heavy oil) হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। হালকা তেল সাধারণত ভারি তেলের তুলনায় গুণগতভাবে উন্নত এবং এর চাহিদাও তুলনামূলকভাবে বেশি। খনিজ তেলে হাইড্রোকার্বন ছাড়াও সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন,নাইট্রোজেন ও সালফার যৌগও থেকে থাকে। এর মধ্যে সালফার যৌগ একটি দূষক হিসেবে পরিচিত। খনিজ তেলে সালফারের পরিমাণ ০.১% থেকে ৭% পর্যন্ত (ওজনে) থাকতে পারে। অধিক পরিমাণ সালফারযুক্ত তেলকে টক তেল (sour oil) হিসেবে অভিহিত করার রেওয়াজ রয়েছে এবং বিশ্ববাজারে এর দাম তুলনামূলকভাবে কম।

খনিজ তেল উৎপাদনের পর এর হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের জটিল সমন্বয়কে পরিশোধনাগারে ফ্রাকশনাল ডিসটিলেশন (fractional distillation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি ব্যবহার্য অংশে ভাগ করে নেওয়া হয় এবং বাজারজাত করা হয়। এই অংশসমূহ হলো পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, লুব্রিকেটিং তেল এবং অবশিষ্টাংশ (residium)।

৩.১.৩ পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি ঃ পেট্রোলিয়াম ভূগর্ভে উচ্চ তাপ এবং চাপের প্রভাবে শিলাস্তরের ভিতর অর্বস্থিত জৈবিক পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনো কোনো শিলাস্তরে যথা কাদাশিলা ও চুনাপাথরে উৎপত্তিকালে কখনও বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জৈবিক পদার্থ জমা হতে পারে এবং তা যখন ভূ-অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়ে পর্যাপ্ত তাপের প্রভাবে পড়ে তখন এ জৈবিক পদার্থ থেকে পেট্রোলিয়াম সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ধরনের কাদাশিলা বা চুনাপাথরকে পেট্রোলিয়ামের উৎস শিলা (source rock) বলে। উৎস শিলার জৈবিক পদার্থ স্থলজাত উদ্ভিদ শ্রেণির অথবা সমুদ্রজাত উদ্ভিদ বা প্রাণী উভয় শ্রেণিরই হতে পারে। সমুদ্রজাত উদ্ভিদ এবং প্রাণীজাতীয় জৈবিক পদার্থের খনিজ তেল সৃষ্টি করার ক্ষমতা অনেক বেশি; তবে সমুদ্র ও স্থলজাত জৈবিক পদার্থ উভয়ই সমানভাবে গ্যাস উৎপাদন করতে পারে। তাই কোনো এলাকায় তেলের অধিকা বা গ্যাসের আধিক্য থাকা ঐ এলাকায় পেট্রোলিয়াম উৎস শিলায় জৈবিক পদার্থের ধরনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

পেট্রোলিয়াম (খনিজ তেল বা গ্যাস) অবশ্য উৎস শিলায় সৃষ্টি হওয়ার পর সেখানে অবস্থান করে না, বরং তা সেখান থেকে ঊর্ধ্বগমনের মাধ্যমে উপরে অবস্থিত সুবিধাজনক আধার শিলা বা মজুত শিলা (reservoir rock) অর্থাৎ যে শিলার ভিতর পর্যাপ্ত ফাঁকা স্থান (porosity) এবং যাতে উল্লেখযোগ্য প্রবেশ্যতা (permeability) রয়েছে, এরকম শিলায় এসে জমা হয়। এ ধরনের মজুত শিলার মধ্যে বেলেপাথর (sandstone) এবং চুনাপাথর (limestone) উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মজুত শিলায় পেট্রোলিয়াম জমা হওয়ার জন্য সেখানে একটি ফাঁদ থাকা আবশ্যক। ভূ-অভ্যন্তরে শিলাস্তরে ঊর্ধ্বভাঁজ বা চ্যুতিজাতীয় কাঠামো পেট্রোলিয়ামের ফাঁদ সৃষ্টিতে উপযুক্ত ভূমিকা গঠন করে। অবশ্য মজুত শিলার উপর প্রবেশ্যতা নেই এরকম কোনো শিলার আবরণ যেমন কাদাশিলার অবস্থান ফাঁদটিকে কার্যকরভাবে পূর্ণতা দান করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোনো এলাকায় খনিজ তেল বা গ্যাসের মজুত সৃষ্টি হওয়ার পূর্বশর্তসমূহ হলো নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের সন্তোষজনক সহ অবস্থান যথা ঃ (১) উৎস শিলা তথা জৈবিক পদার্থ সংবলিত শিলা এবং তার তাপজনিত পরিপক্বতা, (২) মজুত শিলা, তথা ফাঁকা স্থান সংবলিত শিলা, (৩) ফাঁদ, তথা শিলাস্তরে উপযুক্ত কাঠামো যেমন ঊর্ধ্বভাঁজ এবং (৪) সীল (seal) তথা প্রবেশ্যতা নেই এ ধরনের শিলাস্তরের আবরণ।

৩.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ

৩.২.১ গ্যাসক্ষেত্রসমূহ ঃ বাংলাদেশে অদ্যাবধি ১৯টি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে প্রধানত দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই গ্যাসক্ষেত্রসমূহ হলো (আবিষ্কার সময়ের ক্রম অনুযায়ী) সিলেট (১৯৫৫), ছাতক (১৯৫৯), রশিদপুর (১৯৬০), তিতাস (১৯৬২), কৈলাশটিলা (১৯৬২), হবিগঞ্জ (১৯৬৩), বাখরাবাদ (১৯৬৯), সেমুতাং (১৯৬৯), বেগমগঞ্জ (১৯৭৭), কুতুবদিয়া (১৯৭৭), বিয়ানীবাজার (১৯৮১), ফেনী (১৯৮১), কামতা (১৯৮১), ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৮৮), জালালাবাদ (১৯৮৯), বেলাবো (১৯৯০), মেঘনা (১৯৯০), শাহবাজপুর (১৯৯৫) এবং সাংগু (১৯৯৬)। ৩.১ চিত্রে গ্যাসক্ষেত্রসমূহের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ড এবং ৬৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রবক্ষ এলাকায় ১৯১৪ থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা মাত্র ৫২ টি অর্থাৎ এ সময়ে প্রতি ৪০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মাত্র ১টি করে অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনুসন্ধানের এই হার বা মাত্রা খুবই অপ্রতুল। তথাপি উপরিউক্ত অনুসন্ধান কাজের ফলাফল অনুযায়ী সাফল্যের অনুপাত ৩ : ১ অর্থাৎ প্রতি তিনটি কূপ খননে একটি আবিষ্কার -- যা কিনা

BANSDOC Library
BANSDOC Library
Accession No. 16394

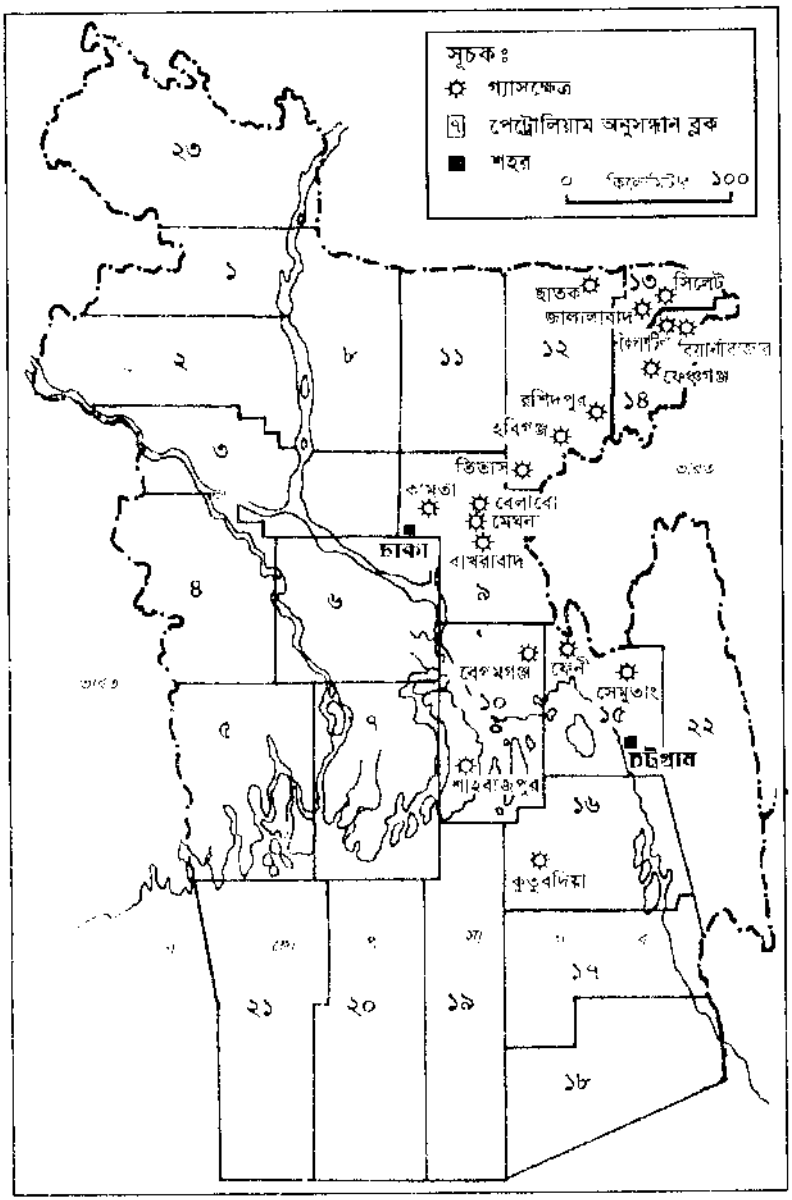

চিত্র ৩.১ঃ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ব্লকসমূহও দেখানো হয়েছে (সূত্র : পেট্রোবাংলা)।

বিশ্বের গড় সাফল্যের অনুপাতের অধিক। বিশ্বের অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এই বিপুল পরিমাণ গ্যাসের আবিষ্কার এই অঞ্চলকে অন্যতম প্রাকৃতিক গ্যাস- সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এদেশের ভূগর্ভে আরো প্রচুর গ্যাসের মজুত থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে দেশীয় সংস্থা পেট্রোবাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড ও সমুদ্রবক্ষ এলাকাকে মোট ২৩টি ব্লকে ভাগ করে (চিত্র ৩.১) আন্তর্জাতিকভাবে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে বিদেশী তেল ও গ্যাস কোম্পানিসমূহের নিকট থেকে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে বিদেশী তেল ও গ্যাস কোম্পানিসমূহকে এদেশে অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী তেল ও গ্যাস কোম্পানি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ও সমুদ্রবক্ষে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

৩.২.২ গ্যাসক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ দেশের পূর্বাংশে প্রধানত ফোল্ড বেল্ট (fold belt) অঞ্চলে অবস্থিত। অদ্যাবধি দেশের পশ্চিম অঞ্চলে কোনো গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় নি। এই গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসস্তরগুলো ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রায় ৯৮০ মিটার থেকে প্রায় ৩৪৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে বিরাজ করে (চিত্র ৩.২)। অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রেই একাধিক গ্যাসস্তর বিদ্যমান এবং কোনো কোনো গ্যাস-ক্ষেত্রে যেমন তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে এ রকম ১০টি গ্যাসস্তর রয়েছে (খান ও হোসেন ১৯৮০)।

(ক) ফাঁদ (trap) ঃ গ্যাসক্ষেত্রসমূহ ঊর্ধ্বভাজ (anticline) দিয়ে সৃষ্ট ফাঁদ কর্তৃক গঠিত। এই ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ মূলত সাধারণ ঊর্ধ্বভাজ -- যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃদু প্রকৃতির এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল ভূগর্ভে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যার বাহ্যিক প্রতিফলন তেমন ঘটে নি। সে কারণে গ্যাসক্ষেত্রসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমতল বা অল্প বন্ধুর অঞ্চলে অবস্থিত। এই ফাঁদসমূহ ফোল্ড বেল্ট ও ফোরডিপ (foredeep) অঞ্চলে অবস্থিত।

বাংলাদেশের ফোল্ড বেল্ট অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সৃষ্ট ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রমাগতভাবে তীব্রতর এবং জটিলতর -- যার বাহ্যিক প্রতিফলন পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পাহাড়ি বন্ধুরতার তীব্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘটেছে। আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসমূহ অধিকাংশই ফোল্ড বেল্ট অঞ্চলের পশ্চিম অংশে অবস্থিত যেখানে ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ পূর্বাংশের তুলনায় অনেক মৃদু এবং সহজ। উদাহরণস্বরূপ সিলেট, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা ইত্যাদি গ্যাসক্ষেত্র উল্লেখ্য। আরো পশ্চিমে যেখানে ফোল্ড বেল্ট ধীরে ফোরডিপ অঞ্চলে মিশেছে, সেখানে আপত

চিত্র ৩.২ ঃ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসস্তরের অবস্থান (গভীরতা মিটারে; সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

সমতলভূমির নিচে ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ এতই মৃদু যে ভূগর্ভে শিলাস্তরের অতি অল্প ঢাল বা নতি (dip) কেবল উন্নতমানের সাইসমিক জরিপের সাহায্যে শনাক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কামতা, বেলাবো, মেঘনা, কুতুবদিয়া ইত্যাদি গ্যাসক্ষেত্র উল্লেখ্য।

ফোল্ড বেল্ট অঞ্চলের পূর্বাংশে যেখানে ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ অধিক তীব্রতর সেখানেও গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে (যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র) এবং আরো ক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র অঞ্চলই একের পর এক অপেক্ষাকৃত তীব্র ঊর্ধ্বভাঁজ দিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলে অনুসন্ধান কূপ খননের মাত্রা অতি সামান্য, যদিও এ অঞ্চলে একাধিক স্থানে গ্যাসের ও তেলের বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ (seepage) লক্ষ্য করা যায়। ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ঊর্ধ্বভাঁজসমূহে অনুসন্ধান কূপ খননের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলে সেখানে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

(খ) মজুত শিলা (reservoir rock) ঃ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাস বেলেপাথরের মজুত শিলায় বিদ্যমান। এই শিলাস্তরসমূহ মায়োসিন প্লায়োসিন উপযুগে সৃষ্ট বোকাবিল এবং ভুবন শিলা সংঘে (Bhuban and Bokabil Formation) অবস্থান করে। এই শিলা সংঘদ্বয় বদ্বীপ পরিবেশে সৃষ্ট এবং তা মূলত একের পর এক স্তরীভূত বেলেপাথর এবং কাদাশিলা (shale) স্তর দিয়ে গঠিত। এই বেলেপাথরের মজুত শিলাসমূহ উন্নতমানের (ইমাম এবং শ, ১৯৮৭)। এদের ফাঁকা স্থানের (porosity) পরিমাণ সাধারণত প্রায় ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত এবং এদের প্রবেশ্যতা (permeability) মান সাধারণত প্রায় ১০০ থেকে ৫০০ মিলিডারসি (millidarcy)। বেলেপাথরের মজুত শিলাসমূহের উপর অবস্থিত কাদাশিলাস্তরসমূহ গ্যাসের ঊর্ধ্বগমন রোধ করে সীল (seal) হিসেবে কাজ করে। সে হিসেবে বেলেপাথর ও কাদা শিলাস্তরসমূহের এ সমন্বয় গ্যাসের ফাঁদ সৃষ্টিতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছে।

(গ) উৎস শিলা (source rock) ঃ ভূগর্ভে বোকাবিল ও ভুবন সংঘের শিলাস্তরে প্রাপ্ত গ্যাসের উৎপত্তি কোথায় অর্থাৎ এর উৎস শিলা কোনটি সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে তা এখনও প্রমাণিত হয় নি। কিছুসংখ্যক ভূতত্ত্ববিদের মতে মায়োসিন যুগের ভুবন সংঘে যে কাদা শিলাস্তর রয়েছে তার ভিতরই এ গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং তারপর এ গ্যাস ঊর্ধ্বমুখে সরণের মাধ্যমে অল্প দূরত্বে অবস্থিত ভুবন এবং বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের স্তরে গিয়ে জমা হয়। পক্ষান্তরে অপরাপর ভূতত্ত্ববিদের মতে ভুবন সংঘের কাদাশিলায় জৈবিক পদার্থের স্বল্পতা হেতু তা গ্যাসের উৎস শিলা হতে পারে না বরং ভুবন শিলাস্তরের নিচে অবস্থিত ওলিগোসিন উপযুগের বরাইল সংঘের (Barail

Formation) কাদাশিলাতেই ঐ গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে এবং কয়েক কিলোমিটার ঊর্ধ্বগমনের মাধ্যমে তা ভুবন ও বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের মজুত শিলায় এসে জমা হয়েছে। ভূ-অভ্যন্তরে শিলাস্তরে ফাটল বা চ্যুতির অবস্থান এই গ্যাসকে ঊর্ধ্বগমনের সুযোগ করে দিয়েছে যেক্ষেত্রে এই চ্যুতি বরাবর গ্যাস ঊর্ধ্বগমন করেছে। এঁদের মতে এই গ্যাস ভূপৃষ্ঠের নিচে ৬০০০ থেকে ৭০০০ মিটার গভীরতার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

৩.২.৩ বাংলাদেশের কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্র ঃ বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান গ্যাসক্ষেত্রের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

(ক) তিতাস গ্যাসক্ষেত্র ঃ তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯৬২ সনে শেল অয়েল কোম্পানি গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে। ১৯৬৮ সনে এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানে এই গ্যাসক্ষেত্র বাংলাদেশে গ্যাস চাহিদার সর্ববৃহৎ অংশ সরবরাহ করে থাকে।

তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটি ভূগর্ভে উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত গম্বুজ সম ঊর্ধ্বভাঁজ (dome like anticline) কর্তৃক গঠিত (চিত্র ৩.৩)। ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রায় ৯৬০ মিটার গভীরতায় এই কাঠামোটির বহিস্থ ক্লোজার (peripheral closure) এলাকা ১৪ কি.মি. x ১৯ কি.মি.। এই ঊর্ধ্বভাঁজ অসম (assymetric) যার পূর্বপার্শ্ব (flank) অপেক্ষাকৃত অধিক ঢালু। ঊর্ধ্বভাঁজটিতে কোনো চ্যুতি (fault) লক্ষ্য করা যায় না (খান এবং হোসেন ১৯৮০)।

তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে প্রায় ২৬০০ মিটার থেকে ৩১০০ মিটার গভীরতার মধ্যে মোট ১০টি গ্যাস জোন (gas zone) রয়েছে (চিত্র ৩.২)। গ্যাস জোনসমূহ ভুবন ও বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের আধারে অবস্থিত। গ্যাস জোনসমূহের একেকটির নেট পুরুত্ব (net thickness) ২৫ মিটার থেকে প্রায় ৬৫ মিটার পর্যন্ত এবং সম্মিলিত বা মোট নেট পুরুত্ব প্রায় ১৩০ মিটার। বেলেপাথরের গ্যাস আধারসমূহের ফাঁকা স্থান (porosity) মান প্রায় ১৭% থেকে ২৪% এবং এতে গ্যাস সংপৃক্ততা (gas saturation) ৫৫% থেকে ৭০% (খান এবং হোসেন ১৯৮০)।

তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের মোট প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মজুত ৪১৩৮ বিলিয়ন ঘনফুট — যার মধ্যে ২১০০ বিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলনযোগ্য। ১৯৯৪ সনের জুন মাস পর্যন্ত এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে ১১০৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয় এবং অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯৩ বিলিয়ন ঘনফুট (সারণি ৪)। তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে বর্তমানে ১১ টি উৎপাদন কূপের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ২৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং ৩৫০ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয় (সারণি ৭)।

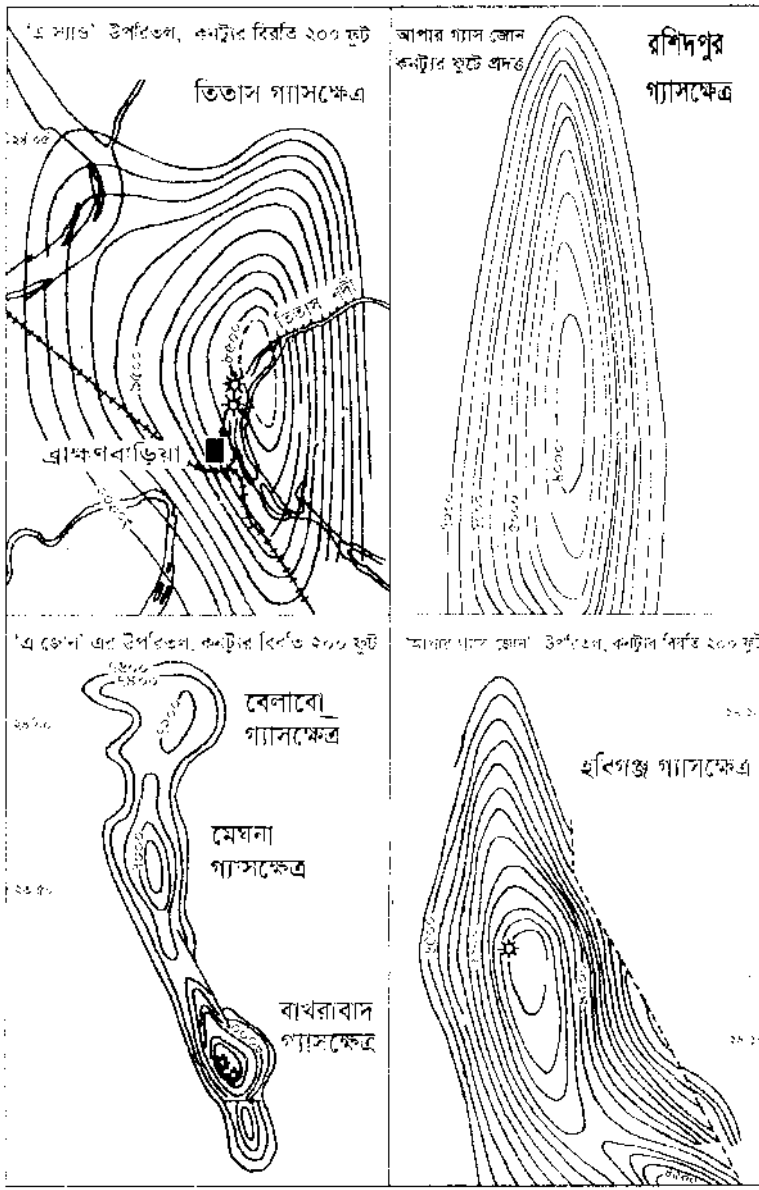

চিত্র ৩.৩ ঃ বাংলাদেশের কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্রের স্ট্রাকচারাল কনটুর (সূত্র: খান ও হোসেন ১৯৮০)।

(খ) হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ঃ হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রটি তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই গ্যাসক্ষেত্র ১৯৬৩ সনে শেল অয়েল কোম্পানি কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৬৮ সন থেকে এই ক্ষেত্রে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গ্যাস উৎপাদক ক্ষেত্র।

হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রটি প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বারামুরা উর্ধ্বভাঁজের উত্তর অংশ জুড়ে অবস্থিত। এই উর্ধ্বভাঁজ দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য বরাবর বিস্তৃত এবং এর মধ্যভাগ ও দক্ষিণ অংশ ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত। উর্ধ্বভাঁজটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আকারে বিরাজমান (চিত্র ৩.৩)।

এই গ্যাসক্ষেত্রে দুটি গ্যাস জোন (gas zone) রয়েছে যাদের গভীরতা ভূপৃষ্ঠ থেকে যথাক্রমে প্রায় ১৪০০ মিটার এবং ৩০১০ মিটার। গ্যাস জোন দুটি যথাক্রমে বোকাবিল এবং ভুবন সংসদ বেলেপাথরের আধারে বিদ্যমান। উপরের গ্যাস জোনটি ১৪০০ মিটার থেকে ১৬৭৭ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর মোট পুরুত্ব (gross thickness) প্রায় ২৭৭ মিটার অর্থাৎ এটিই বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সর্বোচ্চ পুরু গ্যাস স্তর। আরো গভীরে দ্বিতীয় গ্যাস জোনটি ৩০১০ মিটার থেকে ৩০৩৮ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর মোট পুরুত্ব প্রায় ১৮ মিটার। উপরিউক্ত গ্যাস বহনকারী বেলেপাথরের আধারসমূহের ফাঁকা স্থান (porosity) মান প্রায় ১৯% থেকে ৩৩% এবং এদের ভিতর গ্যাস সংপৃক্ততা প্রায় ৬৫% থেকে ৭৫% (খান এবং হোসেন ১৯৮০)।

হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে মোট প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুত ৩৬৬৯ বিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ১৮৯৫ বিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলনযোগ্য। ১৯৯৪ সনের জুন মাস পর্যন্ত এই গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৪২৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয় এবং বাকি উত্তোলনযোগ্য মজুতের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৪৬৯ বিলিয়ন ঘনফুট (সারণি ৪)। বর্তমানে এই গ্যাসক্ষেত্রে ৬টি উৎপাদন কূপের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং প্রায় ৮ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয় (সারণি ৭)।

(গ) বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ঃ বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। ঢাকা শহর থেকে পূর্বদিকে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার এবং তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে এর দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। গ্যাসক্ষেত্রটি ১৯৬৮ সনে শেল অয়েল কোম্পানী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৮৪ সন থেকে এই ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়।

গ্যাসক্ষেত্রটি ভূগর্ভে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রায় ৬৫ কিলোমিটার লম্বা উর্ধ্বভাঁজের এক অংশ জুড়ে অবস্থিত। এই উর্ধ্বভাঁজে তিনটি চূড়া বা কালমিনেশন (culmination) রয়েছে এবং বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটি সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত কালমিনেশন 'এ' তে

অবস্থিত। পরবর্তীতে উত্তরের দুটি কালমিনেশন 'বি' এবং 'সি' তে কূপ খনন করা হলে উভয় ক্ষেত্রেই গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে বিস্তারিত ভূগাঠনিক চরিত্রের বিশ্লেষণে জানা যায় যে বাখরাবাদ উর্ধ্বভাঁজের উত্তরের দুটি কালমিনেশন ('বি' এবং 'সি') প্রকৃতপক্ষে দুটি পৃথক কাঠামোর সাক্ষ্য বহন করে। সে হিসেবে এই দুই স্থানে গ্যাস প্রাপ্তিকে দুটি পৃথক গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে যথা মেঘনা এবং বেলাবো বলে গণ্য করা হয় (চিত্র ৩.৩)।

বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রায় ১৮২০ মিটার থেকে প্রায় ২১৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে চারটি গ্যাস জোন রয়েছে। এই গ্যাসজোনসমূহ বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের আধারে অবস্থিত যাতে ফাঁকা স্থান বা পোরোসিটি মান প্রায় ১২% থেকে ২৪% (গড়ে ২২%) এবং গ্যাস সংপৃক্ততা মান ৪০% থেকে ৮০% (গড়ে ৬৫%)।

বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের মোট প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুত ১৪৩২ বিলিয়ন ঘনফুট – যার মধ্যে ৮৬৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনযোগ্য (সারণি ৪)। ১৯৯৪ সনের জুন মাস পর্যন্ত এই ক্ষেত্র থেকে ৩৭৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয় এবং বাকি উত্তোলনযোগ্য মজুতের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৯১ বিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে ৮ টি উৎপাদন কূপের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১৪০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং ১৬৫ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয় (সারণি ৭)।

৩.২.৪ গ্যাসের মজুত ঃ বাংলাদেশের ১৭টি গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের মোট আদি (original) মজুতের পরিমাণ প্রায় ২১.৩৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (সারণি ৪)। এই মজুতকে প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মজুত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সনে আবিষ্কৃত শাহবাজপুর এবং ১৯৯৬ সনে আবিষ্কৃত সাংগু গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের মজুত নির্ণয় সম্পন্ন হয় নি। উল্লিখিত গ্যাস মজুতের মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুতের পরিমাণ প্রায় ১২.৪১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৯৪ সনের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ২.২১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং সে হিসেবে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুতের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০.২০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। একটি গ্যাসক্ষেত্রের মোট মজুতের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ নির্ভর করে মজুত শিলার গুণাগুণ, ভূগর্ভস্থ গ্যাস আধারের চাপের পরিমাণ, উত্তোলন পদ্ধতি ইত্যাদি একাধিক বিষয়ের উপর। এক হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে গ্যাসক্ষেত্রসমূহে উৎপাদন পরিত্যাগ চাপ ৫০০ পিএসআই (psi) ধরা হলে এবং কূপ মুখে কম্প্রেসর ব্যবহার করলে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুতের পরিমাণ বেড়ে প্রায় ১৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট দাঁড়াবে।

সারণি ৪ : বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের মজুত (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

গ্যাসক্ষেত্র	মোট মজুত (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য) (বিলিয়ন ঘনফুট)	উত্তোলনযোগ্য মজুত (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য) (বিলিয়ন ঘনফুট)	জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাস (বিলিয়ন ঘনফুট)	অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুত (বিলিয়ন ঘনফুট)
তিতাস	৪,১৩৮	২,১০০	১,১০৭	৯৯৩
হবিগঞ্জ	৩,৬৬৯	১,৮৯৫	৪২৫.৫	১৪৬৯.৫
কৈলাসটিলা	৩,৬৫৭	২,৫২৯	৭২.৫	২৪৫৬.৫
রশীদপুর	২,২৪২	১,৩০৯	১২	১২৯৭
ছাতক	১,৯০০	১,১৪০	২৬.৫	১১১৩.৫
জালালাবাদ	১,৫০০	৯০০	-	৯০০
বাখরাবাদ	১,৪৩২	৮৬৭	৩৭৫.৫	৪৯১.৫
কুতুবদিয়া	৭৮০	৪৬৮	-	৪৬৮
সিলেট	৪৪৪	২৬৬	১৫৩	১১৩
ফেনুগঞ্জ	৩৫০	২১০	-	২১০
কামতা	৩২৫	১৯৫	২১	১৭৪
বিয়ানীবাজার	২৪৩	১১৪	-	১১৪
বেলাবো	১৯৪	১২৬	-	১২৬
সেমুতাং	১৬৪	৯৮	-	৯৮
মেঘনা	১৫৯	১০৪	-	১০৪
ফেনী	১৩২	৮০	১৭	৬৩
বেগমগঞ্জ	২৫	১৫	-	১৫
মোট	২১,৩৫৪	১২,৪১৬	২,২১০	১০,২০৬

বাংলাদেশের ১৭টি গ্যাসক্ষেত্রে মোট মজুতের প্রায় ৮৬% গ্যাসই মজুত রয়েছে দেশের ৭টি অপেক্ষাকৃত বড় গ্যাসক্ষেত্রসমূহে, যথা: তিতাস, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা,রশিদপুর, ছাতক, জালালাবাদ এবং বাখরাবাদ -- যাদের প্রতিটিতে প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাস মজুতের পরিমাণ ১ ট্রিলিয়ন ঘনফুটের চেয়ে বেশি (সারণি ৪)। বাকি ১০টি গ্যাসক্ষেত্রই ছোট বা অতি ছোট আকারের -- যাদের এক একটির মধ্যে গ্যাস মজুতের পরিমাণ মাত্র ০.০২৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (বেগমগঞ্জ) থেকে ০.৭৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (কুতুবদিয়া) পর্যন্ত।

একটি গ্যাসক্ষেত্রে কতটুকু গ্যাস মজুত রয়েছে তা প্রাথমিকভাবে আয়তনিক পদ্ধতিতে (volumetric method) নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে গ্যাসের মজুত নির্ণয়ের জন্য গ্যাসস্তরের বিস্তৃতি একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিমাপ। গ্যাসস্তরের বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য আবিষ্কার কূপের (discovery well) বাইরে কয়েকটি মূল্যায়ন কূপ (appraisal well) খনন করা আবশ্যক। অন্যথায় গ্যাসক্ষেত্রটির কাঠামোগত আকারের উপর নির্ভর করে গ্যাসস্তরের সম্ভাব্য বিস্তৃতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে, যা যথার্থ নাও হতে পারে। তাই যে সব গ্যাসক্ষেত্রে যাচাই কূপ খনন করা হয় নি এবং গ্যাসের মজুত কেবল একটি কূপ তথা আবিষ্কার কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হয়েছে, তাতে নির্ণীত মজুতের পরিমাপের নির্ভরশীলতা কম।

বাংলাদেশের ১৭টি গ্যাসক্ষেত্রের অনেকগুলোতেই মজুত নির্ণয় করা হয়েছে কেবল ১টি কূপ তথা আবিষ্কার কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করে -- যেমন বেগমগঞ্জ, ফেনচুগঞ্জ, কুতুবদিয়া, সেমুতাং, বেলাবো, মেঘনা ইত্যাদি। এসব গ্যাসক্ষেত্রে কোনো মূল্যায়ন কূপ খনন করা হয় নি বা এগুলো থেকে এখনও গ্যাস উৎপাদন শুরু হয় নি। তাই এসব গ্যাসক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে খননকৃত যাচাই কূপ বা উৎপাদন ভিত্তিক তথ্যাদি পাওয়া গেলে এদের ক্ষেত্রে নির্ণীত মজুতের পরিমাণ কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে।

৩.২.৫ গ্যাসের উপাদান ও গ্যাসে কনডেনসেট ঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস বিশুদ্ধতার জন্য সুবিদিত। গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের মূল উপাদান মিথেনের পরিমাণ ৯৩.৫০% থেকে সর্বোচ্চ ৯৯.০৫% পর্যন্ত এবং এদের ভিতর ক্ষতিকারক সালফার উপাদান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত (সারণি ৫)। এই গ্যাসে নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণও নগণ্য। এদের ক্যালরিফিক মান ১০০৬ বিটিইউ (btu) থেকে ১০৬২ বিটিইউ পর্যন্ত।

গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের মূল উপাদান মিথেন ছাড়াও কিছু পরিমাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের হাইড্রোকার্বন (higher hydrocarbon) রয়েছে -- যা গ্যাস উৎপাদনের সময় মিথেন থেকে আলাদা হয়ে তরল আকারে কনডেনসেট হিসেবে উৎপাদিত হয়।

সারণি ৫ ঃ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের উপাদান (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

গ্যাসক্ষেত্র	মিথেন	ইথেন	প্রপেন	বুটেন+	নাইট্রোজেন	কার্বন ডাই - অক্সাইড	সালফার
তিতাস	৯৬.২৭	১.৮২	০.৪৩	০.৬৭	০.৩৫	০.৪৫	নেই
হবিগঞ্জ	৯৭.৮	১.৫	নগন্য	নেই	০.৭	০.৫	নেই
কৈলাশটিলা	৯৫.৭	২.৬	০.৯	০.৪	০.২	০.২	নেই
রশিদপুর	৯৮.২	১.২	০.২	০.১	০.২৫	০.০৫	নেই
ছাতক	৯৯.০৫	০.২৪	নগন্য	নেই	০.৬৭	০.০৪	০.০৮
জালালাবাদ	৯৩.৫						
বাখরাবাদ	৯৪.৩	৩.৩২	০.৮৩	০.৪	০.৪২	০.৫৪	নেই
কুতুবদিয়া	৯৪.৪১	২.৮৩	০.৬৬	০.৩	১.৪	০.০৬	নেই
সিলেট	৯৬.২৬	১.৯৯	০.১৪	০.৩২	০.৯৫	০.৫৪	০.২৯
ফেঞ্চুগঞ্জ	৯৬.৬৭	২.৩৩	০.৫৮	০.২৬	০.১১	০.০৫	নেই
কামতা	৯৫.৩৬	৩.৫৭	০.৪৭	০.০৯		০.৫১	-
বিয়ানিবাজার	৯৩.৬৮	৩.৪৩	০.৮৩	০.৪	০.৯৯	০.১২	নেই
বেলাবো	৯৪.৭৯	২.৪৯	০.৬	০.৩৮	০.৩৪	০.৬	-
সেমুতাং	৯৬.৯৪	১.৭	০.১৪	০.০১	০.৮৬	০.৩৫	নেই
মেঘনা	৯৫.১৫	২.৮৩	০.৬	০.৩২	০.৩৭	০.৫৩	-
ফেনী	৯৫.৭১	৩.২৯	০.৬৫	০.২	-	০.১৫	নেই
বেগমগঞ্জ	৯৫.৩	৩.৬৬	০.৭২	০.৩৪	নেই	০.১	নেই

বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে কনডেনসেট : গ্যাস অনুপাতের বিভিন্নতা লক্ষণীয়। গ্যাসক্ষেত্রসমূহের অধিকাংশের গ্যাসে কনডেনসেটের পরিমাণ অল্প বা অতি অল্প এবং এদেরকে শুষ্ক গ্যাস (dry gas) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনটি গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট পাওয়া যায় এবং এদেরকে ভেজা গ্যাস (wet gas) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ভেজা গ্যাসক্ষেত্রসমূহ হলো বিয়ানিবাজার, জালালাবাদ এবং কৈলাশটিলা। এখানকার প্রতি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসে কনডেনসেটের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬ ব্যারেল, ১৫ ব্যারেল এবং ১৩ ব্যারেল (সারণি ৬)। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্রে কনডেনসেটের পরিমাণ প্রতি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসে মাত্র প্রায় ০.১ ব্যারেল (হবিগঞ্জ) থেকে ৩.০ ব্যারেল (সিলেট) পর্যন্ত। গ্যাসক্ষেত্রসমূহের অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে কনডেনসেট : গ্যাস অনুপাত মান বৃদ্ধি পায়; যেমন সর্ব পশ্চিমে ছাতকে এই মান মাত্র ০.১ ব্যারেল/মিলিয়ন ঘনফুট থেকে পূর্বে বিয়ানিবাজারে ১৬ ব্যারেল/মিলিয়ন ঘনফুট।

৬ সারণিতে গ্যাসক্ষেত্রসমূহের কনডেনসেট : গ্যাস অনুপাত এবং মোট কনডেনসেটের মজুত দেখানো হয়েছে। এই সারণি থেকে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে মোট কনডেনসেটের মজুতের পরিমাণ ৬৪.৬৯ মিলিয়ন ব্যারেল -- যার প্রায় ৮৫% রয়েছে মাত্র চারটি গ্যাসক্ষেত্রে যথা কৈলাশটিলা, বিয়ানিবাজার, জালালাবাদ এবং সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে।

৩.২.৬ গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন গড়ে মোট প্রায় ৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। গ্যাসক্ষেত্রসমূহ হলো তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা, রশিদপুর, ফেনী এবং সিলেট (সারণি ৭)। এসব গ্যাসক্ষেত্রে মোট ৩৪ টি উৎপাদন কূপের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন চলছে। দুটি গ্যাসক্ষেত্র তথা ছাতক এবং কামতায় পূর্বে একটি করে কূপের মাধ্যমে উৎপাদন চালু থাকলেও বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৬০ সনে ছাতক গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয় এবং ঐ একই বছর সিলেট গ্যাসক্ষেত্র চালু হয়। ১৯৬৮ সনে তিতাস এবং হবিগঞ্জ এবং ১৯৮৩-৮৪ সনে বাখরাবাদ, কৈলাশটিলা ও কামতা গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে উৎপাদন মাত্রার বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৬০ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত প্রথম ২০ বছরে গ্যাস উৎপাদন অল্প হারে বৃদ্ধি পায় মাত্র এবং এ সময়ে উৎপাদনমাত্রা মূলত গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট বা তার কমে সীমাবদ্ধ থাকে (চিত্র ৩.৪)। সে তুলনায় ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সন--এই দশ বছরে গ্যাস উৎপাদন হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। গ্যাস উৎপাদন হার ১৯৮০ সনে প্রতিদিন গড়ে প্রায়

সারণি ৬ : বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে কনডেনসেটের মজুত (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

গ্যাসক্ষেত্র	কনডেনসেট:গ্যাস অনুপাত (ব্যারেল:মিলিয়ন ঘনফুট)	কনডেনসেটের উত্তোলনযোগ্য মজুত (মিলিয়ন ব্যারেল)	ডিসেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত কনডেনসেট উৎপাদন (মিলিয়ন ব্যারেল)	কনডেনসেটের অবশিষ্ট মজুত (মিলিয়ন ব্যারেল)
বিয়ানিবাজার	১৬	১.৮২	০	১.৮২
কৈলাশটিলা	১১	২৭.৫৬	০.৬৬	২৬.৯
জালালাবাদ	১৫	১৫.৭৫	০	১৫.৭৫
রশিদপুর	৩.৬	৪	০	৪
ফেনী	৩	৮.২৩	০.০২	৮.২১
সিলেট	৩.৪	০.৮৯	০.৫১	০.৩৮
বাখরাবাদ	১.৬	২.১৩	০.০৫	২.০৮
তিতাস	১.৫	৩.০২	১.৩৭	১.৬৫
ফেঞ্চুগঞ্জ	২.৫	০.৫২	০	০.৫২
বেলাবো	২	০.৩১	০	০.৩১
মেঘনা	২	০.২১	০	০.২১
হবিগঞ্জ	০.১	০.১	০.০২	০.০৮
অন্যান্য	-	০.১৫	০	০.১৫
মোট	-	৬৪.৬৯	২.৬৩	৬২.০৬

১২০ মিলিয়ন ঘনফুটে থেকে ১৯৯০ সনে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৯৯৫ সনে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুটে পৌছে। ৩.৫ চিত্রে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত এদেশে বার্ষিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এই তথ্যানুযায়ী ১৯৮৩ সনে যেখানে প্রায় ৭৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়, সেখানে ১৯৯০ সনে ১৭০ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৯৯৩ সনে ২১৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। সম্প্রতি সরকার দেশের কয়েকটি ছোট গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য বেসরকারি কোম্পানিকে নিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং ইতোমধ্যে বেশ কিছু বিদেশী কোম্পানি এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে (পেট্রোমিন ১৯৯৪)।

সারণি ৭ ঃ বাংলাদেশে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন (সূত্র: পেট্রোবাংলা, মে ১৯৯৬)।

গ্যাসক্ষেত্র	কূপের সংখ্যা	দৈনিক গড় গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	দৈনিক গড় কনডেনসেট উৎপাদন (ব্যারেল)
তিতাস	১১	২৮০	৩৫০
বাখরাবাদ	৮	১৪০	১৬৫
হবিগঞ্জ	৬	১৬৫	৮
রশিদপুর	৪	৮০	১২০
কৈলাশটিলা	২	৫০	৬৩০
ফেনী	২	২০	৩০
সিলেট	১	৫	২২
কামতা	১	১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদনের পর উৎপাদন স্থগিত	
ছাতক	১	১৯৬০ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদনের পর উৎপাদন স্থগিত	

বাংলাদেশে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ১৩.৪%। এক হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সাল নাগাদ গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট হবে। এ সময় দেশে গ্যাস উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে প্রতিদিন ৯৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হবে বলে মনে করা হয়ে থাকে (পেট্রোলিয়াম পলিসি ১৯৯৩)। বিশেষজ্ঞ মহলের মত এই যে, গ্যাস মজুতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না ঘটলে ২০০০ সাল এবং তার পরবর্তী সময়েও উৎপাদন হার গড়ে প্রতিদিন ৯৫০ থেকে ১০০০ মিলিয়ন ঘন ফুটে সীমাবদ্ধ রাখা সমুচিত হবে।

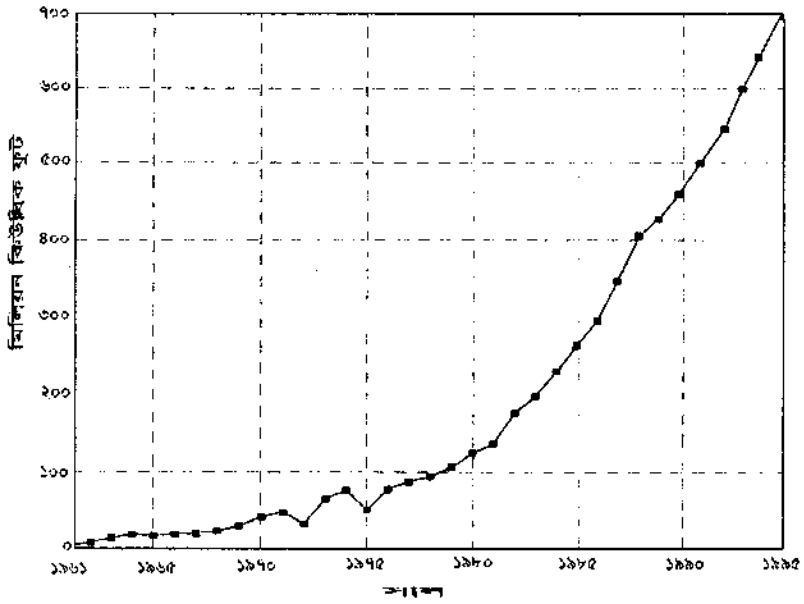

চিত্র ৩.৪ ঃ বাংলাদেশে গড়ে দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন হার (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

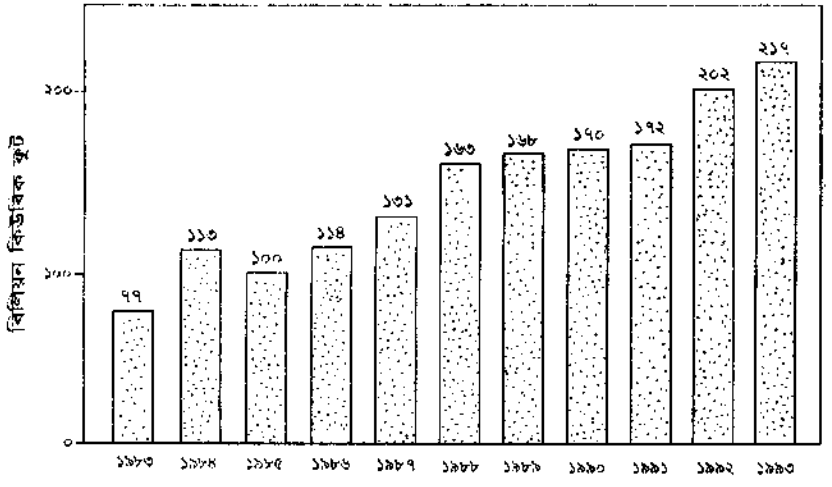

চিত্র ৩.৫ ঃ বাংলাদেশে বার্ষিক প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ (সূত্র: পেট্রোমিন ১৯৯৪)।

১৯৬০ সন থেকে ১৯৯৪ সনের জুন পর্যন্ত দেশে গ্যাসক্ষেত্রসমূহ থেকে মোট প্রায় ২.২১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পেট্রোলিয়াম নীতির (পেট্রোলিয়াম পলিসি ১৯৯৩) প্রতিবেদন অনুযায়ী উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট প্রায় ১০.২০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আগামী ২০১৫ সন নাগাদ নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

কনডেনসেট ঃ বাংলাদেশে ৭টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৩২৫ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হচ্ছে (সারণি ৭)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেশের ভেজা গ্যাসক্ষেত্র যথা বিয়ানিবাজার, কৈলাশটিলা ও জালালাবাদ এর গ্যাসে কনডেনসেটের পরিমাণ অনেক বেশি বিধায়, সে সমস্ত গ্যাসক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হলে কনডেনসেট উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে (প্রক্ষেপিত দৈনিক ১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের সাথে কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ ব্যারেল)। বাংলাদেশে কনডেনসেটের উত্তোলনযোগ্য মোট মজুত প্রায় ৬৪.৬৯ মিলিয়ন ব্যারেল। এর মধ্যে ডিসেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত ২.৬৩ মিলিয়ন ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয় এবং কনডেনসেটের অবশিষ্ট মজুতের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬২.০৬ মিলিয়ন ব্যারেল (সারণি ৬)।

৩.২.৭ গ্যাসের ব্যবহার ঃ বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসই বাংলাদেশের প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধান উৎস। দেশে উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে, কৃত্রিম সার উৎপাদনে (কাঁচামাল হিসেবে), শিল্প ও কলকারখানায় (চা প্রক্রিয়াকরণ ফ্যাক্টরী ও ইটখোলাসহ), বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। উৎপাদিত গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার নিম্নরূপ :

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৩%, সার উৎপাদনে ৩৪%, শিল্প ও কলকারখানায় ১৬%, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ২% এবং গৃহস্থালীতে ৫% (চিত্র ৩.৬)। বাংলাদেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৮৮% উৎপাদিত হয় গ্যাসের ব্যবহারের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক জ্বালানি শক্তির উৎস হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার বিগত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ সনে যেখানে দেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেলের ব্যবহার ছিল ৫২% এবং গ্যাসের ব্যবহার ছিল ৩৭%, সেখানে ১৯৯২-৯৩ সনে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৭০%-এ উন্নীত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের এই বৃদ্ধি আমদানিকৃত তেলের বিকল্প হিসেবে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে সহায়ক হয়েছে।

বর্তমানে গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে যেসব শহরে গ্যাস সরবরাহ করা যায় না, সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ও রান্না ঘরে জ্বালানির কাজে এলপিজি (LPG)-এর ব্যবহার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি থেকে খনিজ তেল

পরিশোধন প্রক্রিয়ায় বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে প্রতি বছর ১০ হাজার টন এলপিজি তৈরি করে ধাতব বোতলে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে গ্যাসক্ষেত্রসমূহে এলপিজি প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশের মোট এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাপক করা গেলে বাণিজ্যিক জ্বালানি হিসেবে এলপিজি আরো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

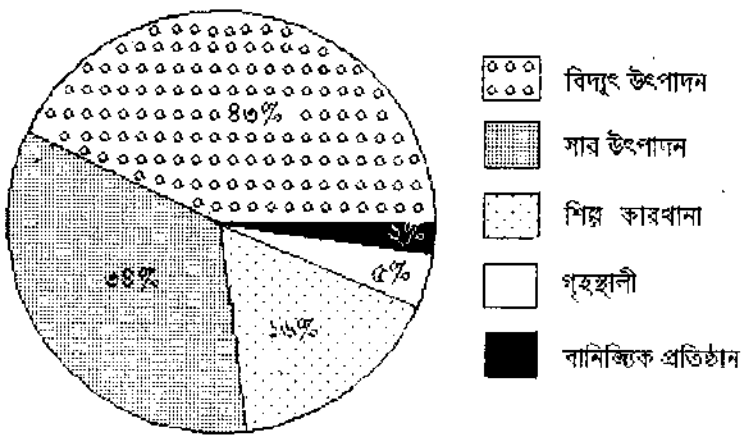

চিত্র ৩.৬ ঃ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারী ব্যবহার (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

প্রাকৃতিক গ্যাসকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সিএনজি বা কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (CNG or Compressed Natural Gas) হিসেবে যানবাহন চালানোর কাজে ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে স্বল্পমাত্রায় সিএনজি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে যানবাহন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল ও পেট্রোল চাহিদা কিছুটা কমবে বলে আশা করা যায়।

৩.৩ বাংলাদেশের খনিজ তেল সম্পদ

খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপত্তি এবং অবস্থানগত সামঞ্জস্যতার কারণে বিশ্বের বহুস্থানে এ দুটি খনিজ সম্পদের সহ-অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে প্রমাণিত হলেও এদেশে খনিজ তেলের আবিষ্কার তুলনামূলকভাবে কম ঘটেছে। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সনে সিলেটের হরিপুরে। হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে ১৯৮৭ সনের

জানুয়ারি মাসে তেল উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশ তেলযুগে পদার্পণ করে। ইতোমধ্যে অবশ্য আরও দুটি স্থানে তথা ফেনচুগঞ্জ-২ এবং কৈলাশটিলা-২ কূপে তেলবাহী শিলাস্তরের সন্ধান পাওয়া যায় যদিও এ দুটি স্থানে তেলের মজুতের পরিমাণ অর্থনৈতিক লাভজনকভাবে উত্তোলনযোগ্য কিনা সে বিষয়ে জরিপ কাজ সম্পূর্ণ হয় নি (সারণি ৮)।

ভূগর্ভে উপরিউক্ত তেলের মজুতসমূহের সন্ধান ছাড়াও বাংলাদেশে একাধিক স্থানে যেমন সিলেটের হারারগঞ্জ ও পাথারিয়া এবং চট্রগ্রাম-পার্বত্য চট্রগ্রামের সীতাকুন্ড ও উঁখানছত্র নামক স্থানে ভূপৃষ্ঠে তেলের বিন্দু আকারে ঝরণের (oil seep) সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও এদেশে খননকৃত একাধিক অনুসন্ধান কূপ যেমন জলদি-৩,

সারণি ৮ : বাংলাদেশে প্রাপ্ত তেলবাহী স্তরসমূহ (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

স্থান	তেল স্তরের গভীরতা(মি:)	তেলের প্রকৃতি	মজুত ও মন্তব্য
হরিপুর তেলক্ষেত্র	২০২০-২০৩৩	গাঢ় বাদামি, মধ্যম ঘনত্ব (২৮.২ ডিগ্রি এপিআই), অল্প সালফার (০.৩%), মোমযুক্ত প্যারাফিনিক	১০ মিলিয়ন ব্যারেল
কৈলাশটিলা-২ কূপ	৩২১৩-৩২২৫	হালকা বাদামি,মধ্যম ঘনত্ব (৩০ ডিগ্রি এপিআই), অল্প সালফার, মোমযুক্ত, প্যারাফিনিক তেল	মজুত নির্ণয় সম্পন্ন হয় নি
ফেঞ্চুগঞ্জ- ২ কূপ	৩০৬৮-৩০৮৩	গাঢ় বাদামি উচ্চ ঘনত্ব (১৭.২ ডিগ্রি এপিআই), অল্প সালফার, মোমযুক্ত প্যারাফিনিক তেল	অর্থনৈতিক মজুত প্রমাণিত হয় নি
পাথারিয়া-৩ ও ৪ কূপ	৮০০	-	অর্থনৈতিক মজুত প্রমাণিত হয়নি

রশিদপুর-২, হাজিপুর-১ ইত্যাদিতে তেলের চিহ্ন (oil show) লক্ষ্য করা গেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করে থাকেন যে, বাংলাদেশের ভূগর্ভে একাধিক স্থানে তেলের উৎপত্তি ঘটেছে এবং তার উল্লেখযোগ্য মজুত একাধিক স্থানে জমা হওয়ার উপযুক্ত ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী আসাম অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তথা শিলার গঠন, শিলা প্রকৃতি ও ইতিহাস বিশেষ করে এদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো। আসাম ইতোমধ্যেই ভারতের অন্যতম প্রধান তেলসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে প্রমাণিত। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বরাবর বৃহদাকার তেলক্ষেত্রসমূহের অবস্থান ছাড়াও বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্ত সংলগ্ন বদরপুর এলাকায় উল্লেখযোগ্য তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরিউক্ত কারণসমূহে ভূতত্ত্ববিদগণ এই মত পোষণ করেন যে,

বাংলাদেশে আরো উল্লেখযোগ্য তেলের মজুত থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে (খান ও অন্যান্য ১৯৮৮)। তবে এদেশে তেল অনুসন্ধানের কাজের মাত্রা বা হার আসাম বা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বহুলাংশে কম। পর্যাপ্ত মাত্রায় তেল অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশে আরো উল্লেখযোগ্য তেলের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে ভূবিজ্ঞানিগণ মত প্রকাশ করেন (ইমাম ১৯৯০)।

৩.৩.১ তেল মজুতসমূহের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশের তেলক্ষেত্রের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের মতোই। প্রাপ্ত তেল মজুতসমূহ পূর্বাঞ্চলের ফোল্ড বেল্টে সাধারণ ঊর্ধ্বভাঁজ (simple anticline) কর্তৃক গঠিত ফাঁদে অবস্থিত। এই ঊর্ধ্বভাঁজসমূহ কখনও বা একাধিক চ্যুতি (fault) দিয়ে প্রভাবিত যা অধিক গভীরে সৃষ্ট তেলকে বিশাল পুরুত্বের শিলাস্তর ভেদ করে ঊর্ধ্বগমনের মাধ্যমে উপরে অবস্থিত ফাঁদে মজুদ শিলায় এসে জমা হতে সাহায্য করে। যদিও ফোল্ড বেল্টের ঊর্ধ্বভাঁজসমূহকে সাধারণত সহজ প্রকৃতির ঊর্ধ্বভাঁজ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে, সাম্প্রতিক তথ্য বিশ্লেষণ এবং কূপ খননের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো ঊর্ধ্বভাঁজকে ক্লে ডায়াপির (clay diapir) কর্তৃক প্রভাবিত অধিকতর জটিল কাঠামো হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (শিকদার ১৯৯২)।

প্রাপ্ত তেলস্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রায় ২০০০ মিটার থেকে প্রায় ৩০০০ মিটার গভীরতার মধ্যে বিদ্যমান বেলেপাথরের মজুত শিলায় অবস্থান করে। এই বেলেপাথরের শিলাস্তরসমূহ মায়োসিন প্লায়োসিন উপযুগের ভুবন সংঘ এবং বোকাবিল সংঘের অন্তর্ভুক্ত। এ দুটি সংঘ মূলত একের পর এক বেলেপাথর ও কাদা শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। এখানে বেলেপাথরের মজুত শিলাস্তরের উপর কাদা শিলাস্তর সীল (seal) হিসেবে কাজ করে ফাঁদ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের খনিজ তেলসমূহের উৎস শিলা (source rock) কোনটি তা এখনও নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা না গেলেও এ পর্যন্ত সম্পাদিত ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এটি প্রতীয়মান হয় যে, বোকাবিল এবং ভুবন সংঘের নিচে অবস্থিত অলিগোসিন যুগের বরাইল সংঘের কাদা শিলাস্তরেই এই তেল সৃষ্টি হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন বাংলাদেশের ভূগর্ভে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ মিটার থেকে ৮০০০ মিটার গভীরতার মধ্যে অবস্থিত তেল দ্বারে (oil window) এই তেল সৃষ্টি হওয়ার পর তা ঊর্ধ্বগমনের মাধ্যমে (সম্ভবত চ্যুতি পথে) উপরে এসে ভূপৃষ্ঠের ২০০০ মিটার থেকে ৩০০০ মিটার গভীরতার মধ্যে ভুবন ও বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের মজুত শিলায় এসে জমা হয়েছে।

বাংলাদেশের হরিপুর তেলক্ষেত্র একটি ছোট আকারের তেলক্ষেত্র। কৈলাশটিলা এবং ফেনচুগঞ্জে প্রাপ্ত তেলমজুতসমূহ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কিনা তা নির্ধারণে নতুন কূপ খননের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসবই দেশের উত্তর-পূর্বাংশে সিলেট

বেসিন অঞ্চলে অবস্থিত। অধুনা সম্পাদিত ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই মত প্রকাশ করা হয় যে, দেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিরাট ঊর্ধ্বভাঁজসমূহে বৃহৎ আকারের তেলক্ষেত্র আবিষ্কারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বেসিন অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক অতীতে তেল সৃষ্টি ও জমা হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তথা গভীর সমুদ্রজাত টারবিডাইট (turbidite) শিলাস্তর জমা হবার প্রমাণ পাওয়াতে ভূবিজ্ঞানিগণ এ অঞ্চলকে তেল সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে গণ্য করেন। সে হিসেবে অনেকে এ অঞ্চলের সাথে ইউরোপের রুমানিয়ার তেল সমৃদ্ধ পেনোনিয়ান বেসিনের (Pannonian basin) তুলনা করে থাকেন । সম্প্রতি ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যে ইছাপুরে তেলের সন্ধান বাংলাদেশের সমতলভূমির নিচে তেল সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল প্রতীয়মান করেছে।

৩.৩.২ হরিপুর তেলক্ষেত্র ঃ ১৯৮৬ সনের ডিসেম্বর মাসে আবিষ্কৃত হরিপুর তেলক্ষেত্র সিলেট শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সিলেট-জয়ন্তিয়া সড়কের পাশ ঘেঁষে অবস্থিত। এই তেলক্ষেত্র সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট-৭ (পরবর্তীতে হরিপুর-১ নামকরণ করা হয়) কূপ খননের সময় অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হয় । হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কার বাংলাদেশে তেল সম্ভাবনার নতুন দিগন্তের সূচনা করে এই কারণে যে, পূর্বের ধারণা মত বাংলাদেশে তেলের সম্ভাবনা কেবল অতি গভীরে (৫০০০ মিটারের বেশি) অবস্থিত বরাইল শিলাস্তরেই সীমিত, তা ভুল প্রমাণিত হয়। হরিপুর তেলক্ষেত্রে তেলের স্তর ভূপৃষ্ঠের নিচে ২০২০ মিটার থেকে ২০৩৩ মিটার গভীরতায় বোকাবিল শিলাস্তরে বিদ্যমান।

(ক) ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ঃ হরিপুর তেলক্ষেত্রটি সিলেট ঊর্ধ্বভাঁজ সৃষ্ট ফাঁদ দিয়ে গঠিত। এই একই ঊর্ধ্বভাঁজ সিলেট গ্যাসক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। সিলেট ঊর্ধ্বভাঁজটি উত্তরপূর্ব-দক্ষিণপশ্চিম বরাবর দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩ কিলোমিটার এবং তা প্রস্থে প্রায় ৩ কিলোমিটার অর্থাৎ এর আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার। এটি চ্যুতি দিয়ে প্রভাবিত একটি অসম ঊর্ধ্বভাঁজ (faulted asymmetrical anticline) (চিত্র ৩.৭)। এই ঊর্ধ্বভাঁজে তেল স্তরের সম্ভাব্য বিস্তৃতি প্রায় ৪ বর্গ কিলোমিটার বলে মনে করা হয়। তেল স্তরের বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য একাধিক মূল্যায়ন কূপ ও উন্নত মানের সাইসমিক জরিপের প্রয়োজন ।

(খ) স্তর ক্রমবিন্যাস ঃ হরিপুর তেলক্ষেত্রে তেলবাহী বেলেপাথরের স্তরটি ভূপৃষ্ঠের নিচে ২০২০ মিটার থেকে ২০৩৩ মিটার গভীরতার মধ্যে বিরাজ করে। এই শিলাস্তর বোকাবিল সংঘের নিম্নাংশে অবস্থিত। বস্তুত মোট ২০৬৫ মিটার গভীর পর্যন্ত খননকৃত হরিপুর তেলক্ষেত্রের আবিষ্কার কূপটি (হরিপুর-১ কূপ) ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে

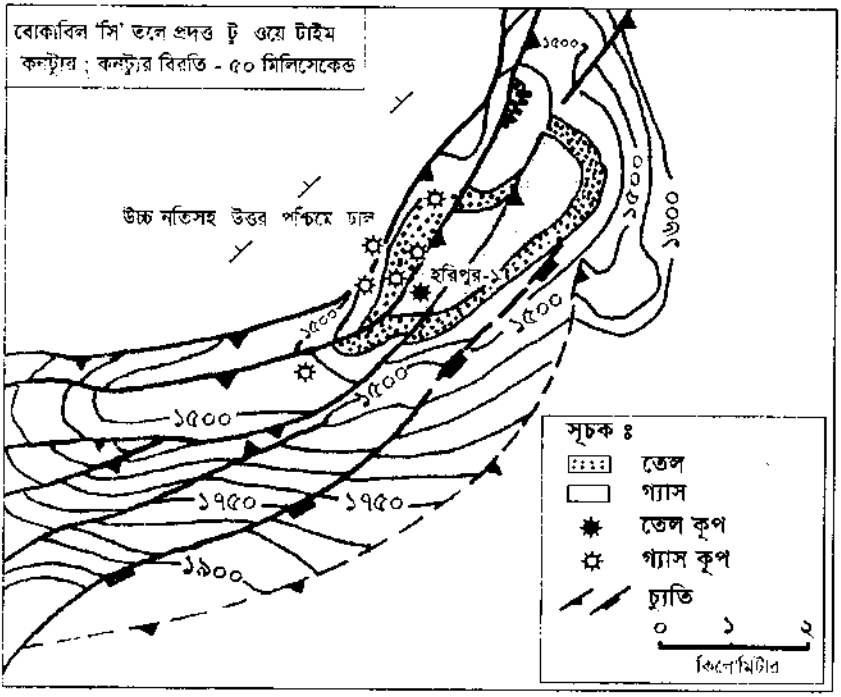

চিত্র ৩.৭ ঃ হরিপুর তেলক্ষেত্রের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো (সূত্র: সিমিটার এক্সপ্লোরেশন লি: ১৯৮৯)।

যথাক্রমে ডুপিটিলা সংঘ , গিরুজান ক্লে সংঘ , তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘ এবং বোকাবিল সংঘকে ভেদ করে চূড়ান্ত গভীরতায় (total depth) পৌঁছে (চিত্র ৩.৮)। এখানে ভূপৃষ্ঠে ডুপিটিলা সংঘের বেলেপাথর উন্মোচিত (exposed) রয়েছে যা এ এলাকায় অল্প উচ্চ টিলা শ্রেণি সৃষ্টি করে ভূ-প্রকৃতিতে অল্প বিস্তর বন্ধুরতার সৃষ্টি করেছে। এখানে মূলত বেলেপাথরের তৈরি ডুপিটিলা সংঘের পুরুত্ব প্রায় ১৩৫ মিটার। তার নিচে ক্রমান্বয়ে, মূলত কাদা শিলার তৈরি প্রায় ৬০ মিটার পুরু গিরুজান ক্লে সংঘ এবং মূলত বেলেপাথরের তৈরি প্রায় ৯২০ মিটার পুরু তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘ অবস্থান করে। এর নিচে তেলবাহী বোকাবিল সংঘের অবস্থান। এখানে বোকাবিল সংঘের প্রায় ৯৫০ মিটার শিলাস্তর খনন করা হয়েছে যা একের পর এক বেলেপাথর এবং কাদা শিলাস্তর সমন্বয়ে গঠিত। বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের স্তরসমূহকে উপর থেকে নিচে 'এ' স্যান্ড ('A' sand), 'বি' স্যান্ড ('B' sand), 'সি' স্যান্ড ('C' sand), 'ডি' স্যান্ড ('D' sand) এবং 'ই' স্যান্ড ('E' sand) এ ভাগ করা হয়েছে (চিত্র ৩.৮)। হরিপুর তেলক্ষেত্রে হরিপুর-১ কূপে কেবল এই শেষোক্ত বোকাবিল 'ই' স্যান্ড স্তরটি তেলবাহী এবং এই স্তরটি থেকেই

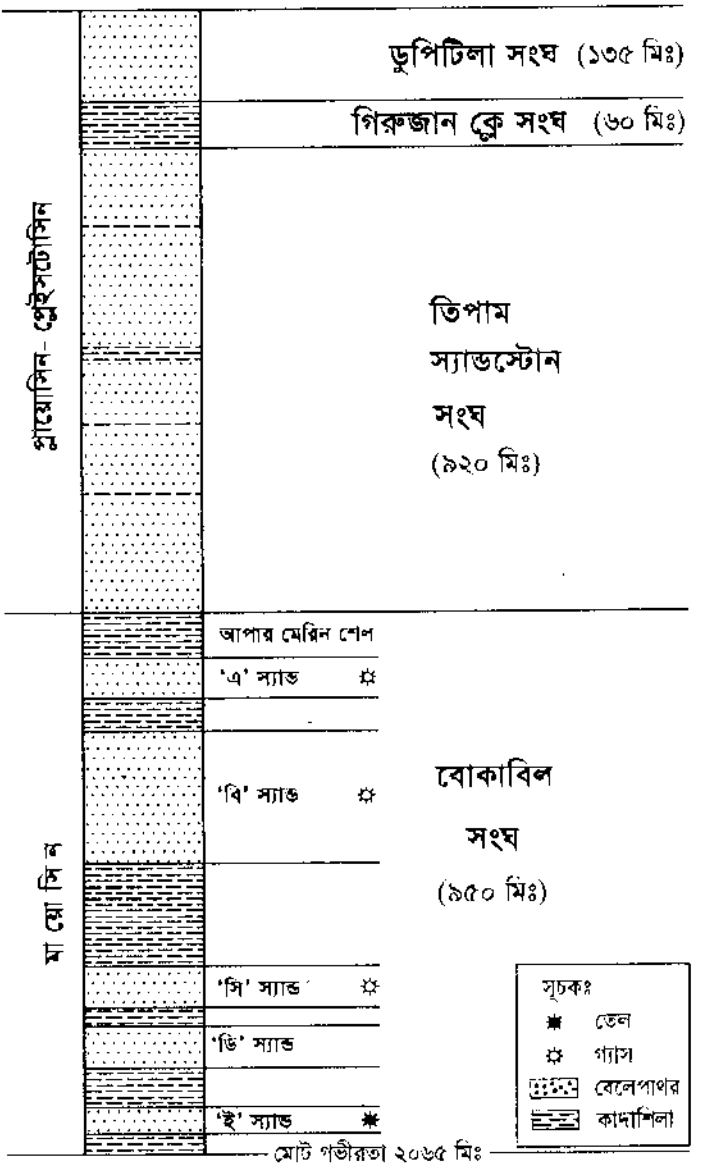

চিত্র ৩.৮ ঃ হরিপুর তেলক্ষেত্রের স্তরক্রমবিন্যাস (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

হরিপুর তেলক্ষেত্রের তেল উৎপাদন করা হয়। উপরে অবস্থিত 'এ' স্যান্ড এবং 'বি' স্যান্ড স্তর দুটি গ্যাসবাহী এবং তা সিলেট গ্যাসক্ষেত্রের মূল গ্যাসের মজুত ধারণ করে। হরিপুর তেলক্ষেত্রে বেলেপাথরের মজুত শিলা মধ্যম মানের ফাঁকা স্থান (porosity) এবং প্রবেশ্যতা (permeability) সংবলিত।

(গ) তেলের গুণাগুণ ঃ হরিপুর ক্ষেত্রের তেল গাঢ় বাদামি রঙের প্যারাফিনিক শ্রেণির মোমযুক্ত তেল। উৎসগত এবং গুণগতমানের দিক থেকে এই তেল আসামে প্রাপ্ত তেলের সমগোত্রীয়। হরিপুর তেলের ঘনত্ব মধ্যম মাত্রার এবং এর এপিআই গ্রাভিটি (API gravity) মান ২৮.২ ডিগ্রি। এই তেলে ৯.৬% মোম রয়েছে এবং এর পোর পয়েন্ট (pour point) মান ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। মোমের আধিক্য হেতু এই তেল উৎপাদনের কোনো কোনো পর্যায়ে, বিশেষ করে শীতকালে উৎপাদন কূপে জমা হওয়া মোম পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হরিপুর তেলে অল্প পরিমাণ (০.৩%) সালফার রয়েছে। পরিশোধনাগারে আলাদা করা এই তেলের উপাদানসমূহ হচ্ছে ঃ পেট্রোল ১৮%, কেরোসিন ১৭%, গ্যাস অয়েল ৩৫%, লুব্রিকেটিং তেল ও অবশিষ্টাংশ ৩০%। হরিপুরের তেলের প্যারাফিনিক মোমযুক্ত প্রকৃতি এবং এর ভিতর প্রচুর পরিমাণ বাইকেডিনেন (bicadinane) এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, তা মহাদেশীয় ভূখণ্ডের উদ্ভিদ জাতীয় জৈবিক পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে (আলম ও পিয়ারসন ১৯৯০)। একই প্রকৃতির তেল আসাম, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রুনাই অঞ্চলেও পাওয়া যায়।

(ঘ) তেলের মজুত ঃ হরিপুর তেলক্ষেত্রে তেলের মোট মজুতের (Stock tank oil originally in place বা সংক্ষেপে STOOIP) পরিমাণ ৮ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে ১০ মিলিয়ন ব্যারেল ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য পরবর্তী অপর এক হিসাব অনুযায়ী মোট মজুতের (STOOIP) পরিমাণ ১৫ থেকে ২১ মিলিয়ন ব্যারেল বলে মত প্রকাশ করা হয় (আরেফিন ও অন্যান্য ১৯৯২)। এর অতিরিক্ত আরো প্রায় ৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুত থাকার সম্ভাবনাও ধরা হয়েছে। অবশ্য এই তেলক্ষেত্রে উত্তোলনযোগ্য মজুতের পরিমাণ ধরা হয় প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল (পেট্রোবাংলা ১৯৯৩)। এ হিসেবে হরিপুর তেলক্ষেত্র একটি ছোট তেলক্ষেত্র।

তেলের মজুত নির্ণয়ে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভল্যুমেট্রিক পদ্ধতিতে (volumetric method) তেলের মজুত নির্ধারণ করার জন্য ভূগর্ভে তেল স্তরের বিস্তৃতি, তেল স্তরের পুরুত্ব, মজুত শিলায় ফাঁকা স্থানের পরিমাণ ইত্যাদি মান ব্যবহার করা হয়। তেল স্তরের সঠিক বিস্তৃতি নির্ণয়ে আবিষ্কার কূপের বাইরে মূল্যায়ন কূপ খনন আবশ্যক। এর বিকল্প হিসেবে প্রাথমিকভাবে তেলক্ষেত্রের ভূতাত্ত্বিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে মজুত শিলার একটি সম্ভাব্য বিস্তৃতি ধরে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স (material balance) পদ্ধতিতে তেলক্ষেত্রে মজুত নির্ধারণ করতে তেল উৎপাদন

সময়কালে তেল মজুতের চাপ ও তেল উৎপাদন মাত্রার হারসমূহের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ভলুমেট্রিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত মান অনুযায়ী হরিপুর তেলক্ষেত্রে প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুত (STOOIP) রয়েছে। এদিকে ১৯৮৭ সনের শেষে পেট্রোবাংলার বিদেশী পরামর্শক অয়েল এন্ড মাইনিং সারভিসেস (Oil and Mining Services) ম্যাটেরিয়াল ব্যালান্স পদ্ধতিতে নির্ধারিত মজুত হিসাবে প্রায় ৮ মিলিয়ন ব্যারেল দেখায়। ১৯৯২ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এক হিসাবে হরিপুরে তেলের মোট মজুত (STOOIP) ১৫ থেকে ২১ মিলিয়ন ব্যারেল বলে মত প্রকাশ করে (আরেফিন ও অন্যান্য ১৯৯২)। হরিপুরে এই তেলের উত্তোলনযোগ্যতা বিভিন্নভাবে ২৫% থেকে ৬০% দেখানো হয়ে থাকে।

হরিপুর তেলক্ষেত্রে মজুত নির্ধারণে তুলনামূলকভাবে অপর্যাপ্ত উপাত্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে বলে নির্ধারিত মজুতের পরিমাণকে চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করা যায় না। হরিপুর তেলক্ষেত্রটির জন্য আবিষ্কার পরবর্তী সময়ে যথার্থভাবে মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি, বরং কেবল আবিষ্কার কূপ সিলেট-৭ (অর্থাৎ হরিপুর-১) থেকেই তেল উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভূবিজ্ঞানিগণ মত প্রকাশ করেন যে, যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তথা উন্নত মানের সাইসমিক জরিপ এবং মূল্যায়ন কূপ খননের মাধ্যমে তেলক্ষেত্রটি যথার্থ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

(ঙ) তেল উৎপাদন ঃ বাংলাদেশ ১৯৮৭ সনের জানুয়ারি মাস থেকে হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে তেল উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে তেল যুগে প্রবেশ করে। প্রথম কয়েক বছর তেল উৎপাদন হার প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ব্যারেল থাকলেও পরবর্তীতে তা কমতে থাকে এবং ১৯৯৪ সনের প্রথম দিকে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১০০ ব্যারেল বা তার কমে এসে পৌঁছে। ১৯৯৪ সনের জুলাই মাস থেকে হরিপুর তেলক্ষেত্রে তেল উৎপাদন স্থগিত রয়েছে। এই তেলক্ষেত্রে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত মোট প্রায় ০.৫৬ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয়। ৯ সারণিতে হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে প্রতি অর্থ বছরে (জুলাই থেকে জুন) উৎপাদিত তেলের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হরিপুর তেলক্ষেত্রে তেল উৎপাদন কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে (primary recovery) করা হয়েছে। উল্লিখিত তেল, আধারের নিজস্ব শক্তির (reservoir drive) মাধ্যমেই উৎপাদিত হয়েছে এবং এতে পাম্প বা অন্য কোনো প্রকার কৃত্রিম সাহায্য গ্রহণ করা হয় নি। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে কারিগরি জটিলতাই হরিপুরে তেল উৎপাদন স্থগিত হওয়ার কারণ। বস্তুত উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই হরিপুর তেলক্ষেত্রে যথাযথভাবে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। পর্যবেক্ষকগণ মনে করে থাকেন যে, হরিপুর তেলক্ষেত্র দেশীয় তেল অনুসন্ধানী সংস্থা পেট্রোবাংলা কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়ার পর উৎপাদন পর্যায়ে তৎকালীন সরকার কর্তৃক অযৌক্তিকভাবে একটি বিতর্কিত বিদেশী

তেল কোম্পানির হাতে অর্পণ (৭নং কূপ ছাড়া অবশিষ্ট তেলক্ষেত্র) করার ফলে যথার্থ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয় (ইমাম ১৯৯০)।

সারণি ৯ ঃ হরিপুর তেলক্ষেত্রে তেল উৎপাদন (সূত্র : পেট্রোবাংলা)

অর্থ-বছর (জুলাই-জুন)	মোট প্রকৃত উৎপাদন (ব্যারেল)
১৯৮৬ -৮৭ (উৎপাদন শুরু জানুয়ারি ৮৭)	৬১,৩৪০
১৯৮৭- ৮৮	৫১,২২০
১৯৮৮-৮৯	৬১,৯৪০
১৯৮৯-৯০	১২২,০৫০
১৯৯০-৯১	৯৯,৪৩০
১৯৯১-৯২	৭৬,১৪০
১৯৯২-৯৩	৫৩,১৮০
১৯৯৩-৯৪	৩৪,৬৬০
মোট	৫৬০,০০০

৩.৩.৩ কৈলাশটিলা তেল মজুত ঃ কৈলাশটিলা তেল মজুত আবিষ্কারের সাথে হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কারের মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস স্তরসমূহের নিচে অধিকতর গভীরতায় তেলস্তর পাওয়া যায়। কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রটি ১৯৬২ সনে আবিষ্কৃত হয়। এই গ্যাসক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের নিচে যথাক্রমে প্রায় ২২৮০ মিটার, ২৯৪৫ মিটার এবং ২৯৯০ মিটার গভীরতায় তিনটি গ্যাস স্তর রয়েছে। ১৯৮৮ সনে কৈলাশটিলা-২ কূপটি খননকালে অধিকতর গভীরতায় ১টি তেলস্তর আবিষ্কৃত হয় এবং এখান থেকে পরীক্ষামূলকভাবে তেলের প্রবাহ ঘটানো হয় যদিও কারিগরি জটিলতার কারণে তেল আধারের (reservoir) ব্যাপ্তি ও তেলের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি। তবে বিভিন্ন উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ধারণা করা হয় যে, তেলস্তরটি ১নং কূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এ তেলস্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩২১৩ মিটার থেকে প্রায় ৩২২৫ মিটার গভীরতার মধ্যে অবস্থিত। এ তেল হালকা বাদামি রঙের এবং মোমযুক্ত প্যারাফিনিক শ্রেণির এবং এর এপিআই গ্রাভিটি

(API gravity) মান ৩০ ডিগ্রি। এ তেল হরিপুর তেলের সমগোত্রীয়। ভূবিজ্ঞানিদের ধারণা কৈলাশটিলায় কূপসমূহে অধিকতর গভীরতায় তেলবাহী আরো স্তরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কৈলাশটিলা-২ কূপে প্রাপ্ত তেল আধারের যথার্থ মূল্যায়ন এবং সেখান থেকে তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা এই স্থানে পুনরায় কূপ খননের পরিকল্পনা করেছে।

৩.৩.৪ বাংলাদেশে তেলের চাহিদা ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে তেল চাহিদা ও ব্যবহারের হার প্রতিদিন প্রায় ৪৫,০০০ ব্যারেল। এর প্রায় পুরোটাই বিদেশ (মধ্যপ্রাচ্য) থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ ব্যারেল তেল পরিশোধন করবার ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের একমাত্র তেল পরিশোধনাগার চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে এই খনিজ তেল পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়। বাকি চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে পরিশোধিত তেলজাত পদার্থ আমদানি করা হয়। বাংলাদেশের মোট তেল চাহিদার প্রায় ৫০% ডিজেল, ২৫% কেরোসিন, ১০% ফুয়েল অয়েল এবং ৮% পেট্রোলের চাহিদা রয়েছে। দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে তেল ও তেলজাত পদার্থের চাহিদা ২.৫% থেকে ৩.০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ১৫ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তেল ও তেলজাত দ্রব্য আমদানি করে থাকে এবং এই খাতে প্রতি বছর ব্যয় করতে হয় প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা।

--

চতুর্থ অধ্যায়

কয়লা ও পীট

(Coal and Peat)

৪.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি

স্কপ্‌ফ্‌ (১৯৬৫) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কয়লা হলো ৭০% ভাগেরও বেশি অঙ্গারময় (carbonaceous) পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত সহজে দাহ্য এক শ্রেণির শিলাবিশেষ, যা উদ্ভিদজাত পদার্থ থেকে ভূগর্ভের চাপ ও তাপের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদজাত পদার্থ সুবিধাজনক স্থানে জমা হয়ে ভূগর্ভে অল্প গভীরতায় আংশিক পচন ও দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ছিদ্রযুক্ত (porous) জৈবিক সমষ্টি পীট (peat) - এ পরিণত হয়। এ পীট ভূগর্ভে আরো অধিক গভীরতায় উচ্চতর চাপ এবং তাপের সাহায্যে কয়লাকরণ (coalification) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়লায় পরিণত হয়। এ কয়লাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পীট পর্যায়ক্রমে উচ্চতর কয়লা শ্রেণি (higher rank coal) অর্থাৎ প্রথমে লিগনাইট (lignite), তারপর বিটুমিনাস (bituminous) এবং সবশেষে এনথ্রাসাইট (anthracite) কয়লায় পরিণত হয়। কয়লাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়লা উচ্চতর শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে তার ভিতর কার্বন বৃদ্ধি পায়, উদ্বায়ী (volatile) পদার্থ হ্রাস পায় এবং কয়লার তাপ সৃষ্টির ক্ষমতা তথা ক্যালরিফিক মান বৃদ্ধি পায়।

৪.১.১ কয়লার মান নির্ধারক গুণাবলি ঃ (ক) তাপ উৎপাদন ক্ষমতা (heating power) ঃ কয়লার তাপ উৎপাদন ক্ষমতাই তার অন্যতম প্রধান মান নির্ধারক। এই তাপ উৎপাদন ক্ষমতা কয়লার ক্যালরিফিক মান (calorific value) দিয়ে নির্দেশ করা হয় এবং তা বিট্রিশ থারমাল ইউনিট বা সংক্ষেপে বিটিইউ (btu) এককের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয় । এক পাউন্ড কয়লা পোড়ালে যে পরিমাণ তাপের বিকিরণ হবে, তাই ঐ কয়লার ক্যালরিফিক মান। এক বিটিইউ হলো সেই পরিমাণ তাপ যা এক পাউন্ড পানির তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বৃদ্ধি করে। কয়লার শ্রেণিভেদে (coal rank) তার ক্যালরিফিক মান ৫০০০ বিটিইউ থেকে ১৫০০০ বিটিইউ পর্যন্ত হতে পারে।

(খ) আর্দ্রতা (moisture) ঃ নিম্নমানের কয়লায় আর্দ্রতা বেশি এবং উচ্চমানের কয়লায় আর্দ্রতা কম থাকে। সাধারণভাবে লিগনাইট কয়লায় সর্বোচ্চ প্রায় ৪৩% আর্দ্রতা এবং এনথ্রাসাইট কয়লায় সর্বনিম্ন প্রায় ৪% আর্দ্রতা লক্ষ্য করা যায়।

(গ) উদ্বায়ী পদার্থ (volatile matter) ঃ কয়লায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণের কার্বন -ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকে। এছাড়াও কিছু হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসও থাকে এবং শেষোক্ত গ্যাসসমূহ কয়লার তাপ উৎপাদন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। কোনো কোনো বিটুমিনাস কয়লার তাপ উৎপাদন ক্ষমতা হাইড্রোজেন ও হাইড্রোকার্বন উদ্বায়ী পদার্থের উপস্থিতির কারণে এনথ্রাসাইট কয়লার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে।

(ঘ) স্থির কার্বন (fixed carbon) ঃ যে কার্বন অন্য মৌলিক পদার্থের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে না তাকে স্থির কার্বন বলে। স্থির কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কয়লার মানও বৃদ্ধি পায়। উচ্চমানের এনথ্রাসাইট কয়লায় স্থির কার্বনের পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৯৬% এবং নিম্নমানের লিগনাইট কয়লায় স্থির কার্বনের পরিমাণ সর্বনিম্ন প্রায় ৩৮% হতে পারে।

(ঙ) ছাই (ash) ঃ কয়লা পোড়াবার পর যে ছাই অবশিষ্টাংশ হিসেবে পড়ে থাকে তা কয়লার ভিতর অবস্থিত অজৈব পদার্থ তথা খনিজ মণিক (mineral) কণা থেকে উদ্ভূত হয়। কয়লায় কাদা মণিক (clay mineral), সিল্ট (silt), কোয়ার্টজ (quartz), কার্বনেট, আয়রন অক্সাইড বা সালফার যৌগ কণাসমূহ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক খনিজ উপাদান হিসেবে কয়লার মানের অবনতি ঘটায়।

(চ) সালফার (sulphur) ঃ কয়লায় সালফার যৌগ কণাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক উপাদান, তাই এর উপস্থিতি বিশেষভাবে পরিমাপ ও বিবেচনা করা হয়। কয়লার ভিতর সালফার সাধারণত পাইরাইট (pyrite) ও মারকাসাইট (marcasite) মণিক হিসেবে থাকে। এই মনিকসমূহ কয়লা পোড়ানোর সময় অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে যা পরিবেশকে দূষিত করে থাকে। সে হিসেবে অধিক সালফারযুক্ত কয়লার মান ও চাহিদা কম হয়ে থাকে। কয়লায় সালফারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তাকে অল্প সালফার কয়লা (০ থেকে ১% সালফার), মধ্যম সালফার কয়লা (১% থেকে ৩% সালফার) এবং উচ্চ সালফার কয়লা (৩% এর বেশি সালফার) হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪.১.২ কয়লার শ্রেণিবিভাগ ঃ উদ্ভিদজাত জৈবিক পদার্থ থেকে কয়লা সৃষ্টি হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে যে পীট সৃষ্টি হয় তাকে কয়লা বলা হয় না বটে তবে সব কয়লাই আদি অবস্থায় পীট হিসেবে বিরাজ করে। পীট থেকে রূপান্তরিত উচ্চতর শ্রেণির কয়লাসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয় (চিত্র ৪.১)।

(ক) লিগনাইট (lignite) বা ব্রাউন কোল (brown coal) ঃ লিগনাইট কয়লা তার ঘন বাদামি বা কালচে বাদামি রঙের জন্য ব্রাউন কোল নামেও পরিচিত। এ কয়লা পীটের চেয়ে শক্ত, স্তরযুক্ত এবং এর ভিতর কখনও বা কাঠের অংশবিশেষ দৃশ্যমান

হয়। এই কয়লায় আর্দ্রতার আধিক্য হেতু তা শুকালে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে নিম্নমাত্রায় স্থির কার্বন থাকে এবং এর ক্যালরিফিক মান খনি থেকে আহরিত অবস্থায় প্রায় ৫৫০০ থেকে ৭০০০ বিটিইউ হয়ে থাকে।

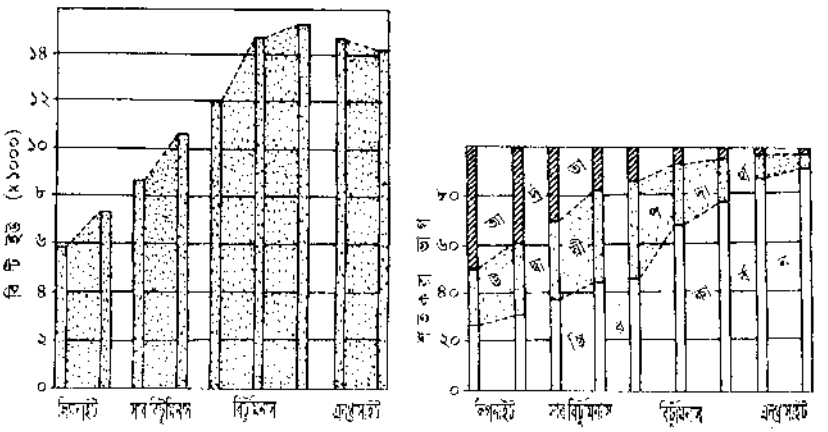

চিত্র ৪.১ ঃ কয়লার শ্রেণিবিভাগ (সূত্র: জেনসন ও বেটম্যান ১৯৮১)।

(খ) সাববিটুমিনাস কয়লা (sub-bituminous coal) ঃ এই কয়লা লিগনাইট ও বিটুমিনাস শ্রেণিদ্বয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এটি অনুজ্জ্বল, কালো এবং স্তরীভূত হয়ে থাকে। এ কয়লা সমতলে (horizontal plane) ভাঙ্গে বটে তবে বিটুমিনাস কয়লার মত খাড়াতলে (vertical plane) ভাঙ্গে না। এ কয়লার ক্যালরিফিক মান ৮০০০ বিটিইউ থেকে ১০,০০০ বিটিইউ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ কয়লা মধ্যম মানের জ্বালানি হিসেবে পরিচিত।

(গ) বিটুমিনাস কয়লা (bituminous coal) ঃ এ কয়লা ঘন, শক্ত, ভঙ্গুর এবং গাঢ় কালো হয়ে থাকে। এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এটি সমতলে এবং খাড়াতলে উভয় দিকে ভাঙ্গে যার ফলে এ কয়লা ভেঙ্গে বর্গতল রূপ (cubic form) নিয়ে থাকে। এই কয়লায় আর্দ্রতা কম মাত্রায়, উদ্বায়ী পদার্থ মধ্যম মাত্রায় এবং স্থির কার্বন উচ্চমাত্রায় থেকে থাকে। এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বেশি এবং এর ক্যালরিফিক মান ১২,০০০ বিটিইউ থেকে ১৪,০০০ বিটিইউ পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিটুমিনাস কয়লাকে এর ভিতর অবস্থানরত উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে উচ্চ উদ্বায়ী (high volatile), মধ্যম উদ্বায়ী (medium volatile) এবং নিম্ন উদ্বায়ী (low volatile) – এই তিনটি উপভাগে ভাগ করা হয়। সমগ্র বিশ্বে বিটুমিনাস কয়লাই সর্বাপেক্ষা বেশি আহরণ এবং ব্যবহার করা হয় এবং এ কয়লাকে সর্বোত্তম মানের কয়লা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

web

(ঘ) এনথ্রাসাইট কয়লা (anthracite coal) ঃ এ কয়লা সর্বাপেক্ষা কঠিন ও শক্ত এবং তা উজ্জ্বল গাঢ় কালো রং এর হয়ে থাকে। এটি ভঙ্গুর এবং তা ভাঙ্গলে কনকয়ডাল ফাটলের (conchoidal fracture) সৃষ্টি করে। এই কয়লায় স্থির কার্বনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি এবং উদ্বায়ী পদার্থ সর্বাপেক্ষা কম থাকে। এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বেশি এবং ক্যালরিফিক মান ১৪,০০০ বিটিইউ থেকে ১৫,০০০ বিটিইউ হয়ে থাকে। এনথ্রাসাইট কয়লা উন্নতমানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪.২ বাংলাদেশের কয়লা সম্পদ

৪.২.১ অনুসন্ধান ও আবিষ্কার ঃ বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমির নিচে বিরাট আকারের কয়লা সম্পদের মজুত থাকার সম্ভাবনা একশত বছরেরও পূর্বে ভূতত্ত্ববিদগণ ব্যক্ত করেন। ১৮২৯ সনে বৃটিশ ভূতত্ত্ববিদ রুপার্ট জোনস পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ কয়লাখনি উদ্বোধনকালে এই মত ব্যক্ত করেন যে, একই প্রকারের কয়লাস্তর পূর্ব দিকে উত্তরবঙ্গের ভূগর্ভে থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তীতে ১৮৫৬ সনে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের অপর ভূবিজ্ঞানী এফ. ম্যালেট উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাবাণীর সপক্ষে ভূতাত্ত্বিক যুক্তি পুনর্ব্যক্ত করেন। ভূবিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত মতের ভিত্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গের কয়লাসমৃদ্ধ অঞ্চল এবং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল তথা বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর এলাকার ভূগর্ভের ভূতাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতা। উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাবাণী করার প্রায় একশত বছর পর বগুড়া অঞ্চলে ১৯৫৯ সনে সর্বপ্রথম কূপ খনন করা হলে তা সত্য প্রমাণিত হয়। ১৯৫৯ সনে আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি (Standard Vacuum Oil Company) বগুড়ায় তেল অনুসন্ধান কাজে একটি গভীর কূপ কুচমা-১ খননকালে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৩৮০ মিটার নিচে পুরু কয়লাস্তরের সন্ধান পায়। এই সন্ধান বাংলাদেশে কয়লা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি নূতন দিগন্তের উন্মোচন করে। কুচমা কূপে কয়লার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর উত্তরবঙ্গে আরো স্বল্প গভীরতায় কয়লার সন্ধান লাভের জন্য ১৯৬১ সনে জাতিসংঘের আর্থিক সহযোগিতায় ইউ এন - পাক মিনারেল সার্ভে (UN-PAK Mineral Survey) নামে এক অনুসন্ধান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের অধীনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ জয়পুরহাট-বগুড়া জেলায় ১০ টি অনুসন্ধান কূপ খনন করলে ১৯৬২ সনে জামালগঞ্জ-পাহাড়পুর এলাকায় তুলনামূলকভাবে স্বল্প গভীরতায় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের নিচে ৬৪০ মিটার থেকে ১১৫৮ মিটারের মধ্যে বিরাট কয়লার মজুত আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশের ভূগর্ভে এই দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কয়লা মজুতের আবিষ্কার ভূতত্ত্ববিদগণকে আশান্বিত করে এবং আরো স্বল্প গভীরতায় কয়লা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় উদ্যোগী করে তোলে। এর ফলে ১৯৮৫ সনে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় ভূপৃষ্ঠের নিচে মাত্র প্রায় ১১৮ মিটার থেকে প্রায় ৫০০ মিটারের মধ্যে অপর একটি বিরাট কয়লা মজুতের আবিষ্কার

ঘটে। ১৯৮৯ সনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ রংপুর জেলার খালাশপীর নামক স্থানে দেশের চতুর্থ কয়লা মজুতের আবিষ্কার ঘটায়। খালাশপীরে কয়লা মজুতটি স্বল্প গভীরতা তথা ভূপৃষ্ঠের নিচে প্রায় ২৫৭ মিটার থেকে ৪৫০ মিটারের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৫ সনে দেশের পঞ্চম কয়লা মজুতটি দিনাজপুর জেলার দীঘিপাড়া নামক স্থানে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫০ মিটার গভীরতায় আবিষ্কৃত হয়।

উপরিউক্ত অনুসন্ধান কাজ এবং আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাঁচটি স্থানে যথা কুচমা, জামালগঞ্জ, বড়পুকুরিয়া, খালাশপীর এবং দীঘিপাড়া এলাকায় গন্ডোয়ানা কয়লার উল্লেখযোগ্য মজুত প্রমাণিত হয় (সারণি ১০)। তবে কুচমাতে এবং জামালগঞ্জে আবিষ্কৃত কয়লা স্তরের গভীরতা অনেক বেশি হওয়ায় কারিগরি দিক থেকে এই কয়লা সরাসরিভাবে খনন ও উত্তোলনযোগ্য নয়। অন্য তিনটি কয়লা মজুত তথা বড়পুকুরিয়া, খালাশপীর এবং দীঘিপাড়ার ক্ষেত্রে কারিগরি দিক থেকে কয়লা আহরণযোগ্য এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হয়। আবিষ্কার পরবর্তী সময়ে জরিপের মাধ্যমে কয়লাক্ষেত্রসমূহের ভূতাত্ত্বিক গঠন, কয়লার মজুত, বিস্তৃতি, প্রকৃতি, খনন এবং উত্তোলন সম্ভাবনা যাচাই করা হয়। এই জরিপে প্রমাণিত হয় জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে ১০৫৩ মিলিয়ন টন, বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রে ৩০৩ মিলিয়ন টন এবং খালাশপীর কয়লাক্ষেত্রে ৪০০ মিলিয়ন টন কয়লার মজুত রয়েছে (সারণি ১০)। ইতোমধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে একটি ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি স্থাপনের কাজ ১৯৯৪ সনের জুন মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এই কয়লাখনি থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে কয়লাস্তর তুলনামূলকভাবে বেশি বিধায় সেখান থেকে সরাসরি কয়লা উত্তোলন না করে কূপ খননের মাধ্যমে কয়লাস্তরে সঞ্চিত মিথেন গ্যাস উত্তোলনের জন্য ভূতত্ত্ববিদগণ মত প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, কয়লাস্তরে সঞ্চিত এই মিথেন গ্যাসকে কোল বেড মিথেন (coal bed methane বা সংক্ষেপে CBM) বলা হয়ে থাকে এবং বর্তমান বিশ্বে একাধিক দেশে ভূগর্ভস্থ কয়লাস্তর থেকে কূপের মাধ্যমে মিথেন গ্যাস আহরণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কয়লা অনুসন্ধানে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ পূর্ব থেকেই নিয়োজিত রয়েছে। এ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিকভাবে বগুড়া শেলফ এবং রংপুর স্যাডল অঞ্চলে ভূপদার্থিক মাধ্যাকর্ষণ জরিপের (gravity survey) ভিত্তিতে ১৫টি সম্ভাব্য গন্ডোয়ানা বেসিন শনাক্ত করা হয় (চিত্র ৪.২) (নেহালউদ্দিন ও ইসলাম ১৯৯২)। বুগার গ্রাভিটি এনোম্যালি (Bouger gravity anomaly) ম্যাপে এই সমস্ত বেসিন এলাকা ন্যূনতম গ্রাভিটি মানের (gravity minima) সাহায্যে চিহ্নিত হয়। এদের মধ্যে ৬টি বেসিন কূপ খননের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় যার ৫টিতেই (বড়পুকুরিয়া

সারণি ১০ ঃ বাংলাদেশের গন্ডোয়ানা কয়লা মজুতসমূহ (সূত্র : পেট্রোবাংলা ১৯৯৪ খ)।

কয়লা বেসিন/প্রাপ্তিস্থান	আবিষ্কার সন	কয়লা স্তরের গভীরতা (মিটার)	কয়লা স্তরের একত্রীভূত গড় পুরুত্ব (মিটার)	কয়লা স্তরের সংখ্যা	কয়লাক্ষেত্রের বিস্তৃতি (বর্গ কি.মি.)	মজুত (মিলিয়ন টন)	মন্তব্য
বড়পুকুরিয়া	১৯৮৫	১১৮ - ৫০১	৫১	৬ টি	৫.২৫	৩০০	ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি স্থাপনের কাজ চলছে
খালাশপীর	১৯৮৯	২৫৭ -৪৫১	২৯	৬ টি	৫.৭৫	৪০০	লাভজনকভাবে কয়লা উত্তোলনযোগ্য
দীঘিপাড়া	১৯৯৫	২৩০	-	-	-	-	জরিপ কাজ চলছে
জামালগঞ্জ	১৯৬২	৬৪০ -১১৫৮	৬৪	৭ টি	১১.৭	১০৫৩	লাভজনকভাবে কয়লাস্তর থেকে মিথেন গ্যাস উৎপাদন সম্ভব
কুচমা	১৯৫৯		-	-	-	-	মজুত নির্ণয় করা হয়নি

খলাশপীর, দীঘিপাড়া, জামালগঞ্জ ও কুচমা) কয়লাস্তরের উল্লেখযোগ্য মজুত আবিষ্কৃত হয়। ভূ-বিজ্ঞানিগণ মনে করেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে ন্যূনতম মাধ্যাকর্ষণ মান (gravity minimum) ভিত্তিক শনাক্তকৃত অন্যান্য গন্ডোয়ানা বেসিনসমূহে কূপ খননের মাধ্যমে পরীক্ষা করলে স্বল্প গভীরতায় আরো কয়লা মজুতের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক কয়লা অনুসন্ধানকারী কোম্পানি ব্রোকেন হিল প্রপাইটার ইন্টারন্যাশনাল বা সংক্ষেপে বি এইচ পি (BHP) বাংলাদেশে কয়লা অনুসন্ধানে কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে ১৯৯৪ সনের আগস্ট মাসে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক এই কোম্পানিটি রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় কয়েকটি ব্লক ইজারা নেয় এবং কয়লা অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়।

৪.২.২ কয়লাক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশে প্রাপ্ত উল্লেখিত কয়লার মজুতসমূহ গন্ডোয়ানা কয়লার শ্রেণিভুক্ত এবং সে হিসেবে এ কয়লাক্ষেত্রসমূহের প্রকৃতি ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্রসমূহের সমগোত্রীয়। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার অঞ্চলের এই কয়লা ভূতাত্ত্বিক অতীতে 'গন্ডোয়ানাল্যান্ড' (Gondwanaland) নামক একটি ভূখণ্ডের অংশ থাকাকালে সৃষ্টি হয় বলে তা গন্ডোয়ানা কয়লা নামে পরিচিত। বস্তুত পারমিয়ান ভূতাত্ত্বিক যুগে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ অঞ্চল তথা বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চল ভারত ভূখণ্ড এবং তার সাথে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টার্কটিকা মহাদেশসহ একত্রে দক্ষিণ গোলার্ধের দক্ষিণ প্রান্তে 'গন্ডোয়ানাল্যান্ড' নামক এক বিশাল ভূখণ্ডের অংশ ছিল। এ সময় এই গন্ডোয়ানাল্যান্ড ভূখণ্ডে বহুসংখ্যক বেসিনের উদ্ভব ঘটে। এই বেসিনসমূহ পারমিয়ান যুগের নদীবাহিত ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে (fluvial environment) পললক্ষেপণের (sedimentation) মাধ্যমে পরিপূর্ণ হতে থাকে। এ সময় ভূখণ্ডে উদ্ভিদকুলের আধিক্য এবং তা জমা হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশের উপস্থিতির কারণে এ বেসিনসমূহে প্রচুর উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ জমা হয় এবং কালক্রমে তা বেলেপাথর ও কাদাশিলা স্তরের নিচে চাপা পড়ে। ভূগর্ভে স্থানান্তরিত হবার পর উদ্ভিদজাত পদার্থসমূহ কালক্রমে কয়লায় পরিণত হয়। পরবর্তীতে এই বেসিনসমূহ চ্যুতি দিয়ে প্রভাবিত হয় এবং ফলে চ্যুতি দিয়ে সীমাবদ্ধ গ্রাবেন জাতীয় বেসিন সৃষ্টি হয়। বর্তমানে প্রাপ্ত কয়লার মজুতসমূহ এই গ্রাবেন জাতীয় বেসিনে অবস্থান করে।

বাংলাদেশের গন্ডোয়ানা কয়লা মজুতসমূহ উত্তরবঙ্গে ভূতাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলে অবস্থিত। এই প্লাটফর্ম অঞ্চলের দুটি উপভাগ তথা রংপুর স্যাডল এবং বগুড়া শেলফ – উভয় অংশেই কয়লাবাহী গন্ডোয়ানা বেসিনের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তবে স্বল্প গভীরতায় প্রাপ্ত খনন এবং উত্তোলনযোগ্য কয়লা মজুতসমূহ রংপুর স্যাডল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, যেমন বড়পুকুরিয়া, খালাশপীর ইত্যাদি।

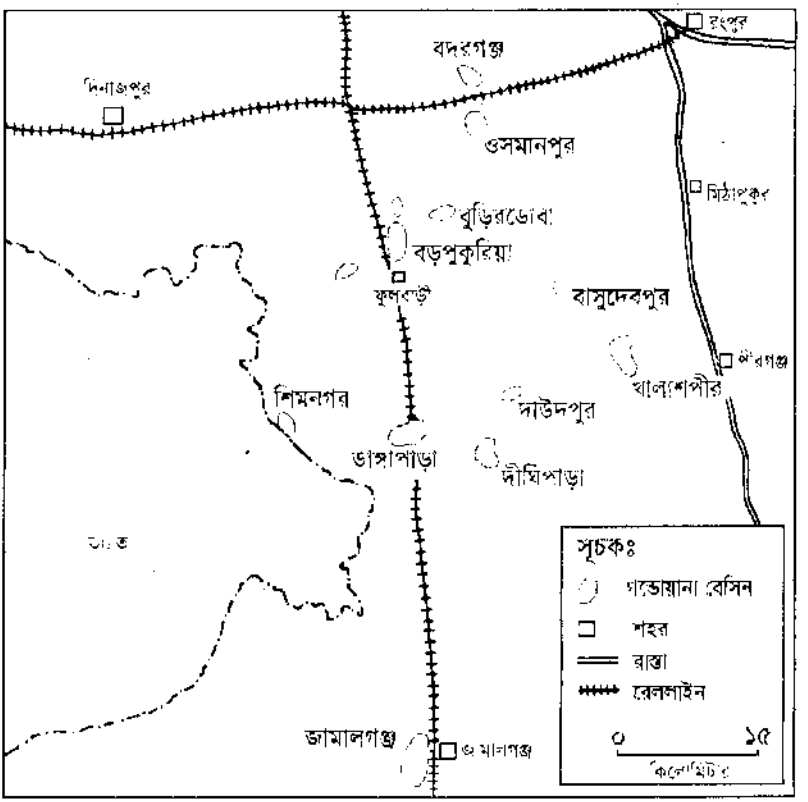

চিত্র ৪.২ঃ উত্তরবঙ্গে গন্ডোয়ানা বেসিনসমূহ (সূত্র: নেহালউদ্দিন ও ইসলাম ১৯৯২)।

কয়লাবাহী গন্ডোয়ানা বেসিনসমূহ সরাসরি প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কেলাসিত ভিত শিলার (crystalline basement rock) উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বেসিনসমূহ একদিকে চ্যুতি (fault) দিয়ে সীমাবদ্ধ অর্ধ গ্রাবেন (half graben) জাতীয় বেসিন এবং এ সমস্ত বেসিনে পারমিয়ান যুগে জমাকৃত গন্ডোয়ানা দলের (Gondwana Group) শিলাস্তরের মধ্যে কয়লাস্তরসমূহ বিদ্যমান। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা এই যে, গন্ডোয়ানা বেসিনসমূহে প্রাপ্ত কয়লাস্তরসমূহের বিস্তৃতি ভূতাত্ত্বিক অতীতে অনেক বেশি ছিল; আদিতে বৃহত্তর বেসিনে কয়লাস্তর সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী ভূতাত্ত্বিক যুগে এর অংশবিশেষ ক্ষয় প্রক্রিয়ায় বিলীন হলেও চ্যুতি দিয়ে সীমাবদ্ধ গ্রাবেন জাতীয় বেসিনে কয়লা সংরক্ষিত থাকে।

গন্ডোয়ানা দল প্রধানত বেলেপাথরের শিলাস্তর সমন্বয়ে গঠিত এবং তার সাথে কয়লাস্তর ছাড়াও কিছু কাদা শিলাস্তর এবং কনগ্লোমারেট (conglomerate) শিলাস্তরও

রয়েছে। এই গন্ডোয়ানা দল প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপর সরাসরি অসংগতিভাবে (unconformably) বিন্যস্ত রয়েছে। কয়লাস্তরসমূহ এক একটি ৩ মিটার থেকে সর্বোচ্চ ৪২ মিটার পর্যন্ত পুরুত্ব ধারণ করে এবং এ সমস্ত কয়লাস্তর ভূপৃষ্ঠের নিচে ১১৮ মিটার থেকে ২০০০ মিটারের বেশি গভীরতার মধ্যে অবস্থান করতে দেখা যায়। প্রাপ্ত সমস্ত গন্ডোয়ানা কয়লাই উন্নতমানের বিটুমিনাস শ্রেণিভুক্ত এবং এদের ভিতর ক্ষতিকারক সালফারের পরিমাণ অতি অল্প।

কয়লাবাহী গন্ডোয়ানা দলের উপর বগুড়া শেলফ অঞ্চলে অসংগতিভাবে জুরাসিক, ক্রিটেশাস এবং টারশিয়ারি যুগের উল্লেখযোগ্য পুরুত্বের শিলাস্তর বিদ্যমান। অবশ্য রংপুর স্যাডল অঞ্চলে কয়লাবাহী গন্ডোয়ানা দলের উপর অল্প পুরুত্বের কেবল টারশিয়ারি যুগের ডুপিটিলা সংঘের মূলত নরম বেলেপাথর দিয়ে গঠিত শিলাস্তর বিদ্যমান। প্রায় ১০০ মিটার থেকে ২০০ মিটার পুরুত্বের পানিবাহী এই নরম শিলাস্তর তার নিচে অবস্থিত গন্ডোয়ানা কয়লা খনন ও উত্তোলনের জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করবে।

৪.২.৩ বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র ঃ বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রটি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানায় অবস্থিত। দিনাজপুর জেলা সদর থেকে পূর্বদিকে এর দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। ফুলবাড়ী রেলস্টেশন থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ফুলবাড়ী পার্বতীপুর স্টেশনদ্বয় সংযোগকারী রেললাইনের পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর এই কয়লাক্ষেত্র অবস্থিত (চিত্র ৪.৩)। কয়লাক্ষেত্রটির প্রমাণিত বিস্তৃতি ৫.২৫ বর্গ কিলোমিটার। এই প্রমাণিত বিস্তৃতির বাইরে ১ থেকে ১.৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় এর সম্ভাব্য বিস্তৃতি রয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রটি ১৯৮৫ সনে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ কর্তৃক খননকৃত জিডিএইচ-৩৮ (GDH-38) কূপে আবিষ্কৃত হয়। এই কূপটিতে স্বল্প গভীরতায় উল্লেখযোগ্য পুরুত্বের কয়লাস্তরসহ গন্ডোয়ানা শিলাস্তরের (Gondwana rock) সন্ধান পাওয়া যায়। আবিষ্কার পরবর্তী সময়ে ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ এই স্থানে বিস্তারিত মাধ্যাকর্ষণ (gravity) এবং ভূচৌম্বক (magnetic) জরিপ সম্পন্ন করে এবং আরো ৬টি কূপ খনন করে কয়লাক্ষেত্রটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে। ১৯৮৭-১৯৯০ সময় কালে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য নিয়োজিত ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং মাইনিং কনসালট্যান্ট (Wardell Armstrong Mining Consultant) সংস্থাটি কয়লাক্ষেত্র এলাকায় হাই-রেসুলিশন সাইসমিক (high resolution seismic) জরিপ সম্পন্ন করে এবং আরো ১২টি কূপ খনন করে।

উপরিউক্ত সম্ভাব্যতা জরিপে ইতিবাচক পরামর্শের ভিত্তিতে সরকার বড়পুকুরিয়ায় একটি ভূগর্ভস্থ কয়লাখনি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সনের জুন মাসে চীনের

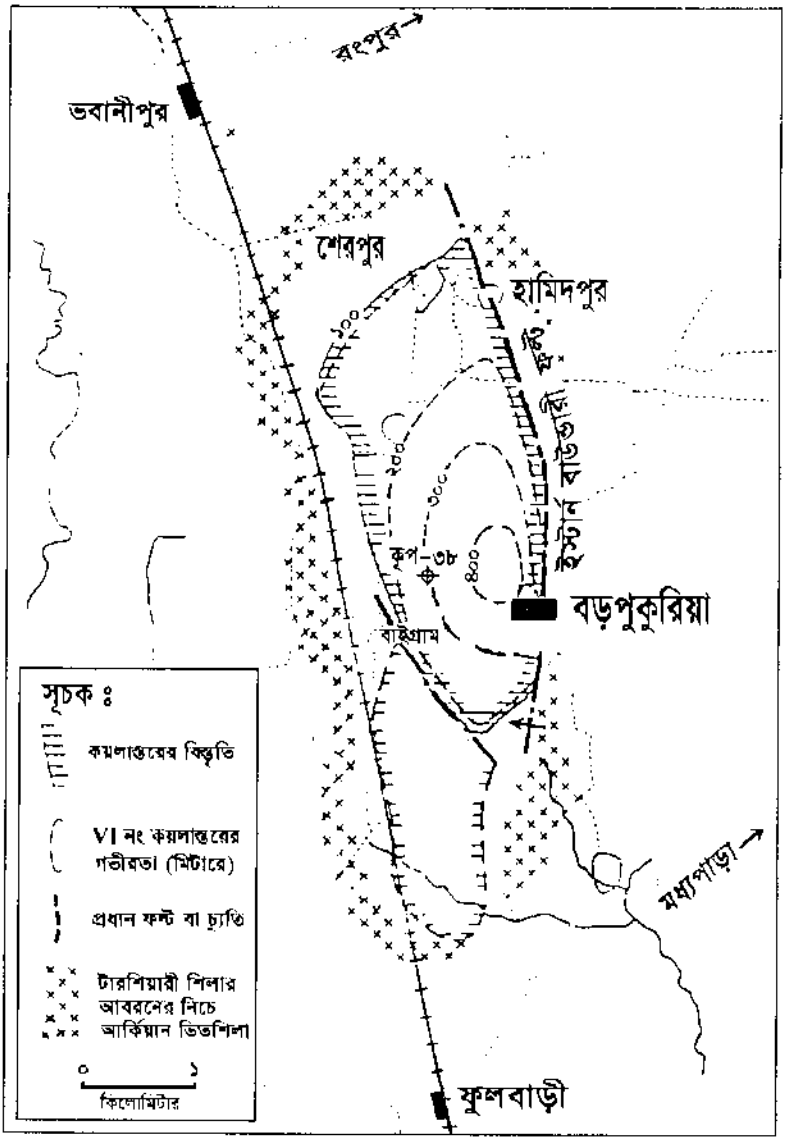

চিত্র ৪.৩ ঃ বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো (সূত্র: ওয়ারডেরল এন্ড আর্মস্ট্রং ১৯৯১; নরমান ১৯৯২)।

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বড়পুকুরিয়া ভূগর্ভস্থ কয়লাখনি স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং চার বছরের মধ্যে এই কয়লা খনি থেকে প্রাথমিকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু হবে বলে আশা করা হয়।

(ক) ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ঃ বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র একটি গন্ডোয়ানা বেসিনে অবস্থিত। এই বেসিনটি রংপুর স্যাডল অঞ্চলে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপর অবস্থিত এবং তা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত। এটি পূর্বদিকে বৃহৎ চ্যুতি (fault) দিয়ে সীমাবদ্ধ একটি অর্ধ-গ্রাবেন জাতীয় অসম (asymmetric) বেসিন (চিত্র ৪.৪)। বেসিনটির পূর্ব সীমানায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত চ্যুতিটিকে ইস্টার্ন বাউন্ডারি ফল্ট (eastern boundary fault) নামে অভিহিত করা হয়। বেসিনটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব-ভারতের দামোদর উপত্যকা বরাবর গন্ডোয়ানা কয়লাক্ষেত্রসমূহও একই ধরনের অসম অর্ধ-গ্রাবেন জাতীয় বেসিন দিয়ে গঠিত। বড়পুকুরিয়া কয়লা বেসিনটির সর্বাপেক্ষা গভীর অংশটি এর পূর্ব প্রান্ত বরাবর ইস্টার্ন বাউন্ডারি ফল্ট বা পূর্ব প্রান্তের চ্যুতি থেকে মাত্র ২০০ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত (চিত্র ৪.৪)। পশ্চিম দিকে ক্রমাগত বেসিনটি অগভীর হয়ে এসেছে। এই বেসিনের অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর অপেক্ষাকৃত ছোট কিছু সংখ্যক চ্যুতি কয়লাস্তরসমূহকে প্রভাবিত করেছে। এই চ্যুতিসমূহ সাধারণ চ্যুতি (normal fault) এবং এদের সরণ ১০ মিটার বা তার অধিক। বড়পুকুরিয়া কয়লা বেসিনে কোন আগ্নেয় ডাইক বা সীল (dyke or sill) এর সন্ধান পাওয়া যায় নি, যদিও পূর্ব-ভারতে একই ধরনের কয়লা বেসিনে তার সন্ধান মেলে।

(খ) স্তর ক্রমবিন্যাস ঃ বড়পুকুরিয়া কয়লা বেসিনের স্তর ক্রমবিন্যাসের একটি নমুনা ৪.৫ চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপর থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বিন্যস্ত শিলাস্তরসমূহকে নিচ থেকে উপরে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়, যথা: গন্ডোয়ানা দল, ডুপিটিলা সংঘ এবং মধুপুর ক্লে সংঘ।

গন্ডোয়ানা দলের পারমিয়ান যুগের কয়লাবাহী শিলাস্তরসমূহ অসংগতিরূপে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপর বিন্যস্ত। এই শিলাদল মূলত বেলেপাথর এবং তার সাথে কয়লাস্তর, কাদাশিলা এবং কনগ্লোমারেট শিলাস্তর সমন্বয়ে গঠিত। কয়লা বেসিনটির সর্বাপেক্ষা গভীর স্থানে গন্ডোয়ানা দলের সর্বোচ্চ পুরুত্ব প্রায় ৪৭৬ মিটার। গন্ডোয়ানা দলের একেবারে নিচে প্রায় ৩০ থেকে ৬০ মিটার (গড়ে ৫৫ মিটার) পুরুত্বের মূলত কনগ্লোমারেট শিলা দিয়ে গঠিত টিলাইট (tillite) এই বেসিন বিবর্তনের শুরুতে হিমবাহ পরিবেশের ইঙ্গিত প্রদান করে। এর উপরে প্রায় ১০০ থেকে ৪০০ মিটার পুরু মূলত বেলেপাথর ও তার সাথে কয়লাস্তর ও কাদা শিলাস্তরের বিন্যাস ঘটেছে। কয়লাক্ষেত্রের কয়লা মজুতসমূহ এই অংশেই অবস্থান করে। এই বেলেপাথরসমূহ শক্ত,

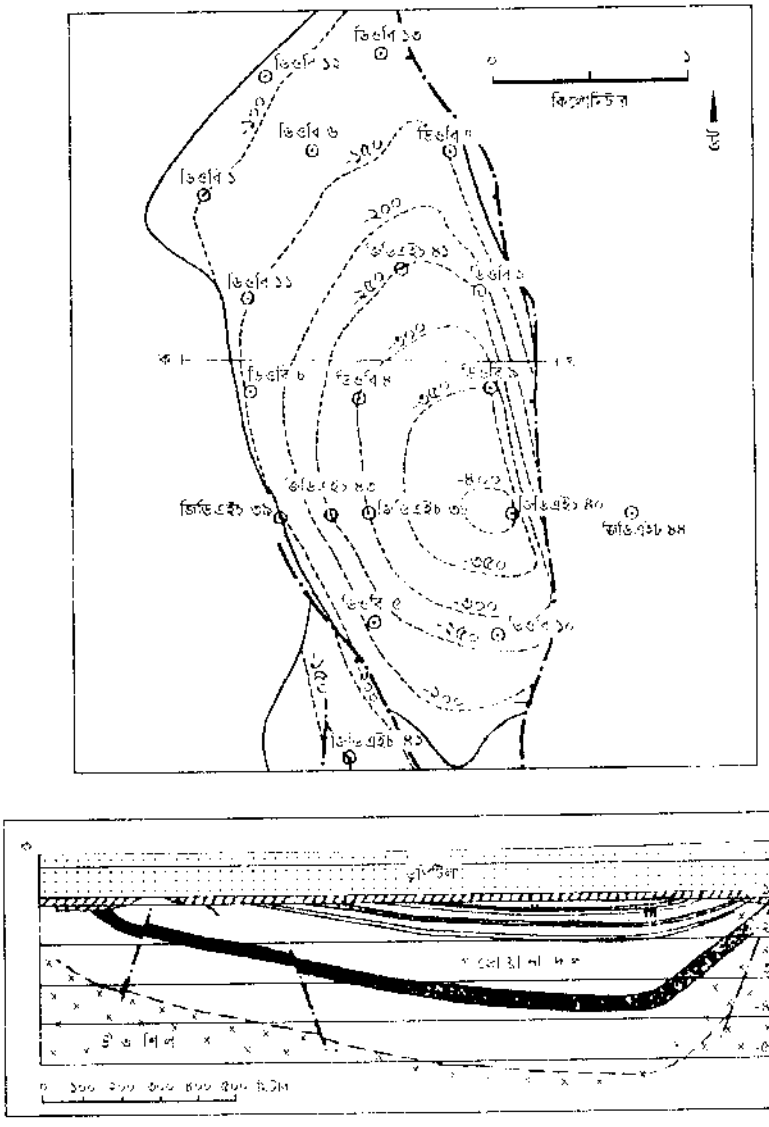

চিত্র ৪.৪ ঃ বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র ; *(উপরে)* ৬ নং কয়লাস্তরের গভীরতা কনট্যুর, *(নীচে)* কয়লাক্ষেত্রের প্রস্থচ্ছেদ (সূত্র: নরমান ১৯৯২)।

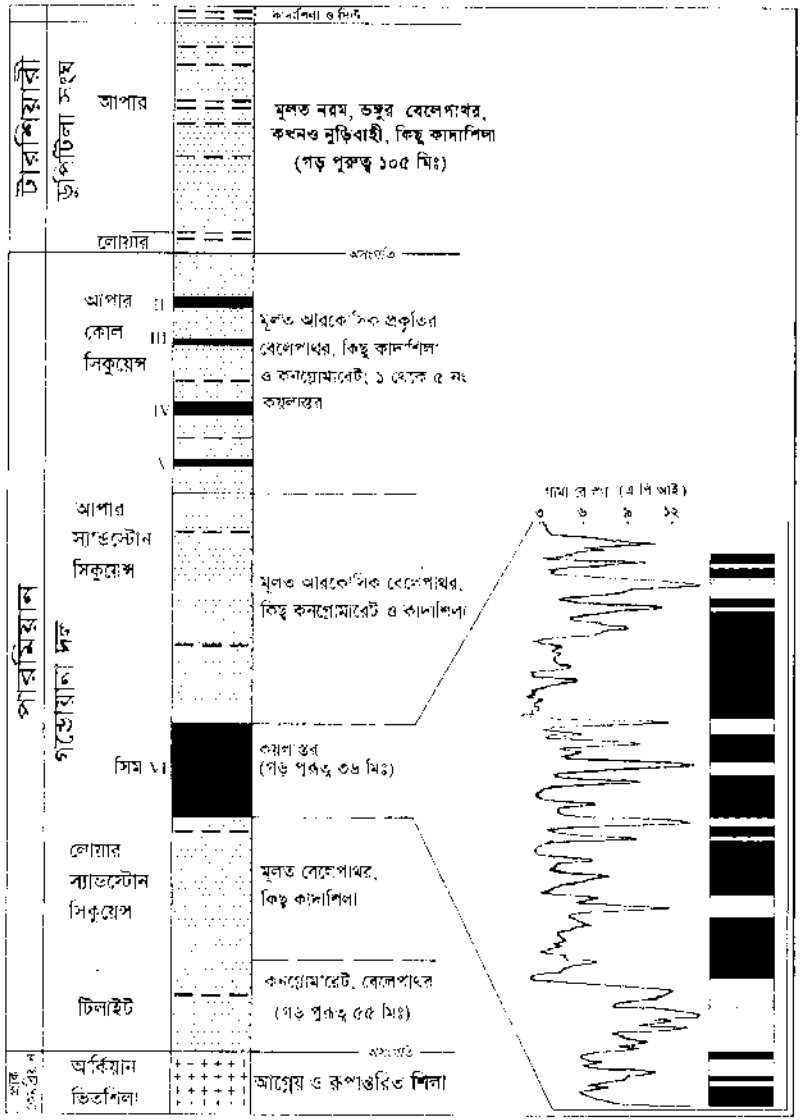

চিত্র ৪.৫ ঃ বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রের স্তরক্রমবিন্যাস (সূত্র: নরমান ১৯৯২; ওয়ারডেল এন্ড আর্মস্ট্রং ১৯৯১)।

দৃঢ় এবং আরকোসিক (arkosic) জাতীয়। উপরিউক্ত শিলাস্তরসমূহের মধ্যে মোট ৬টি প্রধান কয়লাস্তর (coal seam) লক্ষ্য করা যায়।

এই ৬টি কয়লাস্তর ভূপৃষ্ঠের নিচে ১১৮ মিটার থেকে ৫০৬ মিটার গভীরতায় অবস্থিত। এই কয়লাস্তরসমূহের এক একটির পুরুত্ব সর্বনিম্ন ৩ মিটার থেকে সর্বোচ্চ ৪২ মিটার পর্যন্ত এবং একত্রে এদের সর্বমোট গড় পুরুত্ব প্রায় ৫২ মিটার। এই ৬টি কয়লাস্তরসমূহকে উপর থেকে নিচে কয়লাস্তর I, II, III, IV, V এবং VI হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র ৪.৪ এবং ৪.৫)। এদের মধ্যে II, IV এবং VI কয়লাস্তরসমূহ অধিকতর বিস্তৃত এবং পুরু। সর্বাপেক্ষা পুরু কয়লাস্তর VI এর পুরুত্ব কূপভেদে ২৯ মিটার থেকে ৪২ মিটার পর্যন্ত এবং এর গড় পুরুত্ব ৩৬ মিটার (সারণি ১১)। বিশ্বের কয়লাক্ষেত্রসমূহে প্রাপ্ত কয়লাস্তরসমূহের সাথে তুলনামূলক বিচারে এই VI নং কয়লাস্তরটিকে অতি পুরু কয়লাস্তর হিসেবে গণ্য করা যায়।

পারমিয়ান যুগের গন্ডোয়ানা দলের উপর একটি বৃহৎ অসংগতির (unconformity) কারণে টারশিয়ারি যুগের প্লায়োসিন উপযুগের ডুপিটিলা সংঘের প্রায় ১০০ মিটার থেকে ২০০ মিটার (গড়ে ১৩০ মিটার) পুরুত্বের শিলাস্তর বিন্যস্ত রয়েছে। ডুপিটিলা সংঘ মূলত নরম ও ভঙ্গুর বেলেপাথর স্তর দিয়ে গঠিত এবং ভূগর্ভস্থ মিঠাপানির আধার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ডুপিটিলা সংঘের বেলেপাথরসমূহ তার নিচে অবস্থিত গন্ডোয়ানা দলের বেলেপাথরসমূহ থেকে দৃঢ়তা ও উপাদান ভিত্তিতে ভিন্নতর। ডুপিটিলা সংঘের নরম বেলেপাথরের এই উল্লেখযোগ্য পুরুত্বের আবরণ এখানে ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি স্থাপনে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করে ; কারণ এই নরম স্তরের মধ্যদিয়ে কয়লাখনির শ্যাফট (shaft) গঠন করা তুলনামূলকভাবে কঠিন।

সারণি ১১ : বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রে কয়লাস্তরসমূহের পুরুত্ব (সূত্র : ওয়ারডেল এন্ড আর্মস্ট্রং ১৯৯১)।

কয়লাস্তর	কূপভেদে পুরুত্ব	গড় পুরুত্ব
I	৪.৬ (১টি মাত্র কূপে প্রাপ্ত)	-
II	৭ থেকে ৯.৪ মিটার	৮.২ মিটার
III	২.৫ থেকে ৩	২.৭ মিটার
IV	৩.১ থেকে ৮.১ মিটার	৬.৪ মিটার
V	-	৬ মিটার
VI	২৯ থেকে ৪২ মিটার	৩৬ মিটার

সারণি ১২ ঃ জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে কয়লাস্তরসমূহের পুরুত্ব (সূত্র: রহমান ও জাহের ১৯৮০)।

কূপ নং	কয়লাস্তরসমূহ (পুরুত্ব মিটারে প্রদত্ত)						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
৫	১.৫২	৪.৫৬	১৯.৪১	২০.২২	২.৩৬	-	-
৬	-	১২.৪৬	৪.২৬	৭.৯	৫.১৭	২.৫৬	৩.১৯
৭	-	৪.২৬	২০.৩৭	১০.৩৪	১৩.৬৮	৭.৬	১৫.০৫
৮	-	৭.৯	২০.৬৭	২৪.৭৮	২০.৯৮	১০.৯৯	
৯	-	৫.১৭	৮.৮৭	৪.৫৫	-	-	-
১০	১২.৬৮	২.৫৬	৪০.৭৬	৫.২২	১৬.৪২	৬.০৪	১৫.৮১

ডুপিটিলা সংঘের উপর অবস্থিত প্লেইসটোসিন উপযুগের ৩ থেকে ১৫ মিটার পুরুত্বের (গড় পুরুত্ব ৯ মিটার) মধুপুর ক্লে সংঘ মূলত নরম কাদাশিলা ও সিল্ট দিয়ে গঠিত। কয়লাক্ষেত্র বরাবর ভূপৃষ্ঠে এই শিলা সংঘের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

(গ) কয়লার মান ও মজুত ঃ বড়পুকুরিয়া কয়লা উচ্চ উদ্বায়ী বিটুমিনাস (high volatile bituminous) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এর ক্যালরিফিক মান ১০,৪৫০ বিটিইউ/পাউন্ড। এর ভিতর সালফারের পরিমাণ খুব অল্প এবং এ কয়লাকে উচুমানের কয়লা হিসেবে গণ্য করা হয়। VI নং কয়লাস্তর (seam VI) এর নমুনার প্রক্সিমেট বিশ্লেষণ (proximate analysis) অনুযায়ী এ কয়লায় গড়ে স্থির কার্বন ৪৬.৪%, ছাই ১৬.২%, উদ্বায়ী পদার্থ ২৭.৬% এবং মোট সালফার ০.৫৭% রয়েছে (ওয়ারডেল আর্মস্ট্রিং ১৯৯১)। এই কয়লার আলটিমেট বিশ্লেষণ (ultimate analysis) অনুযায়ী এর ভিতর কার্বন ৮০% থেকে ৮৬% গড়ে ৮৩%, হাইড্রোজেন ৪.৮% থেকে ৫.৬% গড়ে ৫.২%, নাইট্রোজেন ১.৫% থেকে ২.২% গড়ে ১.৭% এবং অক্সিজেন ৪.৪% থেকে ১২.৪% গড়ে ৯.৪% রয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রে ৬টি কয়লাস্তরের মোট প্রমাণিত মজুত ৩০৩ মিলিয়ন টন। এর অতিরিক্ত আরো ৮৬ টন কয়লা মজুত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। ৬টি কয়লাস্তরের মধ্যে অধিকতর বিস্তৃত ও পুরু

কয়লাস্তরসমূহ তথা II, IV এবং VI স্তর এর গড় পুরুত্ব যথাক্রমে ৮ মিটার, ৬ মিটার এবং ৩৬ মিটার। এদের মধ্যে কয়লাস্তর VI এর পুরুত্ব কূপভেদে ২৯ মিটার থেকে ৪২ মিটার পর্যন্ত এবং এই একটি কয়লাস্তরেই কয়লাক্ষেত্রের মোট প্রমাণিত মজুতের ৯০% কয়লা মজুত রয়েছে।

(ঘ) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্প ঃ বাংলাদেশ সরকার বড়পুকুরিয়া কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সনে চীন সরকারের সাথে টার্ন কি (turn key) ভিত্তিক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী চীন বড়পুকুরিয়ায় একটি ভূগর্ভস্থ খনি স্থাপন করার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। চীনের তিনটি সংস্থা তথা সিএমসি (CMC), সিওডিসিও (CODCO) এবং সিএমআইসি (CMIC) সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়াম ১৯৯৪ সনের জুন মাসে বড়পুকুরিয়ায় কয়লা খনি স্থাপনের কাজ শুরু করে। এই খনি প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় প্রায় ২২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ধরা হয়েছে, যার মধ্যে ১০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটে পাওয়া যাবে। এই খনি প্রকল্প কাজ শেষ করতে প্রায় ৬ বছর সময় লাগবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর প্রতিদিন গড়ে ৩৩০০ মেট্রিক টন অর্থাৎ বছরে প্রায় ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করা হবে। উৎপাদিত কয়লার ৮০% বড়পুকুরিয়া এলাকায় স্থাপিত একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হবে এবং বাকি ২০% কয়লা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করা হবে।

বড়পুকুরিয়ার ভূগর্ভস্থ কয়লা খনিতে লংওয়াল (Longwall) পদ্ধতিতে কয়লা আহরণ করা হবে। এই কয়লাক্ষেত্রের কেবল একটি তথা কয়লাস্তর VI (seam VI) থেকে কয়লা খনন ও উত্তোলন করা হবে। এ লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা বেসিনের মধ্য-পশ্চিম এলাকায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প গভীরতায় বিদ্যমান কয়লাস্তর ভেদ করে দুটি ৬ মিটার ব্যাস সংবলিত খাড়া শ্যাফট নির্মাণ করা হবে। যেহেতু কয়লাবাহী গন্ডোয়ানা শিলাস্তরের উপর নরম ও পানিবাহী বেলেপাথর গঠিত ডুপিটিলা সংঘের অবস্থান, তাই এখানে খনন শ্যাফট তৈরি করতে ফ্রিজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে। শ্যাফটের গভীরতা হবে প্রায় ২৮০ মিটার এবং তা কয়লাস্তর VI ভেদ করে তার নিচে অবস্থিত শিলাস্তর পর্যন্ত পৌঁছবে। সেখান থেকে সুড়ঙ্গ পথে কয়লাস্তর VI এর ভিতর প্যানেল তৈরি করে ৪ বা তার বেশি সংখ্যক স্লাইস (slice) খননের মাধ্যমে কয়লা আহরণ করা হবে। প্রতিটি স্লাইসের পুরুত্ব হবে ২ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে কয়লাস্তর VI এর ২৭০ মিলিয়ন টন মজুতের মধ্যে কেবল ৭০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনন ও উত্তোলন ভূগর্ভস্থ খনির (underground mine) মাধ্যমে না করে উন্মুক্ত খনির (open pit mine) মাধ্যমে সম্পন্ন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে

অনেকে মত প্রকাশ করেন। বস্তুত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি স্থাপনের কারিগরি সম্ভাব্যতা জরিপ কাজে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের মধ্যে এই কয়লা উত্তোলনের সর্বোত্তম পদ্ধতির বিষয়টি সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ পায়। একপক্ষ যেখানে ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতিকেই অধিকতর উত্তম বলে মনে করে, অপর পক্ষ উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিকেই এই কয়লাক্ষেত্রের জন্য অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মত প্রকাশ করে। উপরিউক্ত দ্বিমতের কারণ হিসেবে যে সমস্ত ভূতাত্ত্বিক ও কারিগরি দিকসমূহ বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, নিচে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতির পক্ষে মতামত ঃ (১) বড়পুকুরিয়ায় কয়লাবাহী গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের উপর বিদ্যমান ১০০ থেকে ২০০ মিটার পুরু পানিবাহী নরম বেলেপাথর গঠিত ডুপিটিলা সংঘ উন্মুক্ত খনন পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুইভাবে জটিলতার সৃষ্টি করবে। প্রথমত, এই পদ্ধতিতে খনন করা হলে তাতে বিশাল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানি নের হয়ে এসে খননকৃত গর্তে জমা হবে যা সরিয়ে খনন কাজ পরিচালনা করা কঠিন হবে। দ্বিতীয়ত, উন্মুক্ত গর্তের পাড়সমূহ নরম পানিবাহী বেলেপাথরের হওয়ার কারণে অস্থির (unstable) থাকবে এবং তাতে ভূমিধস (landslide) নামক্ষার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।

(২) উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ কৃষি ও বাসযোগ্য জমি হারাতে হবে এবং তা পরিবেশগত দিক থেকে খনন এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এক হিসাব অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতিতে যেখানে ০.৯৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্রয়োজন, সেখানে উন্মুক্ত খনি স্থাপন করতে হলে প্রায় ১৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্রয়োজন হবে।

(৩) বড়পুকুরিয়ায় কয়লাস্তরসমূহের গভীরতা উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অতিরিক্ত। বিশেষ করে এর সর্বপুরু কয়লাস্তর VI অন্যান্য কয়লাস্তরের তুলনায় সর্বনিম্নে অবস্থান করে এবং এর গভীরতা ভূপৃষ্ঠের নিচে ১২৫ মিটার থেকে ৪৫০ মিটার। উল্লেখ্য যে এই কয়লাস্তরটি বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রের মোট মজুতের প্রায় ৯০% ধারণ করে।

উন্মুক্ত খনন পদ্ধতির পক্ষে মতামত ঃ (১) বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রে বিদ্যমান ১০০ থেকে ২০০ মিটার পুরু নরম বেলেপাথর গঠিত ডুপিটিলা সংঘের অবস্থানের কারণে এখানে ভূগর্ভস্থ খনি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শ্যাফট নির্মাণ জটিল, সময় সাপেক্ষ এবং এ কাজে অতি ব্যয়বহুল ফ্রিজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা অপরিহার্য। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনন করলে ভূগর্ভস্থ পানিকে পাম্পের সাহায্যে সরিয়ে কৃষিকাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কয়লা মজুতের প্রায় সম্পূর্ণটাই উত্তোলন করা যাবে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতিতে মোট মজুতের কেবল অংশবিশেষ উত্তোলন

করা সম্ভব হবে। এক হিসাব অনুযায়ী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে যেখানে প্রায় ২৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব, সেখানে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে খনন করলে মাত্র ৪০ মিলিয়ন থেকে ৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব।

(৩) উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনন করলে যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৫ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করা যাবে, সেখানে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে খনন করা হলে বছরে কয়লা উৎপাদন হবে ১ মিলিয়ন টন।

(৪) ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কয়লা খনিতে মিথেন গ্যাস বিস্ফোরণ, সহজাত প্রজ্বলন (spontaneous combustion), ছাদ ধসে পড়া ইত্যাদি বিপজ্জনক ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা থেকে যায় এবং বাংলাদেশের মতন কয়লা খনিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এলাকার জন্য তা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ।

(৫) ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতিতে যেখানে কয়লাখনির আয়ু ২৯ বছর ধরা হয়ে থাকে, সেখানে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে কয়লা খনির আয়ু ধরা হয় প্রায় ৬৬ বছর (সেন্ট্রাল মাইন প্লানিং এন্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট ১৯৯১)।

৪.২.৪ জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র ঃ জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রটি জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত। ১৯৬২ সনে এদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ কয়লা অনুসন্ধান প্রকল্পের অধীনে জয়পুরহাট, নওগাঁ, বগুড়া জেলাসমূহে মোট দশটি কূপ খনন করলে জামালগঞ্জ - পাহাড়পুর এলাকায় মোট ৭টি কূপে ৬৪০ মিটার থেকে ১১৫৮ মিটার গভীরতার মধ্যে বেশ কয়েকটি কয়লাস্তরের সন্ধান লাভ করে যা জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র নামে পরিচিত হয় (চিত্র ৪.২)। মূল কয়লাক্ষেত্রটি জামালগঞ্জ জয়পুরহাট সংযোগকারী উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ব্রডগেজ রেললাইনের পশ্চিম দিকে জামালগঞ্জ এলাকায় প্রায় ১১.৬৬ বর্গকিলোমিটার (৪.৫ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে অবস্থিত। অবশ্য এই এলাকার বাইরেও কয়লাস্তর ও কয়লা বেসিনের সর্বমোট বিস্তৃতি প্রায় ৩৭.৭৬ বর্গ কিলোমেটার (১৬ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে রয়েছে বলে জানা যায়।

জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার পরবর্তী সময়ে একাধিক বিদেশী পরামর্শক ফার্ম তথা ১৯৬৬ সনে জার্মানীর ফ্রাইড ক্রুপ রোসটফ (Fried Krupp Rohstoffe), ১৯৬৯ সনে বৃটেনের পাওয়েল ডফরীন (Powell Doffryn) এবং ১৯৭৬ সনে বৃটেনের রবার্টসন রিসার্চ (Robertson Research) কর্তৃক কয়লাক্ষেত্রটি পরীক্ষা এবং কয়লা খননের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এসব পরামর্শক ফার্ম তাদের রিপোর্টে জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলন কারিগরি দিক থেকে সম্ভব বলে মত প্রকাশ করে। তবে এখানে কয়লাস্তরের গভীরতা অধিক হেতু কয়লা উত্তোলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত থাকাতে কয়লা খনি বাস্তবায়ন স্থগিত থাকে।

পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সনে বড়পুকুরিয়ায় স্বল্প গভীরতায় কয়লাস্তর আবিষ্কারের ফলে জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হয়। অবশ্য জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র থেকে কয়লা খনন বা উত্তোলনের পরিবর্তে কূপ খননের মাধ্যমে কয়লাস্তরের মিথেন গ্যাস (coal bed methane বা সংক্ষেপে CBM) আহরণ ও উৎপাদনের সম্ভাব্যতা বিচার করে ইতিবাচক মত প্রকাশ করা হয়। এই সম্ভাব্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নীতিগতভাবে অনুমোদন প্রদান করেন। জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে সিবিএম (CBM) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এখানে একটি ছোট থেকে মাঝারি আকারের গ্যাস উৎপাদন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে ভূবিজ্ঞানিগণ মত প্রকাশ করেন।

(ক) ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ঃ জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রটি ভূতাত্ত্বিকভাবে ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলের বগুড়া শেলফ উপভাগে একটি গন্ডোয়ানা বেসিনে অবস্থিত। গন্ডোয়ানা বেসিনটি চ্যুতি দিয়ে সীমাবদ্ধ একটি অর্ধ-গ্রাবেন বেসিন। জামালগঞ্জ কয়লা বেসিনটির উত্তর সীমানা নির্ধারক এই চ্যুতিটি পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত এবং একে বুজরাক - দুর্গাদহ সীমানা চ্যুতি (Buzrak-Durgadaha boundary fault) নামে অভিহিত করা হয় (রহমান এবং জাহের ১৯৮০)। এই বেসিনে গন্ডোয়ানা শিলাস্তরসমূহের নতি (dip) সাধারণত ৫ ডিগ্রি থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় যা কখনো কখনো ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ধারণা করা হয় যে, ভূতাত্ত্বিক অতীতে এই কয়লা বেসিনের বিস্তৃতি আরো অধিক ছিল। পরবর্তীকালে ভূ-আন্দোলন ও ক্ষয় প্রক্রিয়ায় কয়লাস্তরসহ এর কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিলুপ্ত হয় এবং কেবল চ্যুতি দিয়ে সীমাবদ্ধ বেসিন অংশেই কয়লা মজুত সংরক্ষিত থাকে।

(খ) স্তরবিন্যাস ঃ জামালগঞ্জ কয়লা বেসিন এলাকার একটি স্তরক্রমবিন্যাস ৪.৬ চিত্রে দেখানো হয়েছে। কয়লাক্ষেত্র এলাকায় খননকৃত ১১টি কূপের তথ্য থেকে জানা যায় যে, এই বেসিন পূর্ণকারী শিলাস্তূপের নিম্নাংশে প্রায় ৫৩০ মিটারের বেশি পুরুত্বের পারমিয়ান (Permian) ও ট্রায়াসিক (Triassic) যুগের গন্ডোয়ানা শিলাদল অবস্থিত। বস্তুত এখানে গন্ডোয়ানা দলের নিম্নতল (base) পর্যন্ত কোনো কূপ খনন করা হয়নি বলে তার মোট পুরুত্ব জানা যায় নি। এই গন্ডোয়ানা শিলা দল মূলত বেলেপাথর এবং তার সাথে কিছু কাদাশিলা, কনগ্লোমারেট এবং কয়লাস্তরের সমন্বয়ে গঠিত। জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে মোট ৭টি কয়লাস্তর পাওয়া যায় যাদেরকে যথাক্রমে উপর থেকে নিচে I, II, III, IV, V, VI এবং VII সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই কয়লাস্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠের নিচে ৬৪০ মিটার থেকে ১১৫৮ মিটার গভীরতায় অবস্থান করে এবং গড়ে এদের একীভূত মোট পুরুত্ব প্রায় ৬৪ মিটার (সারণি ১২)।

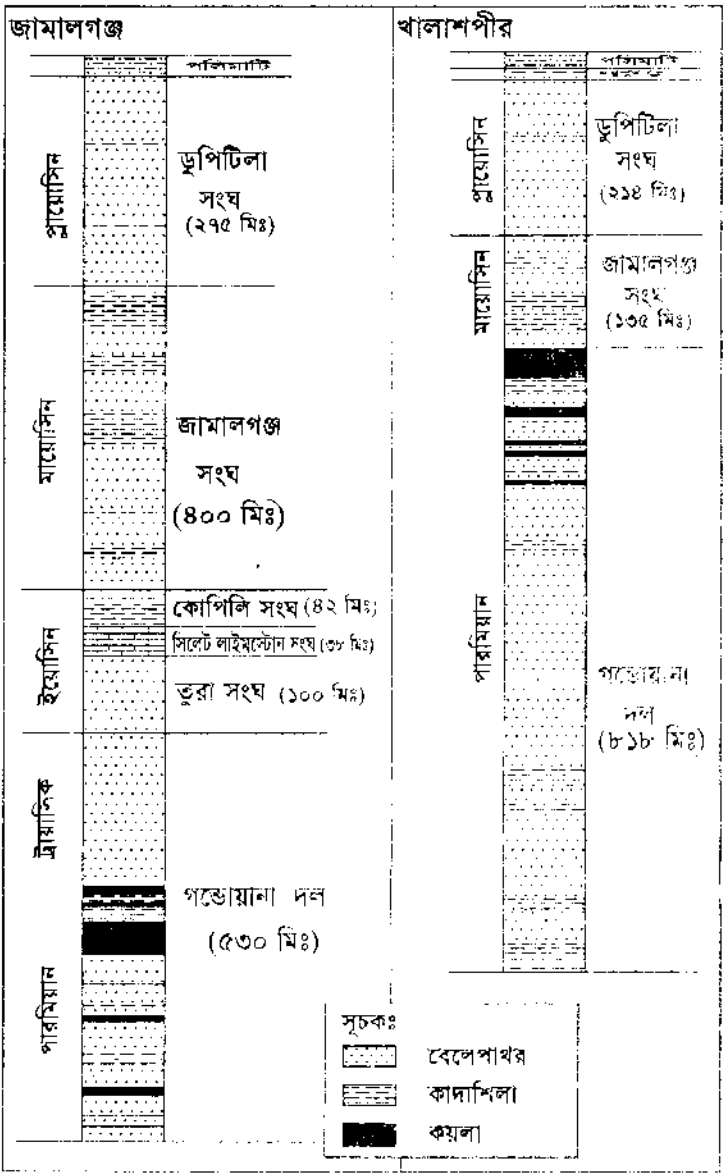

চিত্র ৪.৬ ঃ জামালগঞ্জ এবং খালাশপীর কয়লাক্ষেত্রের শুরুক্রমবিন্যাস (সূত্র: বেহালউদ্দিন ও ইসলাম ১৯৯২)।

গভোয়ানা দলের উপর অসংগতিরূপে ইয়োসিন উপযুগের মূলত বেলেপাথর স্তরের তুরা স্যান্ডস্টোন সংঘ (১০০ মিটার), মূলত চুনাপাথরের সমন্বয়ে গঠিত সিলেট লাইমস্টোন সংঘ (৩৮ মিটার) এবং মূলত কাদা শিলাস্তরের সমন্বয়ে গঠিত কোপিলি সংঘ (৪২ মিটার) অবস্থান করে। তার উপর যথাক্রমে মায়োসিন উপযুগের বেলেপাথর ও কাদা শিলাস্তর সমন্বয়ে গঠিত জামালগঞ্জ সংঘ (৪০০ মিটার), প্লায়োসিন উপযুগের মূলত নরম বেলেপাথর স্তরের সমন্বয়ে গঠিত ডুপিটিলা সংঘ (২৭৫ মিটার) রয়েছে। সব কিছুই একেবারে উপরে বঙ্গ সমতলের পলিমাটির (alluvium) অল্প পুরুত্বের স্তর দিয়ে আবৃত রয়েছে (চিত্র ৪.৬)।

(গ) কয়লার মান ও মজুত ঃ জামালগঞ্জ কয়লা উচ্চ উদ্বায়ী বিটুমিনাস শ্রেণির নন কোকিং (non coking) থেকে অল্পভাবে কোকিং (slightly coking) কয়লা। এর ক্যালরিফিক মান প্রায় ১১৭৮০ বিটিইউ/পাউন্ড। কয়লা নমুনার প্রক্সিমেট বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ কয়লায় স্থির কার্বন ৩৩% থেকে ৫৪%, ছাই ১০% থেকে ৬০% এবং উদ্বায়ী পদার্থ ৩০% থেকে ৪২% রয়েছে (নেহালউদ্দিন ও ইসলাম ১৯৯২)। এই কয়লায় সালফারের পরিমাণ ০.৬% ।

জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে ১১.৭ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মোট কয়লা মজুতের পরিমাণ প্রায় ১০৫৩ মিলিয়ন টন। এখানে কয়লাস্তরের সংখ্যা ৭টি, যাদের এক একটির পুরুত্ব প্রায় ২ মিটার থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৪৬ মিটার। অবশ্য কয়লাস্তরসমূহের পুরুত্ব কূপভেদে তথা স্থানভেদে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর। উদাহরণস্বরূপ এ কয়লাক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা পুরু কয়লাস্তর III এর পুরুত্ব ১১ নং কূপে প্রায় ৪৬ মিটার, ৭ নং কূপে প্রায় ২০ মিটার এবং ৬ নং কূপে মাত্র ৪ মিটার (সারণি ১২)। এক হিসাব অনুযায়ী জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে মোট ১০৫৩ মিলিয়ন টন কয়লা মজুতের প্রায় অর্ধাংশই কয়লাস্তর III তে অবস্থিত।

(ঘ) কোল বেড মিথেন বা সিবিএম (CBM) প্রকল্প ঃ ভূগর্ভে কয়লাস্তরের মধ্যে অবস্থিত মিথেন গ্যাসের (coal bed methane সংক্ষেপে CBM) উপস্থিতি বহু পূর্ব থেকে জানা থাকলেও এই গ্যাসকে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন ও উৎপাদনের প্রযুক্তি বিগত প্রায় এক দশক আগে থেকে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হয়। ১৯৮১ সনে যেখানে সেদেশে মাত্র কয়েকটি সিবিএম কূপ চালু ছিল, পরবর্তীকালে সেদেশে তার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৬ সনে দাঁড়ায় ৩৭৮ টি, ১৯৯০ সনে ২৭১৪ টি এবং ১৯৯১ সনে ৪৪৪৩ টি। কয়লাস্তরে উপস্থিত এই মিথেন গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো এর ৯০% কয়লার সাথে এডসর্ব (adsorbed) অবস্থায় থাকে এবং অবশিষ্ট মাত্র ১০% মুক্ত অবস্থায় থাকে। তাই এই গ্যাস উত্তোলনের জন্য তাকে কয়লাস্তর থেকে বিমুক্ত করার লক্ষ্যে কিছু কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যেমন কৃত্রিম পদ্ধতিতে কয়লাস্তরে ফাটল ধরিয়ে তার

প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জামালগঞ্জ কয়লা খনন বা উত্তোলনের পরিবর্তে বর্তমানে তা থেকে কূপ খননের মাধ্যমে কয়লাস্তরের মিথেন বা সিবিএম (CBM) গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সে লক্ষ্যে প্রথমত এর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার পরিকল্পনা করা হয়। ভূগর্ভে কয়লাস্তর থেকে মিথেন গ্যাস আহরণ ও উৎপাদনের জন্য সহায়ক শর্ত বা উপাদানসমূহ এবং জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে এই শর্তসমূহের অবস্থা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

সিবিএম (CBM) উৎপাদনের প্রথম শর্ত হিসেবে কয়লাস্তরে পর্যাপ্ত মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। জামালগঞ্জ কয়লা উচ্চ উদ্বায়ী বিটুমিনাস শ্রেণির এবং এতে উদ্বায়ী পদার্থ হিসেবে অন্য গ্যাসের সাথে মিথেন গ্যাসের তুলনামূলকভাবে উচ্চমাত্রায় উপস্থিত থাকার কথা। অবশ্য এই কয়লায় মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির মাত্রা পরিমাপের (প্রতি টন কয়লায় মিথেন গ্যাসের পরিমাণ) কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই কয়লাস্তরে কোর খননের (core drilling) সময় গ্যাসের প্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে। সে হিসেবে ফ্রাইড ক্রুপ (Fried Krupp) পরামর্শক ফার্মের ধারণা অনুযায়ী এই কয়লা থেকে প্রচুর পরিমাণ মিথেন গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব।

সিবিএম (CBM) উৎপাদনের অপর শর্ত এর সন্তোষজনক গভীরতা। অতি অধিক গভীরতায় অবস্থিত কয়লাস্তর থেকে গ্যাস মুক্ত করা যেমন অপেক্ষাকৃত কঠিন, অতি অল্প গভীরতায় অবস্থিত কয়লাস্তরের মিথেন গ্যাস আপনা থেকে বিমুক্ত হতে পারে বলে সেখানে এর মজুত পূর্বেই বিলুপ্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। জামালগঞ্জে কয়লাস্তরের গভীরতা ভূপৃষ্ঠের নিচে ৬৪০ মিটার থেকে প্রায় ১০০০ মিটার এবং তা উপরিউক্ত শর্তের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থানে বিরাজ করে। উল্লেখ্য যে, কয়লাস্তরের মিথেন গ্যাস উৎপাদনের মোক্ষম গভীরতা হিসেবে ৩০০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫০০ মিটার গভীরতায় অবস্থিত কয়লাস্তর থেকে সাফল্যজনকভাবে মিথেন গ্যাস উৎপাদন করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত হিসেবে কয়লাস্তরের পুরুত্ব বিবেচনা করা হয়। সিবিএম (CBM) উৎপাদনে পুরু কয়লাস্তর অধিক কাম্য। জামালগঞ্জে কয়লাস্তরসমূহ ২ মিটার থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৪৭ মিটার পর্যন্ত পুরু এবং এখানে একাধিক কয়লাস্তরের পুরুত্ব কূপভেদে ১০ থেকে ২০ মিটার। এই উচ্চ পুরুত্বের কয়লাস্তরসমূহ মিথেন গ্যাস উৎপাদনের সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জামালগঞ্জ কয়লাস্তরের বিস্তৃতি মূল কয়লাক্ষেত্র এলাকায় ১১.৭ বর্গকিলোমিটার ধরা হলেও তার বাইরে এর মোট বিস্তৃতি সর্বমোট ৩৭.৭৬ বর্গ কিলোমিটার ধরা হয়। এই বিস্তৃতি একটি বাণিজ্যিক গ্যাসক্ষেত্র ধারণ করার উপযুক্ত হতে পারে বলে বিবেচনা

করা যায়। এক হিসাব অনুযায়ী জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে প্রায় ১০০০ মিলিয়ন টন কয়লাস্তরে মিথেন গ্যাসের সম্ভাব্য মজুত ৩৫০ থেকে ৫০০ বিলিয়ন ঘনফুট (ইলাহী ১৯৯৫)। এই গ্যাসের উত্তোলনযোগ্যতা ৫০% ধরে এখানে একটি ছোট থেকে মাঝারি আকারের গ্যাসক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে থাকেন।

৪.২.৫ টারশিয়ারি কয়লা ঃ এ পর্যন্ত আলোচিত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্র এবং কয়লা মজুতসমূহ সবই পারমিয়ান যুগের গন্ডোয়ানা কয়লা হিসেবে একই শ্রেণিভুক্ত এবং তা এদেশের কয়লা মজুতের প্রায় সবটাই ধারণ করে। দেশের পূর্বাংশে তথা সিলেট ও চট্টগ্রাম এলাকায় একাধিক স্থানে ভিন্নতর ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে সৃষ্ট টারশিয়ারি যুগের (Tertiary period) শিলাস্তরে লিগনাইট (lignite) বা সাব বিটুমিনাস (sub bituminus) জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া যায় যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের পরিমাণ অল্প বা অতি অল্প। এসব টারশিয়ারি কয়লা উৎপত্তিগত ও গুণগত দিক থেকে উত্তরবঙ্গের গন্ডোয়ানা কয়লা থেকে ভিন্নতর।

বাংলাদেশ-মেঘালয় সীমান্ত বরাবর সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট-টাকেরঘাট এলাকায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩ কিলোমিটার বরাবর ভূপৃষ্ঠের নিচে ৪৫ মিটার থেকে ৯৭ মিটার গভীরতার মধ্যে ইয়োসিন উপযুগের তুরা স্যান্ডস্টোন সংঘে কয়েকটি কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে দুটি কয়লাস্তর উল্লেখযোগ্য যাদের পুরুত্ব যথাক্রমে ১ মিটার এবং ১.৬ মিটার। এই কয়লাস্তর দুটি লালঘাট থেকে পশ্চিমে এবং টাকেরঘাট থেকে পূর্বে আরো এলাকা বরাবর বিস্তৃত রয়েছে এবং উত্তরে সীমান্ত বরাবর পাহাড়ি ঢালেও উন্মোচিত রয়েছে (খান ১৯৯১)। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কয়লা এক সময় টাকেরঘাট সংলগ্ন ধারমুরা পাহাড়ের ঢাল থেকে খনন করে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সরবরাহ করা হতো। এই কয়লা কালো, উজ্জ্বল, শক্ত এবং সালফারের মৃদু গন্ধযুক্ত। এটি লিগনাইট থেকে সাববিটুমিনাস প্রকৃতির কয়লা এবং এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৩। কয়লাস্তরের ঢাল বা নতি (dip) বরাবর ৩০০ মিটার বিস্তৃতি ধরে এ স্থানে কয়লা মজুতের পরিমাণ প্রায় ৩ মিলিয়ন টন।

সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মায়োসিন-প্লায়োসিন উপযুগে বদ্বীপ (delta) এবং নদীবাহিত সমতল (fluvial plain) পরিবেশে গঠিত সুরমা দল, তিপাম সংঘ ও ডুপিটিলা সংঘের শিলাস্তরে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প থেকে অতি অল্প পুরুত্বের লিগনাইট শ্রেণির কয়লাস্তরের সাক্ষ্য মেলে, যদিও এদের কোনটি অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য মজুত হিসেবে বিবেচিত হয়নি। মায়োসিন-প্লায়োসিন শিলাস্তরে লিগনাইট কয়লার সাক্ষ্য রেকর্ড করা স্থানসমূহের মধ্যে লামা (বান্দরবন), কাওখালী (চট্টগ্রাম), দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪.৩ বাংলাদেশের পীট সম্পদ

১৯৫৩ সনে বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলের বাঘিয়া-চান্দা বিল এলাকায় (বর্তমানে মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় অবস্থিত) এবং খুলনায় কোলা মৌজা এবং ডাকাতিয়া বিল এলাকায় বিরাট পীটের মজুত আবিষ্কৃত হয় (সারণি ১৩)। এ ছাড়াও এদেশের অনেক স্থানে তথা সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, রংপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল ইত্যাদি এলাকায় ছোট আকারের পীট মজুতের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে সিলেটের চরকাই ও পাগলা এবং মৌলভীবাজারের পীট মজুদ উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্ত পীট মজুতসমূহ সাধারণত দেশের বদ্বীপ ও পলিজ বন্যাতল (deltaic and alluvial floodplain) এলাকায় নিম্নাঞ্চলসমূহে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ নিম্নাঞ্চলসমূহ জলাভূমির সৃষ্টি করে যা বছরের অধিক সময়ই পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। এ পীটসমূহ আধুনিক পলিমাটি (Recent alluvial) তথা কাদা, সিল্ট কাদা (silty shale) এবং বালিযুক্ত কাদা (sandy shale) স্তরসমূহের সাথে স্তরীভূত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূপৃষ্ঠের নিচে অতি অল্প গভীরতায় অবস্থান করে। সাধারণভাবে পীটস্তরসমূহ ১ থেকে ২ মিটার পুরু হয়ে থাকে এবং তা কখনো বা বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকতে দেখা যায়। এ পীটসমূহ বাদামি বা কালো রঙের, আঁশ বা তন্তুযুক্ত, ভেজা অবস্থায় নরম ও শুকালে শক্ত আকার ধারণ করে এবং এদের গড় ক্যালরিফিক মান ৬৭৭০ বিটিইউ/পাউন্ড।

সারণি ১৩ ঃ বাংলাদেশেরে পীট মজুতসমূহ (সূত্র: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ)।

স্থান	বিস্তৃতি (বর্গ কিলোমিটার)	মজুত(শুষ্ক) (মিলিয়ন টন)
বাঘিয়া-চান্দা বিল (মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা)	৫১৮	১৫০
কোলা মৌজা (খুলনা জেলা)	৩৯	৮
মৌলভীবাজার (মৌলভীবাজার জেলা)	৯.৫ ও ৪.৫	২.৮৬
পাগলা ও চরকাই (সিলেট জেলা)	১১.৫ ও ১১.৬	৩

বাংলাদেশের পীট সম্পদসমূহের বাণিজ্যিক ব্যবহার এখনও শুরু হয় নি যদিও বিশেষজ্ঞ পরামর্শক দল এই পীটসমূহের বাণিজ্যিক ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এই মত প্রকাশ করেন যে, এই পীট শুষ্ক অবস্থায় এবং এ দিয়ে তৈরি ব্রিকেট (briquette) ব্যবহার করে গৃহস্থালী কাজে, শিল্পক্ষেত্রে যেমন ইটের ভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে এবং পল্লী অঞ্চলে ছোট আকারের (১০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালানোর কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৩ সারণিতে বাংলাদেশে প্রাপ্ত পীট এবং তাদের মজুতসমূহের তথ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নিচে এদেশের কয়েকটি প্রধান পীট মজুত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৪.৩.১ বাঘিয়া-চান্দা বিল পীট ঃ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পীট মজুত মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় (পূর্বে ফরিদপুর জেলায় অন্তর্ভুক্ত) বাঘিয়া ও চান্দা বিল এলাকায় প্রায় ৫১৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এখানে পীটের মোট মজুত শুষ্ক অবস্থায় ১৫০ মিলিয়ন টন। এই পীট বাদামি থেকে কালো রঙের, ভেজা অবস্থায় নরম এবং শুকালে শক্ত আকার ধারণ করে। উদ্ভিদজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির কারণে তা তন্তুময় (fibrous)। কোনো রকম বন্ধনকারী (binder) পদার্থ ছাড়াই কেবল চাপ প্রয়োগে এই পীট দিয়ে ব্রিকেট তৈরি করা যায়। এই পীটের নমুনাসমূহের প্রক্সিমেট বিশ্লেষণে নির্ধারিত গড় উপাদান হচ্ছে : স্থির কার্বন ২৪%, ছাই ১৬.৬%, উদ্বায়ী পদার্থ ৪২.৩%, এবং আর্দ্রতা ২৭.১%। এই পীটে অল্প পরিমাণ সালফার রয়েছে।

বাঘিয়া - চান্দা বিল এলাকাটি বদ্বীপ বন্যাতল বা সমতলে একটি নিম্নভূমি জুড়ে অবস্থিত যা বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ই (জুলাই থেকে নভেম্বর) প্রায় ৩ মিটার পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। এখানে পীটের স্তর ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূপৃষ্ঠের নিচে কয়েক সেন্টিমিটার থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৪ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। এই পীট স্তরসমূহের পুরুত্ব সাধারণভাবে ১ থেকে ২ মিটার, কিন্তু স্থানভেদে পীট স্তরসমূহ মাত্র কয়েক

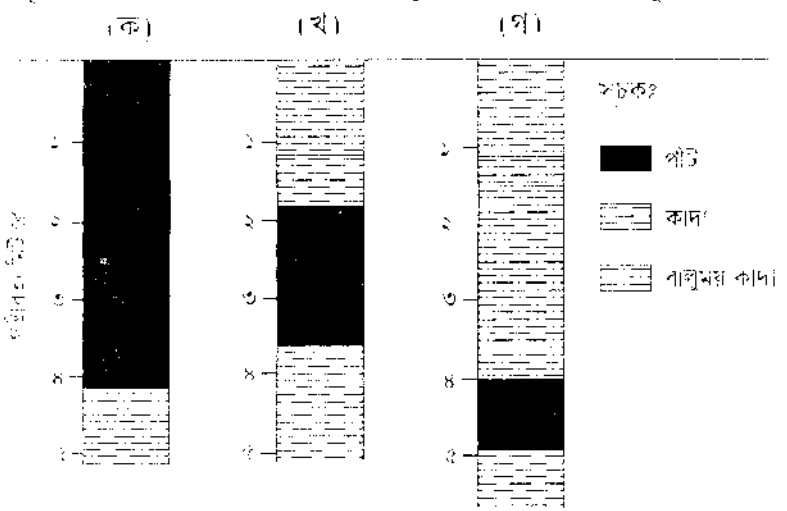

চিত্র ৪.৭ ঃ বাঘিয়া-চান্দা বিল পীট মজুত এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস, (ক) পীটের উপর আবরণ নেই, (খ) পীটের উপর অল্প আবরণ, (গ) পীটের উপর অধিক আবরণ (সূত্র: খান ১৯৯১)।

সেন্টিমিটার থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৪ মিটার পুরুত্ব ধারণ করে। এই এলাকায় পীটের গড় পুরুত্ব ২ মিটার। খান (১৯৯১) বাঘিয়া - চান্দা বিল পীট মজুতের এলাকা ভেদে তিনটি নমুনাভিত্তিক স্তর বিন্যাস (stratigraphy) তথা যেখানে পীট ভূপৃষ্ঠে, যেখানে পীটের উপর অল্প পলি আবরণ এবং যেখানে পীটের উপর অধিক পলি আবরণ রয়েছে তা প্রদান করেন (চিত্র ৪.৭)। তিনি বাঘিয়া - চান্দা বিল পীটকে তাদের ভৌত গুণাবলি ভেদে তিনভাগে বর্ণনা করেন যথা ঃ

(১) অপরিপক্ক পীট (immature peat) ঃ মধ্যম বাদামি রঙের, নরম ও অল্প ঘনত্বের পীট যার ভেতর বিশ্লিষ্ট (decomposed) হয় নি এমন উদ্ভিদ অংশবিশেষ রয়েছে। এই পীট ভূপৃষ্ঠে অথবা কেবল অতি অল্প পলির আবরণের নিচে পাওয়া যায়।

(২) অল্প পরিপক্ক পীট (slightly mature peat) ঃ গাঢ় বাদামি রং এর কিছুটা দৃঢ়, মধ্যম ঘনত্বের পীট, যার ভিতর উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ মোটামুটিভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে আংশিক স্বচ্ছ তন্তু (fibre) সৃষ্টি করেছে ; এই পীট ভূপৃষ্ঠের নিচে মাঝারি মাত্রার গভীরতায় পাওয়া যায় ।

(৩) পরিপক্ক পীট (mature peat) ঃ ধূসর বাদামি বা কালো রং এর দৃঢ় পীট, যার ভেতর উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট হয়েছে।

৪.৩.২ কোলা মৌজা পীট ঃ কোলা মৌজা পীট মজুত খুলনা থেকে ৫.৫ কিলোমিটার দূরে কোলা বারাসাট নিম্নাঞ্চল এলাকায় প্রায় ৩৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এই পীট আধুনিক পলিজ সমতলে কাদাস্তরের সাথে স্তরীভূত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূপৃষ্ঠের নিচে অনূর্ধ্ব ১.৫ মিটার গভীরতার মধ্যে অবস্থান করে। পীট স্তরের পুরুত্ব কয়েক সেন্টিমিটার থেকে ৩.৫ মিটার লক্ষ্য করা যায় এবং এদের গড় পুরুত্ব প্রায় ১.৫ মিটার। কোলা মৌজায় পীটের মোট মজুত শুষ্ক অবস্থায় ৮ মিলিয়ন টন।

এই পীট গাঢ় বাদামি রঙের এবং এতে জৈব পদার্থসমূহ পরিণত বা উচ্চ পর্যায়ের বিশ্লিষ্ট হওয়ার চিহ্ন বহন করে। এই পীটের নমুনাসমূহের প্রক্সিমেট বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ হচ্ছে : স্থির কার্বন ২১% থেকে ২৯%, ছাই ১১% থেকে ৩০%, আর্দ্রতা ১৩% থেকে ২৪% এবং উদ্বায়ী পদার্থ ৩১% থেকে ৪৭%।

৪.৩.৩ মৌলভীবাজার পীট ঃ মৌলভীবাজারের সন্নিকটে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুটি পাহাড়ি এলাকার মধ্যবর্তী উপত্যকা এলাকায় আধুনিক পলিস্তরের মধ্যে দুটি পীট মজুত যথাক্রমে ৯.৫ বর্গ কিলোমিটার এবং ৪.৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। উভয় ক্ষেত্রেই মাত্র একটি করে পীট স্তর পাওয়া যায় যার পুরুত্ব ১ মিটার থেকে ১.৫ মিটার। এই স্থান দুটিতে পীটের (শুষ্ক অবস্থায়) মজুত যথাক্রমে ২.১ মিলিয়ন টন এবং ০.৭৬ মিলিয়ন টন।

এই পীট বাদামি রঙের, নরম এবং তা শুকালে শক্ত আকার ধারণ করে। এতে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্লিষ্ট বা আংশিকভাবে বিশ্লিষ্ট উদ্ভিদ জাতীয় জৈব পদার্থের উপস্থিতির কারণে তা তন্তুময় (fibrous)। প্রক্সিমেট বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই পীটের উপাদানসমূহ হচ্ছে স্থির কার্বন ১৪.২% থেকে ১৭.৭%, ছাই ৩৩% থেকে ৪১%, আর্দ্রতা ১৪% থেকে ১৫.৪% । এই পীটে ছাই-এর পরিমাণের আধিক্য হেতু তা বাঘিয়া চান্দা বিলের পীটের তুলনায় নিম্নমানের বলে বিবেচিত হয়।

৪.৩.৪ পাগলা ও চরকাই পীট ঃ এই পীট মজুত দুটি সিলেট জেলায় মহাসিংহ এবং সুরমা নদীর বন্যা সমতলে চরকা ও পাগলা নামক স্থানে অবস্থিত। এই এলাকাসমূহ বছরের প্রায় পাঁচ মাসই পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। আধুনিক পলি বালি ও কাদাস্তরের সাথে স্তরীভূত এই পীট স্তরসমূহের পুরুত্ব ১ মিটার থেকে ২ মিটার। পাগলায় পীট প্রায় ১১.৫ বর্গ কিলোমিটার এবং চরকাই পীট প্রায় ১১.৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এদের মজুতের পরিমাণ শুষ্ক অবস্থায় পাগলায় ১.৮ মিলিয়ন টন এবং চরকাই এ ১.২ মিলিয়ন টন। এই পীটসমূহের গড় মান মৌলভীবাজার পীটের সমতুল্য।

৪.৩.৫ পীট উত্তোলন ও উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি স্থানে উত্তোলনযোগ্য পীটের উল্লেখযোগ্য মজুতের সন্ধান জানা থাকলেও এর বাণিজ্যিক ব্যবহার এখনও শুরু হয় নি। পীটের বাণিজ্যিক ব্যবহার প্রচলনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সনে পেট্রোবাংলা কর্তৃক মাদারীপুর জেলায় বাঘিয়া বিল পীট মজুত এলাকায় একটি দুই বছর মেয়াদী 'পীট উন্নয়ন ও প্রদর্শন প্রকল্প' চালু করা হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাঘিয়া বিল এলাকায় পীট খনন ও উত্তোলন এবং তা দিয়ে ব্রিকেট তৈরি করে তা জনগণকে জ্বালানি হিসেবে গৃহস্থালী ও শিল্প কারখানায় ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্প অনুযায়ী দুই বছরে প্রায় ২৩০০ মেট্রিক টন পীট উত্তোলন করা হয় এবং তা দিয়ে ব্রিকেট তৈরি করে বাজারজাত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রকল্প অনুযায়ী উৎপাদিত পীট এবং তা থেকে তৈরি ব্রিকেট গৃহস্থালী ও ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে লাভজনকভাবে ব্যবহারের ভাল সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রকল্পের ফলাফল অনুযায়ী ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারে বাণিজ্যিকভাবে পীটের ব্যবহার শুরু করবার উদ্যোগ গৃহীত হতে পারে বলে আশা করা যায়।

উপরিউক্ত পীট প্রকল্প ছাড়াও বাংলাদেশের পীট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্ভাবনাও ব্যক্ত করা হয়। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সহজলভ্য পীট মজুতসমূহকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে-গঞ্জে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ব্যক্ত হয় যা দেশের পল্লী বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। খুলনার কোলা মৌজা পীট মজুতের সম্ভাব্য ব্যবহারের

উপর এক সমীক্ষায় মত প্রকাশ করা হয় যে এ এলাকায় একাধিক ক্ষুদ্র আকারের তথা ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে । একটি ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালাতে বছরে প্রায় ১ লক্ষ টন শুষ্ক পীট প্রয়োজন হবে যা উত্তোলনের জন্য প্রায় ৭০ একর এলাকা পীট খননের আওতায় আনতে হবে। এ ধরনের উন্মুক্ত খনন কাজ প্রাথমিকভাবে মূলত শ্রমভিত্তিক হতে হবে এবং এতে প্রতিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য প্রায় ৪০০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে (ইসলাম ও বাটলার ১৯৮৫)।

বাংলাদেশে পীট বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের একটি অসুবিধা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পীট মজুতসমূহ পলিজ বা বন্যা সমতলের নিম্নাঞ্চলসমূহ জুড়ে অবস্থান করে যা বছরের এক বড় অংশেই পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। উপরন্তু এই নিম্নাঞ্চলসমূহের অবকাঠামো অতি অনুন্নত পর্যায়ের রয়ে গেছে যেখানে খনন ও উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রাথমিকভাবে সহজসাধ্য নয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সম্ভবত এখনও পীট ব্যবহার রীতি (peat culture) গড়ে উঠে নি। এতদসত্ত্বেও জ্বালানি সংকট কাটিয়ে উঠতে দেশের বিশাল পীট মজুতসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার বিরাট ভূমিকা নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন।

--

পঞ্চম অধ্যায়

চুনাপাথর
(Limestone)

৫.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি

চুনাপাথর এক প্রকার পাললিক শিলা যা মূলত ক্যালসাইট (calcite) খনিক দিয়ে গঠিত। ক্যালসাইট ছাড়াও চুনাপাথরের উপাদানসমূহের মধ্যে সামান্য ডলোমাইট (dolomite), কাদা খনিক (clay mineral) ও সিলিকা থাকতে পারে। চুনাপাথর তার উৎপত্তিগত কারণে সাধারণত প্রচুর পরিমাণ সামুদ্রিক প্রানীর খোলসের জীবাশ্ম (shell fossil) ধারণ করে। চুনাপাথর সাধারণত সাদা, হালকা বাদামি বা ধূসর রঙের শক্ত শিলা হিসেবে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত অবস্থায় উচ্চভূমির সৃষ্টি করে থাকে। বিশ্বের পাললিক শিলাস্তূপের মধ্যে চুনাপাথরের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। এক হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের মোট পাললিক শিলা স্তূপের ২০% চুনাপাথরের তৈরি। চুনাপাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপাদানসমূহের মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (প্রায় ৫০%) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (প্রায় ৪০%) প্রধান।

চুনাপাথর সাধারণত উন্মুক্ত অগভীর উষ্ণ সাগরের পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে থাকে। চুনাপাথরের উপাদানসমূহ সাগরের পানি থেকে মূলত জৈব রাসায়নিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়ে একই স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে সাগরের তলদেশে জমা হয়ে থাকে। চুনাপাথরের মূল উপাদান সাগরের প্রাণিকুলের ক্যালসাইট খোলস (shell) কিংবা সাগরের পানি থেকে সরাসরি কেলাসিত ক্যালসাইট, উভয় প্রকারই হতে পারে।

চুনাপাথরের প্রধান উপাদান ক্যালসাইট হওয়ার কারণে এই পাথর বহু প্রাচীনকাল থেকেই চুন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান সভ্যতার অন্যতম ব্যবহার্য দ্রব্য সিমেন্ট তৈরির মূল উপাদান চুনাপাথর। এ ছাড়াও লৌহ শিল্পে, কাগজ শিল্পে চুনাপাথরের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। চুনাপাথরের টুকরা বা খণ্ড দিয়ে বহু স্থানে ইমারত নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

৫.২ বাংলাদেশের চুনাপাথর সম্পদ

বাংলাদেশে চুনাপাথরের মজুত মূলত কেবল একটি শিলাস্তর একক (stratigraphic unit) তথা ইয়োসিন উপযুগের সিলেট লাইমস্টোন সংঘতেই (Sylhet Limestone

Formation) সীমাবদ্ধ। এই শিলা সংঘ বেঙ্গল বেসিনের বগুড়া শেলফ এলাকায় বিস্তীর্ণভাবে বিদ্যমান এবং তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত জিওসিনক্লাইন অংশে নেই। উত্তর-পশ্চিমে বগুড়া শেলফ এলাকায় ভূগর্ভে সিলেট লাইমস্টোন সংঘ একটি চিহ্নিত দিগন্ত (marker horizon) হিসেবে সাইসমিক প্রস্থচ্ছেদে (seismic section) দেখা যায় এবং এই এলাকায় সব কয়টি কূপেই বিভিন্ন গভীরতায় এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যেমন এটি সিংড়া কূপে ২১২৬ মিটার, কুচমা কূপে ১৭৭৪ মিটার, বগুড়া কূপে ১৭৬৬ মিটার এবং জয়পুরহাট-পাহাড়পুর এলাকার কূপসমূহে মাত্র ৩৩২ মিটার থেকে ৫৫০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। সিলেট চুনাপাথর সংঘের পুরুত্ব উত্তর-পশ্চিমে জয়পুরহাট এলাকায় প্রায় ২৪ মিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিণ-পূর্বে বগুড়া কুচমা এলাকায় প্রায় ২০০ মিটার ধারণ করে। উল্লেখ্য যে ১৯৫৯ সনে আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি (STANVAC) বগুড়ায় তেল অনুসন্ধানে কুচমা-১ কূপ খননকালে সর্বপ্রথম এই চুনাপাথর স্তরের সন্ধান পায়।

সারণি ১৪ ঃ বাংলাদেশের চুনাপাথরের মজুতসমূহ (সূত্র: জাহের ও অন্যান্য ১৯৮৬; খান ১৯৯১)।

স্থান	মজুত (মিলিয়ন টন)	মন্তব্য
জয়পুরহাট	২৭০ (৬.৪৭ বর্গ কি:মি: প্রস্তাবিত চুনাপাথর খনি এলাকায়)	১২ বিলিয়ন টন (৩৯০ বর্গ কি:মি: মোট মজুত এলাকায়)
টাকেরঘাট-লালঘাট-ভাঙ্গেরঘাট	১৪	১৫০ মিটার পর্যন্ত গভীরতা ধরে
বাগালী বাজার	৩০	২৪০ মিটার পর্যন্ত গভীরতা ধরে
সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ	২.৮	-

অপর দিকে বগুড়া শেলফের উত্তর-পূর্ব দিকে উত্তর শেলফ (northern shelf) অর্থাৎ শিলং শেলফ (Shillong shelf) এলাকায় ভারতের মেঘালয় রাজ্যে সিলেট লাইমস্টোন সংঘ বিস্তীর্ণভাবে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত। এই উন্মোচিত চুনাপাথর সংঘের কেবল অংশ বিশেষ বাংলাদেশের ভিতর সুনামগঞ্জ জেলার ভারত সীমান্তবর্তী ২০ কিলোমিটার লম্বা এলাকা বরাবর বিস্তৃত রয়েছে। এটিই টাকেরঘাট ও সংলগ্ন এলাকার চুনাপাথর মজুতের সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে অল্প পরিমাণ প্লেইসস্টোসিন উপযুগের চুনাপাথরের মজুত পাওয়া যায় (সারণি ১৪)।

বাংলাদেশে চুনাপাথরের উল্লেখযোগ্য মজুতসমূহকে তিনটি অংশে বর্ণনা করা হয়েছে - যথাঃ (১) জয়পুরহাটের ভূগর্ভস্থ চুনাপাথর, (২) টাকেরঘাট ও সংলগ্ন এলাকায় উন্মোচিত চুনাপাথর এবং (৩) সেন্ট মার্টিন্সের চুনাপাথর।

৫.২.১ জয়পুরহাটের ভূগর্ভস্থ চুনাপাথর ঃ বগুড়া শেলফ এলাকায় ভূগর্ভে বিস্তীর্ণভাবে বিদ্যমান সিলেট লাইমস্টোন সংঘের চুনাপাথর স্তরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালের (dip) কারণে তা উত্তর-পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত কম গভীরতায় পাওয়া যায়। জয়পুরহাট এলাকায় এই স্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে স্থানভেদে ৪১০ মিটার থেকে ৫৪১ মিটার গভীরতায় অবস্থান করে। আরও পশ্চিমে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা এলাকায় খননকৃত কূপে অধিকতর অল্প গভীরতা তথা ভূপৃষ্ঠের নিচে ৩৩০ মিটার গভীরতায় এই চুনাপাথর স্তর পাওয়া গেলেও এখানে এর পুরুত্ব জয়পুরহাটে প্রাপ্ত স্তরের পুরুত্বের চেয়ে কম।

জয়পুরহাট চুনাপাথর মধ্যম থেকে শক্ত, ঘন এবং হালকা ধূসর থেকে সাদাটে বাদামি রঙের। এটি পুরুভাবে স্তরীভূত (thick bedded) বা কখনও ম্যাসিভ (massive) প্রকৃতির এবং মধ্যম থেকে মিহি দানাদার ও জীবাশ্মবহুল। এ চুনাপাথরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ফোরামিনিফেরা (foraminifera) জীবাশ্ম এর অন্যতম প্রধান উপাদান। নুমুলাইট (nummulite) নামক এক প্রকার ফোরামিনিফেরা জীবাশ্মের আধিক্য হেতু এই চুনাপাথরকে নুমুলাইটিক চুনাপাথর (nummulitic limestone) নামে অভিহিত করা হয়। এই চুনাপাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত গড় রাসায়নিক উপাদান হলো : ক্যালসিয়াম অক্সাইড ৫০.৬২%, সিলিকন অক্সাইড ৪.২০%, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ২.৭৪%, আয়রন অক্সাইড ১.৫৪%, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ১.১৭% এবং ইগনিশন লস (ignition loss) ৪০.১৫% (জাহের ও অন্যান্য ১৯৮৬)। উপরিউক্ত রাসায়নিক উপাদান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জয়পুরহাট চুনাপাথর সিমেন্ট তৈরির জন্য যথার্থ উপযোগী।

জয়পুরহাট চুনাপাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে তা সিমেন্ট তৈরির উপযুক্ত প্রমাণিত হওয়ার পর ১৯৬৬ সনে পশ্চিম জার্মানীর মেসার্স ফ্রাইড ক্রুপ রোসটফ (Fried Krupp Rostoff) নামক খনি পরামর্শককে এই স্থানে একটি চুনাপাথর খনি স্থাপনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য নিয়োগ করা হয়। এই পরামর্শক তাদের প্রদত্ত রিপোর্টে জয়পুরহাটে একটি ভূগর্ভস্থ চুনাপাথর খনি ও তার সাথে একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে বলে মত প্রকাশ করে। এই মতামতকে যাচাই করার উদ্দেশ্যে বৃটেনের মেসার্স পাওয়েল ডাফরিন টেকনিক্যাল সার্ভিসেস (Powell Doffryn Technical Services) পরামর্শক দলকে নিয়োগ করা হলে উক্ত সংস্থা এ ব্যাপারে একই রকম ইতিবাচক মত প্রকাশ করে। সে ভিত্তিতে ১৯৬৯ সনে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্পটি অনুমোদন করে। প্রকল্পটি পুনরায় ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(ক) ভূতত্ত্ব ঃ প্রস্তাবিত জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প এলাকাটি জয়পুরহাট জেলা সদর জয়পুরহাটের পশ্চিমে তথা ঈশ্বরদী-পাবর্তীপুর রেললাইন সংলগ্ন ৬.৪৭ বর্গ

কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত (চিত্র ৫.১)। এ এলাকায় খননকৃত ছয়টি ভূতাত্ত্বিক কূপ থেকে চুনাপাথরের ভূতত্ত্ব, বিস্তৃতি ও মজুত সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।

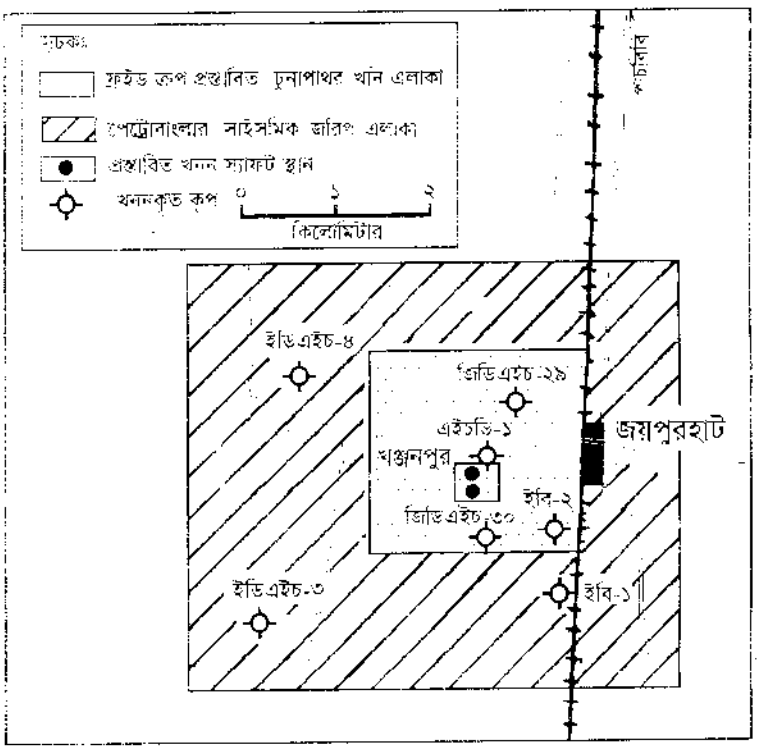

চিত্র ৫.১ ঃ জয়পুরহাটে চুনাপাথর মজুত এলাকায় প্রস্তাবিত খনি এলাকা (সূত্র: জাহের ও অন্যান্য ১৯৮৬)।

প্রস্তাবিত খনি এলাকায় চুনাপাথরের গভীরতা ৫১৫ মিটার থেকে ৫৪১ মিটার। এখানে চুনাপাথরের স্তরের নতি (dip) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি। ১৫ সারণিতে প্রস্তাবিত চুনাপাথর খনি ও সংলগ্ন এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস দেখানো হয়েছে।

স্তরবিন্যাসের সর্বনিম্নে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কেলাসিত ভিত শিলার অবস্থান, যার উপর একটি অসংগতির ব্যবধানে ইয়োসিন উপযুগের মূলত বেলেপাথর সংবলিত তুরা সংঘ বিরাজ করে। এই এলাকায় তুরা সংঘের পুরুত্ব প্রায় ৯০ মিটার। তুরা সংঘের উপরে অবস্থিত ইয়োসিন উপযুগের সিলেট লাইমস্টোন সংঘ চুনাপাথরের মজুতটি ধারণ করে। এই সংঘ মূলত চুনাপাথর স্তর দিয়ে গঠিত হলেও এর সাথে অতি অল্প পুরুত্বের

বেলেপাথর ও কাদাশিলার স্তর রয়েছে। প্রস্তাবিত চুনাপাথর খনি এলাকায় চুনাপাথরের স্তরের নিম্নাংশে অবস্থিত একটি সরু বেলেপাথরের বিচ্ছেদ (parting) তাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। এই বেলেপাথরের বিচ্ছেদের উপরে চুনাপাথরের পুরুত্ব ২০ থেকে ২৫ মিটার (গড়ে প্রায় ২২ মিটার) এবং তার নিচে এর পুরুত্ব গড়ে ২ মিটার। চুনাপাথরের স্তরটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অধিকতর পুরুত্ব লাভ করেছে এবং তা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে এসেছে। সিলেট লাইমস্টোন সংঘের উপরে মূলত কাদাশিলা সমন্বয়ে গঠিত ইয়োসিন উপযুগের কোপিলি সংঘ গড়ে প্রায় ৩৮ মিটার পুরুত্ব সৃষ্টি করেছে। এই সংঘের উপরে অবস্থিত কাদাশিলা ও বেলেপাথর সমন্বয়ে গঠিত মায়োসিন যুগের জামালগঞ্জ সংঘের পুরুত্ব প্রায় ৩৭০ মিটার।

সারণি ১৫ ঃ জয়পুরহাটে চুনাপাথর মজুত এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস (সূত্র: জাহের ও অন্যান্য ১৯৮৬)।

যুগ/উপযুগ	সংঘ (পুরুত্ব মিটারে)	শিলা লক্ষণ
হলোসিন	পলিমাটি (২ থেকে ৫.৫)	বালুময় কাদা, সিল্ট কাদা, কাদা
প্লেইসটোসিন	মধুপুর ক্লে সংঘ (২ থেকে ৬)	লাল বা লালচে বাদামি কাদা
প্লায়োসিন	ডুপিটিলা সংঘ(৭৪ থেকে ২৫৬)	বেলেপাথর, নুড়িময় বেলেপাথর
মায়োসিন	জামালগঞ্জ সংঘ (২১০ থেকে ৪২০)	বালুময় কাদা শিলা, কাদাশিলা, সিল্টশিলা ও বেলেপাথর
ইয়োসিন	কোপিলি সংঘ (৩০ থেকে ৪৪)	চুনাময় কাদা শিলা, কিছু বেলেপাথর
	সিলেট লাইমস্টোন সংঘ (১৮ থেকে ৩০)	মূলত চুনাপাথর, কিছু বেলেপাথর ও কাদা শিলা
	তুরা সংঘ (৪৫ থেকে ১০০)	বেলেপাথর ও কাদা শিলা
প্রাক ক্যামব্রিয়ান	আগ্নেয় কেলাসিত ভিত শিলা	নাইস, গ্রনোডায়োরাইট

জামালগঞ্জ সংঘের উপর একটি অসংগতির ব্যবধানে মূলত নরম বেলেপাথর দিয়ে গঠিত প্লায়োসিন উপযুগের ডুপিটিলা সংঘের অবস্থান। গড়ে প্রায় ১১০ মিটার পুরুত্বের এই সংঘটি পানিবহুল এবং তা ভূগর্ভস্থ খনি স্থাপনের সহায়ক নয় বরং এর ভিতর দিয়ে খনন শ্যাফট নির্মাণের জন্য ব্যয়সাধ্য বরফীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। ডুপিটিলা সংঘের উপরে গড়ে প্রায় ৪ মিটার পুরু কাদাশিলা গঠিত প্লেইসটোসিন উপযুগের মধুপুর ক্লে সংঘ এবং সবার উপরে গড়ে ২ মিটার পুরু আধুনিক যুগের পলিমাটির আবরণ লক্ষ্য করা যায়।

(খ) মজুত ঃ প্রস্তাবিত চুনাপাথর খনি এলাকায় ভূগর্ভে চুনাপাথরের স্তরের সুষম বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ৬.৪৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই স্থানে চুনাপাথরের মজুত রয়েছে ২৭০ মিলিয়ন টন (জাহের ও অন্যান্য ১৯৮৬) (সারণি ১৪)। অবশ্য এই মজুত হিসাব কেবল বেলেপাথরের বিচ্ছেদের উপরে বিদ্যমান চুনাপাথর স্তরকে ধরে করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে কূপ খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জয়পুরহাট এলাকায় ৩৯০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে প্রায় ২০ মিটার পুরুত্বের এই চুনাপাথরের স্তর সমভাবে বিস্তৃত। উপরিউক্ত এলাকার মধ্যে এই চুনাপাথরের মোট মজুতের পরিমাণ প্রায় ১২ বিলিয়ন টন বলে হিসাব করা হয়েছে (খান ১৯৯১) (সারণি ১৪)।

(গ) অবাস্তবায়িত জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প ঃ প্রস্তাবিত জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প অনেক পূর্বেই সরকারি অনুমোদন লাভ করলেও এবং তাকে সে সময় "জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প" হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও মূলত আর্থিক জোগানের অভাবে তা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সিমেন্ট চাহিদা পূরণ করা। এই খনি এলাকায় বছরে প্রায় ১ মিলিয়ন টন চুনাপাথর উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে ৭৬০ হাজার টন চুনাপাথর পার্শ্ববর্তী সিমেন্ট কারখানায় সরবরাহ করার কথা ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, এই খনি স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে বেশ পুরুত্বের নরম বেলেপাথরের স্তর (ডুপিটিলা সংঘ) ভেদ করে খাড়া খনন শ্যাফট তৈরি করার জন্য বিশেষ ব্যয়সাধ্য বরফীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ১৯৮০ সনের হিসাব অনুযায়ী জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট কারখানা প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জয়পুরহাটে ভূগর্ভে বিশাল চুনাপাথরের মজুত প্রমাণিত এবং তা খনন ও উত্তোলন কারিগরি দিক থেকে সম্ভব হলেও এ প্রকল্পে অর্থ জোগান দেবার মত দাতার অভাবে প্রকল্পটি অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। এই প্রকল্পে দাতা গোষ্ঠীর অনাগ্রহের একটি কারণ চুনাপাথরের স্তরের অধিক গভীরতা। এখানে উল্লেখ্য যে, ভূতাত্ত্বিক জরিপে এটি প্রতীয়মান হয় যে, জয়পুরহাটের পশ্চিমে নওগাঁ জেলায় পত্নীতলা এলাকায় এই চুনাপাথরের স্তরটি ভূপৃষ্ঠের নিচে তুলনামূলকভাবে অল্প গভীরতা তথা ৩৩০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অল্প গভীরতায় এই চুনাপাথর স্তরের ব্যাপক জরিপ ও শনাক্তকরণ আগামীতে চুনাপাথর উত্তোলনের কাজকে সহজতর ও আরো বাস্তবমুখী করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৫.২.২ টাকেরঘাট ও সংলগ্ন এলাকার উন্মোচিত চুনাপাথর ঃ সুনামগঞ্জ জেলার মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় পশ্চিমে বাগালীবাজার থেকে পূর্বে ভাঙ্গেরঘাট পর্যন্ত

২০ কিলোমিটার এলাকা বরাবর বাগালীবাজার-লালঘাট-টাকেরঘাট-ভাঙ্গেরঘাট স্থানসমূহে সিলেট লাইমস্টোন সংঘের চুনাপাথরের স্তর বিক্ষিপ্তভাবে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত অবস্থায় অল্প উচ্চ পাহাড়ি বন্ধুরতার সৃষ্টি করেছে। এলাকাটি সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানা সদর থেকে উত্তরে ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৯৫১ সনে সর্বপ্রথম টাকেরঘাটে এই উন্মোচিত চুনাপাথরের স্তর আবিষ্কার হয় বলে এটি টাকেরঘাটের চুনাপাথর নামে অধিক পরিচিত।

১৯৬১ সনে তৎকালীন ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ টাকেরঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চুনাপাথরের ব্যাপ্তি ও মজুত নির্ধারণ কাজে কূপ খনন শুরু করে। ১৯৭০ সন পর্যন্ত বাগালীবাজার-লামাকাটা-লালঘাট-টাকেরঘাট-ভাংগেরঘাট এলাকায় ৬৬ টি কূপ খনন করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৮২ সনে টাকেরঘাট ও ভাঙ্গেরঘাট এলাকায় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ আরো ৫টি কূপ খনন করে এবং ১৯৮১-৮২ সময়ে বাগালীবাজারে ইউএনডিপি (UNDP) এর সহযোগিতায় ভূপানিতাত্ত্বিক জরিপ (hydrogeological survey) কাজের জন্য আরো ৫টি কূপ খনন করে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও খননকৃত কূপসমূহের উপর ভিত্তি করে টাকেরঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূতত্ত্ব ও চুনাপাথর মজুত সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

(ক) ভূতত্ত্ব ঃ টাকেরঘাট ও সংলগ্ন স্থানসমূহের উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে সিলেট লাইমস্টোন সংঘ ব্যাপকভাবে উন্মোচিত হয়ে উচ্চ পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে। এই চুনাপাথর স্তরের ঢাল বা নতি দক্ষিণমুখী এবং তা বাংলাদেশের ভিতর টাকেরঘাট ও সংলগ্ন এলাকাসমূহে ৩০ থেকে ৫০ ডিগ্রি নতিসহ বিক্ষিপ্তভাবে উন্মোচিত অবস্থায় রয়েছে এবং দক্ষিণে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ-মেঘালয় সীমান্ত এলাকা বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ডাওকী চ্যুতি (Dauki fault) এই চুনাপাথর স্তরের বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে এবং এ কারণে বাংলাদেশের ভিতর এর ধারাবাহিকতা সীমিত।

১৬ সারণিতে টাকেরঘাট ও পার্শ্ববর্তী চুনাপাথরবাহী এলাকাসমূহের একটি সাধারণ স্তরএমবিন্যাস দেখানো হয়েছে। এ স্থানে সর্বনিম্নে অবস্থানকারী তুরা সংঘের নিম্নতল (base of Tura Formation) পর্যন্ত কোন কূপ খনন করা হয় নি। তুরা সংঘ মূলত শক্ত পরিষ্কার বেলেপাথর দিয়ে গঠিত হলেও এর সাথে সামান্য কাদাশিলা ও চুনাপাথর এবং কিছু কয়লাস্তরের বিন্যাস ঘটেছে। এই শিলা সংঘ টাকেরঘাট এলাকার কেবল অল্প ও সীমিত স্থানেই উন্মোচিত। এই এলাকায় ৩৭০ মিটারের বেশি পুরুত্বের তুরা সংঘের দেখা পাওয়া যায়।

তুরা সংঘের উপরে অবস্থিত সিলেট লাইমস্টোন সংঘ চুনাপাথর মজুতের মূল উৎস। সিলেট লাইমস্টোন সংঘ মূলত চুনাপাথর স্তর দিয়ে গঠিত হলেও এর সাথে কিছু

বেলেপাথর স্তরও বিদ্যমান। এই চুনাপাথর শক্ত, ঘন এবং ধূসর বা হালকা বাদামি রঙের। এই চুনাপাথর মূলত জীবাশ্মবহুল এবং এর ভিতর নুমুলাইট (nummulite) জীবাশ্ম অন্যতম প্রধান। গুণগত দিক থেকে এই চুনাপাথর জয়পুরহাট চুনাপাথরের মতোই। সিলেট লাইমস্টোন সংঘ বাগালীবাজার- লালঘাট- টাকেরঘাট- ভাঙ্গেরঘাট

সারণি ১৬ ঃ টাকেরঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস (সূত্র: খান ১৯৯১)।

উপযুগ	সংঘ (পুরুত্ব মিটারে)	শিলা লক্ষণ
আধুনিক	পলিমাটি (২৮)	কাদা, বালুময় কাদা ও বালু
প্লায়োসিন	ডিহিং (১২৯)	মূলত বেলেপাথর, কখনও নুড়িময়
ইয়োসিন	কোপিলি সংঘ (৪৫৭)	মূলত কাদাশিলা, কিছু বেলেপাথর
	সিলেট লাইমস্টোন সংঘ (২৪৪)	মূলত চুনাপাথর, কিছু বেলেপাথর
	তুরা সংঘ (৩৭০)	মূলত বেলেপাথর, কিছু কাদাশিলা ও কয়লাস্তর

স্থানসমূহে বিক্ষিপ্তভাবে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত রয়েছে এবং সংলগ্ন স্থানসমূহে ভূগর্ভে এর সন্ধান পাওয়া যায়। ভূগর্ভে এই শিলা সংঘের উপরিতলের অবস্থান সর্বোচ্চ প্রায় ৯০ মিটার গভীরতায় লক্ষ্য করা যায়। বাগালীবাজার-টাকেরঘাট-ভাঙ্গেরঘাট এলাকাসমূহে সিলেট লাইমস্টোন সংঘের পুরুত্ব ১০ মিটার থেকে ২৪৪ মিটার (খান ১৯৯১)।

সিলেট লাইমস্টোন সংঘের উপর অবস্থিত কোপিলি সংঘ মূলত কাদাশিলা স্তর দিয়ে গঠিত এবং এর ভিতর প্রাপ্ত সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম প্রমাণ করে তা সমুদ্রতলে একই পরিবেশে জমা হয়। কোপিলি সংঘের উপর বিরাট একটি অসংগতির (unconformity) ব্যবধানে মূলত বেলেপাথর স্তর গঠিত প্লায়োসিন যুগের ডিহিং সংঘ অবস্থিত। সবার উপরে বর্তমান যুগের পলিমাটির আবরণ এলাকাটির অনেক অংশকে আবৃত করেছে (সারণি ১৬)।

(খ) মজুত ঃ টাকেরঘাট ও সংলগ্ন ২০ কিলোমিটার এলাকায় প্রাপ্ত চুনাপাথরের মজুত নির্ণয়ে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত এবং ভূগর্ভে নির্দিষ্ট একটি গভীরতা পর্যন্ত অবস্থিত চুনাপাথরকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে।

বাগালীবাজার এলাকায় চুনাপাথরের গড় পুরুত্ব ১৫০ মিটার ধরে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৪০ মিটার গভীরতার মধ্যে চুনাপাথরের মজুত ধরা হয় ৩০ মিলিয়ন টন

(সারণি ১৪)। টাকেরঘাট- লালঘাট- ভাঙ্গেরঘাট এলাকায় চুনাপাথরের পুরুত্ব স্থানভেদে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন এবং এখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে চুনাপাথরের মজুত ধরা হয় ১৪ মিলিয়ন টন। উপরিউক্ত হিসাব অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলায় প্রাপ্ত চুনাপাথরের মোট মজুত প্রায় ৪৪ মিলিয়ন টন (আহমেদ ১৯৮০)।

সারণি ১৭ ঃ টাকেরঘাট খনি থেকে চুনাপাথর উৎপাদন (সূত্র: খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো)।

সাল	উৎপাদন (টন)	সাল	উৎপাদন (টন)
১৯৭২- ১৯৭৪	১৯,০৫৩	১,৯৮৬	২১,৭২৭
১,৯৭৬	১৫,৯৭৩	১,৯৮৭	৪৩,৫৫৩
১,৯৭৭	৫৩,৬১৬	১,৯৮৮	৩০,২৯১
১,৯৭৮	৬৩,২৬৫	১,৯৮৯	২৭,১২৫
১,৯৭৯	৫৮,৮০৬	১,৯৯০	৪১,৩৫৯
১,৯৮০	৪৩,০৪৫	১,৯৯১	৪০,৬৭৪
১,৯৮১	৪৩,৭৭৯	১,৯৯২	৩৯,৯৫৮
১,৯৮২	৪৬,৮৯০	১,৯৯৩	২৬,১০৮
১,৯৮৩	৩২,২৮৬	১,৯৯৪	২৫,৩৭৯
১,৯৮৪	৪০,৪৪০	১,৯৯৫	২৩,৪৭৪
১,৯৮৫	৪,৪২২		

অপর এক প্রকাশিত তথ্যে বাগালীবাজার, টাকেরঘাট, লালঘাট ও ভাঙ্গেরঘাট এলাকায় প্রাপ্ত চুনাপাথরের মজুত আলাদাভাবে দেখানো হয় (রহমান ১৯৯৪), যথা ঃ বাগালীবাজারে চুনাপাথর স্তরের গড় পুরুত্ব ১৭৪ মিটার ধরে ০.০৪১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মজুত ১৭ মিলিয়ন টন, লালঘাটে চুনাপাথর স্তরের পুরুত্ব ২২ থেকে ৭৬ মিটার

ধরে ০.২৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মজুত ৯.৮ মিলিয়ন টন, টাকেরঘাটে চুনাপাথর স্তরের পুরুত্ব ৩ থেকে ৪৪ মিটার ধরে ০.০৪২ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় চুনাপাথরের মজুত ২.২ মিলিয়ন টন এবং ভাঙ্গেরঘাটে চুনাপাথর স্তরের পুরুত্ব ২১ থেকে ৩৬ মিটার ধরে ০.০১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় চুনাপাথরের মজুত ১.০১ মিলিয়ন টন ।

(গ) চুনাপাথর উৎপাদন ঃ ১৯৬৫ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (EPIDC) কর্তৃক টাকেরঘাটে বাংলাদেশের একমাত্র চুনাপাথর খনি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এর পূর্বে ১৯৬১ সন থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্ষুদ্র আকারে টাকেরঘাট চুনাপাথরের খনন ও উত্তোলন শুরু হয়। টাকেরঘাটে উন্মুক্ত চুনাপাথর খনি (open pit mine) থেকে উৎপাদিত চুনাপাথর ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীকালে টাকেরঘাটে খনি এলাকা ভাংগেরঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের কোমরা চুনাপাথর খনি থেকে ছাতকে চুনাপাথর আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে তা টাকেরঘাট খনির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময় টাকেরঘাট-ভাংগেরঘাট খনি থেকে বছরে প্রায় ৬০ হাজার টন চুনাপাথর উৎপাদন করা হতো। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত এই খনি এলাকা থেকে প্রায় ৭ লক্ষ ৪১ হাজার টন চুনাপাথর উৎপাদন করা হয় (সারণি ১৭)।

৫.২.৩ সেন্ট মার্টিন্সের চুনাপাথর ঃ বাংলাদেশের চুনাপাথরের প্রধান মজুত উপরে আলোচিত জয়পুরহাট ও টাকেরঘাট এলাকায় সীমাবদ্ধ হলেও সীমিত ও ক্ষুদ্র আকারে চুনাপাথরের একটি মজুত দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে পাওয়া যায়। ১৯৫৮ সনে আবিষ্কৃত এই চুনাপাথরের মজুত প্লেইস্টোসিন এবং আধুনিক উপযুগে সৃষ্ট যথাক্রমে ককুইনা স্তর (coquina bed) এবং প্রবাল বা কোরাল গোষ্ঠী (coral colony) দিয়ে গঠিত।

সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপের ভূখণ্ডে প্লেইস্টোসিন উপযুগের ভংঙ্গুর ও ফাঁকযুক্ত ককুইনা স্তর মূলত সামুদ্রিক জীবের খোলস (shell) জমা হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত এই ককুইনা স্তরের পুরুত্ব ০.৫ থেকে ১ মিটারের বেশি এবং এ ধরনের চুনাপাথরের মজুত প্রায় ১.৮ মিলিয়ন টন (খান ১৯৯১)। সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপটির সমুদ্রকূল বরাবর সীমিত এলাকায় বর্তমান সময়ে প্রবাল গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যা উচ্চ জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। দ্বীপটির তীর থেকে সমুদ্রের দিকে অর্ধ মাইলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত এ ধরনের চুনাপাথরের মজুত ধরা হয়েছে প্রায় ১ মিলিয়ন টন।

ভূবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, উপরিউক্ত চুনাপাথরের এই সীমিত মজুত খনন ও উত্তোলন করলে তা সেন্ট মার্টিন্স এর মত ক্ষুদ্র দ্বীপের পরিবেশগত ভারসাম্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে যা ভবিষ্যতে কখনো দ্বীপটির অস্তিত্বের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কঠিন শিলা
(Hard Rock)

৬.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি, উৎপত্তি

কঠিন শিলা বলতে সাধারণত শক্ত ঘন, কেলাসিত আগ্নেয় বা রূপান্তরিত (crystalline igneous and metamorphic) শ্রেণিভুক্ত শিলাকে বোঝানো হয় যা সড়ক, রেলপথ, ব্রিজ, প্রতিরোধ বাঁধ বা গৃহ নির্মাণ এবং নদী শাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে থাকে। এ ধরনের শিলাকে তাই নির্মাণ শিলা (construction stone) বা প্রকৌশলী শিলা (engineering stone) নামেও অভিহিত করা হয়। কঠিন শিলা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয় শিলা যেমন গ্রানাইট (granite), গ্রানোডায়োরাইট (granodiorite), ডায়োরাইট (diorite), ব্যাসাল্ট (basalt), গাব্রো (gabbro) ইত্যাদি অথবা কোন প্রকার রূপান্তরিত শিলা যেমন নাইস (gneiss), কোয়ার্টজাইট (quartzite), মার্বেল (marble) ইত্যাদি হয়ে থাকে। এই শিলাসমূহ মূলত অতি প্রাচীনকালে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান মহাযুগে আদি ভূতত্ত্ব গঠনের সময় সৃষ্টি হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে সৃষ্ট আগ্নেয় শিলাও কোন এলাকায় কঠিন শিলার মজুত ঘটাতে পারে। এই শিলাসমূহ মূলত কেলাসিত এবং তা পরবর্তী যুগে ক্ষয় ও পললক্ষেপণের মাধ্যমে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত নরম পাললিক শিলা (sedimentary rock) থেকে উৎপত্তিগত ও প্রকৃতিগতভাবে ভিন্নতর হয়ে থাকে এবং অবস্থানগতভাবে ভিন্নতর ভূতাত্ত্বিক কাঠামোতে বিরাজ করে।

পৃথিবীর জন্মের আদি প্রহরে গলিত তপ্ত তরল ম্যাগমাজাতীয় পদার্থ ক্রমান্বয়ে শীতল ও কঠিন হয়ে যে কেলাসিত শিলার সৃষ্টি করে তাই আগ্নেয় শিলা। পরবর্তীকালে এই শিলা আবার ভূগর্ভের তীব্র তাপ ও চাপের প্রভাবে ভৌত ও রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে কেলাসিত রূপান্তরিত শিলা সৃষ্টি করে। এই আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাসমূহই পৃথিবীর আদি ভূত্বক (crust) সৃষ্টি করে। অপেক্ষাকৃত নরম পাললিক শিলাস্তর আদি ভূত্বকের উপর কোথাও বিশাল পুরুত্বের এবং কোথাও বা অল্প পুরুত্বের আবরণ সৃষ্টি করে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পাললিক শিলাস্তরের নিচে কেলাসিত শিলার ভিত পাওয়া যায়। এ কারণে একে আগ্নেয় ও রূপান্তরিত ভিত শিলা বা পীঠ শিলা (basement rock) অথবা এর প্রধান জন্মকাল অনুযায়ী আর্কিয়ান বা প্রাক-ক্যামব্রিয়ান

ভিত শিলা (Archaean or Precambrian basement) বলা হয়। কঠিন শিলার মূল উৎস এই কেলাসিত ভিত শিলা বা পীঠ শিলাই এ অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পৃথিবীর বহু অংশে কেলাসিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কঠিন শিলার ভিত ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত বা কেবল অতি অল্প পুরুত্বের পাললিক শিলা দিয়ে আবৃত। পৃথিবীর যে সকল স্থানে ভিত শিলা ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত বা কেবল অতি অল্প পাললিক শিলার আবরণে আবৃত সে সমস্ত এলাকাকে শিল্ড (shield) নামে অভিহিত করা হয়। বিশ্বের বৃহৎ শিল্ড এলাকাসমূহের মধ্যে কানাডিয়ান শিল্ড, ব্রাজিলিয়ান শিল্ড, অস্ট্রেলিয়ান শিল্ড, ভারতীয় শিল্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই এই শিল্ড এলাকাসমূহই কঠিন শিলার মোক্ষম অর্থনৈতিক মজুত ধারণ করে। এই কঠিন শিলার মধ্যে উৎপত্তিগত কারণে অনেক সময় মূল্যবান ধাতব আকরিকও (metallic ore) পাওয়া যায়।

অনেক সময় একটি পাহাড়ি শিল্ড এলাকা থেকে আগত ঝরনা বা নদীধারা পাহাড়ের সম্মুখস্থ পাদদেশীয় পলিজ সমতলে (piedmont alluvial plain) কঠিন ভিত শিলার নুড়ি বা গ্রাভেল বহন করে এনে জমা করতে পারে। সে ক্ষেত্রেও তা কঠিন শিলার অপর এক ধরনের অর্থনৈতিক মজুতের উৎস হতে পারে।

৬.২ বাংলাদেশের কঠিন শিলা সম্পদ

বাংলাদেশ মূলত নরম পলিমাটির দেশ হিসেবে পরিচিত। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীধারা বাহিত পলিজ ও বদ্বীপ সমতল (alluvial and deltaic plains) ভূমি এদেশের দুই তৃতীয়াংশ গঠন করে। পূর্বাংশে উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত পাহাড় শ্রেণিও মূলত নরম বা অল্প কঠিন পাললিক শিলা তথা বেলেপাথর ও কাদাশিলা স্তর দিয়ে গঠিত। তবে এদেশের উত্তর অংশে তথা উত্তরবঙ্গে ভূগর্ভে স্বল্প গভীরতায় কেলাসিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কঠিন শিলার বিশাল মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা উত্তোলনের জন্য সেখানে ভূগর্ভস্থ খনি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এদেশের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ও বিভাগ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে এদেশের উত্তর-পশ্চিমে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় প্লাটফর্মের উত্তর অংশে রংপুর স্যাডল অঞ্চলটিতে ভিত শিলার গভীরতা সর্বাপেক্ষা কম। দিনাজপুর-রংপুর জেলা বরাবর বিস্তৃত এই রংপুর স্যাডল অঞ্চল পূর্ব দিকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলং শিল্ড এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের ভারতীয় শিল্ড এর সংযোগকারী অংশ মাত্র যা কেবল অতি অল্প পুরুত্বের পলিস্তর দিয়ে আবৃত হয়েছে। সে হিসেবে এ অংশটিকে দিনাজপুর শিল্ড নামেও অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের কঠিন শিলার প্রধান মজুত উপরিউক্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এছাড়াও ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলং পাহাড় থেকে আগত নদীসমূহ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্ত এলাকায় কঠিন শিলার নুড়ি বা গ্রাভেল

এনে কিছু মজুত সৃষ্টি করে। কঠিন শিলার নুড়ির আরও কিছু ছোট মজুত বাংলাদেশে সর্ব উত্তরে পঞ্চগড়, লালমনিরহাট জেলার সীমান্ত এলাকা বরাবর পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের কঠিন শিলার মজুতসমূহকে প্রাধান্য অনুযায়ী চার ভাগে আলোচনা করা যায়, যথা: (১) মধ্যপাড়ার ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা, (২) ভোলাগঞ্জ-জাফলং এর কঠিন শিলার নুড়ি, (৩) তেতুলিয়া-পঞ্চগড় -পাটগ্রামের কঠিন শিলা নুড়ির স্তর এবং (৪) চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামের কনক্রিশন নুড়ি ।

৬.২.১ মধ্যপাড়ার ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা ঃ দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থানে অতি স্বল্প গভীরতায় প্রাপ্ত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কেলাসিত ভিত শিলা বাংলাদেশের কঠিন শিলার সর্ববৃহৎ মজুত সৃষ্টি করেছে। মধ্যপাড়া দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার অন্তর্ভুক্ত এবং ফুলবাড়ী রেলস্টেশন থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত (চিত্র ৬.১)। দিনাজপুর শহর থেকে পূর্বদিকে এর দূরত্ব প্রায় ৫৪ কিলোমিটার।

ষাট দশকে উড়োজাহাজ নির্ভর ভূচৌম্বক জরিপে (aeromagnetic survey) দিনাজপুর জেলায় স্বল্প গভীরতায় ভিত শিলার অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়ার পর তৎকালীন ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ সেখানে ভূকম্পন জরিপ সম্পন্ন করে। উপরিউক্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে ১৯৭৪-৭৫ সনে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ মধ্যপাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি কূপ খনন করে এবং ভূগর্ভে অতি স্বল্প গভীরতায় কেলাসিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিতের কঠিন শিলার অস্তিত্ব প্রমাণ করে (চিত্র ৬.২)। এই ছয়টি কূপে মধ্যপাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় কেলাসিত ভিত শিলার উপরিতল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২৮ মিটার থেকে ১৫৪ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, এই এলাকায় জিএইচডি-২৪ (GHD-24) কূপে ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১২৮ মিটার নিচে প্রাপ্ত কঠিন ভিত শিলাই বাংলাদেশে সবচেয়ে স্বল্প গভীরতায় ভিত শিলার অবস্থান চিহ্নিত করে। বর্তমানে মধ্যপাড়ায় একটি কঠিন শিলা খনি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই খনি থেকে কঠিন শিলা উত্তোলন শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(ক) ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ঃ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা এলাকা ভূতাত্ত্বিকভাবে রংপুর স্যাডল বা দিনাজপুর শিল্ড বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিনাজপুর-রংপুর বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই ভূতাত্ত্বিক বিভাগটির বৈশিষ্ট্য হলো এখানে কেলাসিত ভিত শিলা ভূগর্ভে স্বল্প গভীরতায় অবস্থিত এবং এটি দুটি চ্যুতির ব্যবধানে যথাক্রমে পশ্চিমে ভারতীয় শিল্ড এবং পূর্বে শিলং শিল্ড এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের ভিতর এই এলাকায় পাললিক শিলার আবরণের পুরুত্ব পূর্বাংশে প্রায় ৫০০ মিটার থেকে ক্রমান্বয়ে কমে পশ্চিমাংশে দিনাজপুর জিলায় প্রায় ২০০ মিটার বা তার

কম। দিনাজপুরে মধ্যপাড়ায় সবচেয়ে স্বল্প গভীরতায় ১২৮ মিটারে এই কঠিন শিলার অবস্থানটি কেলাসিত ভিত শিলার একটি উত্তোলিত অংশ মাত্র (চিত্র ৬.১)। এই উত্তোলিত অংশটি কাঠামোগতভাবে চ্যুতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এবং মধ্যপাড়া এলাকায় তা একটি প্রায় গম্বুজ (dome) আকারে ভূগর্ভে বিরাজমান (রহমান ১৯৮৭)। এই গম্বুজ আকারের উত্তোলিত অংশটিতে কঠিন শিলার গভীরতা ১২৮ মিটার থেকে প্রায় ২০০

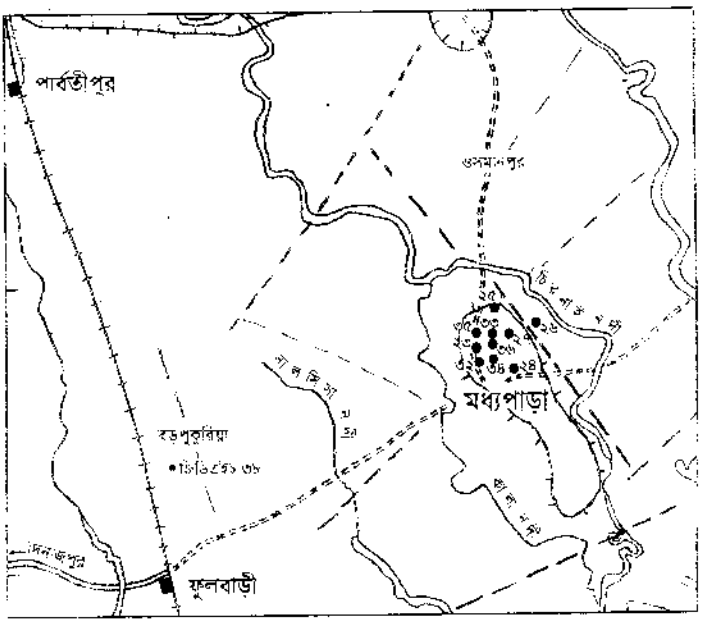

চিত্র ৬.১ ঃ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা মজুত এলাকা (সূত্র: রহমান ১৯৮৭)।

মিটার মাত্র। এর পূর্বাংশে উত্তর পশ্চিম-দক্ষিণ পূর্ব বরাবর একটি চ্যুতি তার সীমানা নির্ধারণ করে। এই চ্যুতি সীমানার পূর্বাংশে খননকৃত জিডিএইচ-২৬ (GDH 26) কূপে কেলাসিত কঠিন শিলার গভীরতা ৩২৬ মিটার এবং তা একটি গন্ডোয়ানা বেসিন এলাকা নির্দেশ করে (চিত্র ৬.১)। মধ্যপাড়া এলাকায় ফটো ভূতাত্ত্বিক জরিপে শনাক্ত আরো দুটি চ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যপাড়া কঠিন শিলার ভিতর পানির অবস্থান থেকে বোঝা যায় যে, এই শিলায় অন্তত উপরি অংশে যথেষ্ট ফাটল (fracture) বিদ্যমান যা আদি ছিদ্রহীন কেলাসিত শিলাতে প্রচুর ফাঁকা স্থানের (porous) সৃষ্টি করেছে। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনন প্রক্রিয়ায় এই পানি নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ একটি উল্লেযোগ্য অংশ হবে।

(খ) স্তরক্রমবিন্যাস ঃ মধ্যপাড়া এবং সংলগ্ন এলাকা ভূপৃষ্ঠে আধুনিক যুগের পলিমাটির আবরণে আবৃত। তাই এখানে ভূ-অভ্যন্তরে বিদ্যমান শিলাসমূহের বিন্যাস ও প্রকৃতি নির্ণয়ে খননকৃত কূপসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। ১৮ সারণিতে মধ্যপাড়া

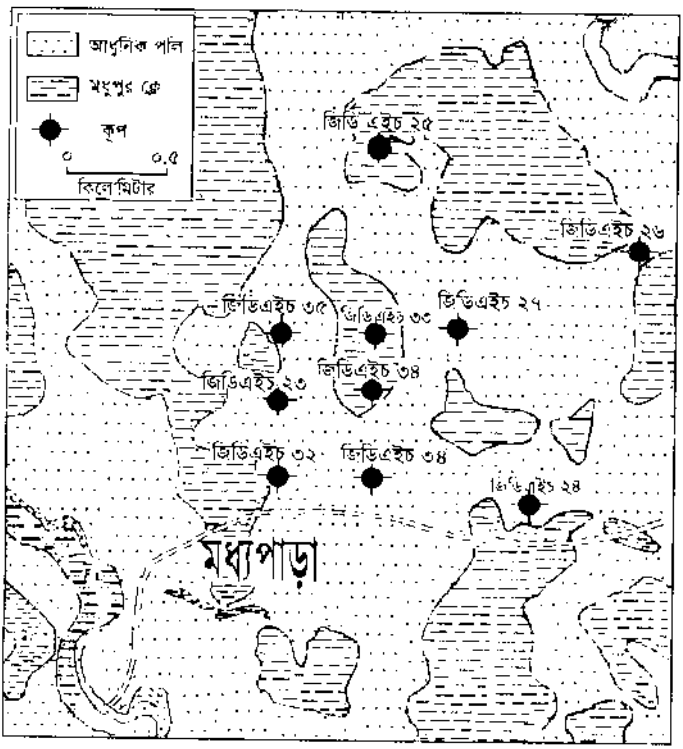

চিত্র ৬.২ ঃ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা মজুত এলাকার ভূতাত্ত্বিক ম্যাপ (সূত্র: রহমান ১৯৮৭)।

এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস এবং ৬.৩ চিত্রে এই এলাকায় একটি প্রস্থচ্ছেদ (cross section) দেখানো হয়েছে। উপরিউক্ত শিলা ক্রমবিন্যাসের সর্বনিম্নে কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত কঠিন শিলার ভিতের অবস্থান। এই ভিত শিলার উপরিভাগে ৩ থেকে ৩০ মিটার পুরুত্বের অংশবিশেষ আবহাওয়াজনিত ক্ষয় (weathering) প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে (রহমান ১৯৮৭)। এই পরিবর্তিত ভিত শিলার উপর বিরাট একটি অসংগতির ব্যবধানে মূলত নরম বেলেপাথর গঠিত ডুপিটিলা সংঘের অবস্থান। তার উপর কাদাশিলা গঠিত মধুপুর ক্লে সংঘ এবং সবার উপরে তথা ভূপৃষ্ঠে আধুনিক যুগের পলির আবরণ লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ৬.৩)।

সারণি ১৮ ঃ মধ্যপাড়া এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

যুগ/উপযুগ	সংঘ/দল (পুরুত্ব মিটারে))	শিলালক্ষণ
আধুনিক	পলিমাটি (০ থেকে ২)	বালুময় কাদা, কাদা
প্লেইসটোসিন	মধুপুর ক্লে সংঘ (৪ থেকে ১৮)	লালচে বাদামি কাদা, বালুময় কাদা
প্লায়োসিন	ডুপিটিলা সংঘ (৯৫ থেকে ১৪০)	নরম বেলে পাথর, কিছু কাদাশিলা ও নুড়ি
প্রাক-ক্যামব্রিয়ান	আগ্নেয় ও রূপান্তরিত কেলাসিত ভিত শিলা	নাইস, গ্রানোডায়োরাইট, কোয়ার্টজ ডায়োরাইট

অপরিবর্তিত কঠিন ভিত শিলা (Unweathered basement rock) ঃ মধ্যপাড়া এলাকায় কঠিন ভিত শিলার ন্যূনতম গভীরতা ১২৮ মিটার উল্লেখ করা হলেও বস্তুত অপরিবর্তিত কঠিন শিলার উপরিভাগের ন্যূনতম গভীরতা কূপভেদে ১৩৬ মিটার থেকে ১৬০ মিটার। এই কঠিন শিলা মূলত নাইস, গ্রানোডায়োরাইট এবং কোয়ার্টজ ডায়োরাইট দিয়ে গঠিত (রহমান ১৯৮৭)। কোনো কোনো স্থানে অবশ্য পেগমাটাইট (pegmatite) এবং কোয়ার্টজ শিরা (quartz vein) লক্ষ্য করা যায়। আজ অবধি কঠিন ভিত শিলার উপরিভাগ থেকে তার ভিতর প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত কূপ খনন করা হয়েছে এবং খননকৃত শিলার প্রকৃতির সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা গেছে। এই শিলার বয়স আর্কিয়ান (Archaean) বলে জানা যায়। নাইস সবুজাভ ধূসর বা হালকা ধূসর রঙের রূপান্তরিত শিলা যার মধ্যে মাঝে মাঝে সবুজ বা গোলাপি ব্যান্ড (band) লক্ষ্য করা যায়। এ শিলা মূলত ফেল্ডস্পার, কোয়ার্টজ, হর্নব্লেন্ড ও পাইরক্সিন খনিক দিয়ে গঠিত ও তাতে নিসিক বুনন (gneissic texture) লক্ষ্য করা যায়। গ্রানোডায়োরাইট ও কোয়ার্টজ ডায়োরাইট হালকা থেকে গাঢ় ধূসর রঙের, মধ্যম থেকে মোটা দানাদার কেলাসিত আগ্নেয় শিলা। উভয় শিলাই মূলত ফেল্ডস্পার, কোয়ার্টজ, হর্নব্লেন্ড ও পাইরক্সিন খনিক দিয়ে গঠিত এবং তা গ্রানাইট শিলার সমগোত্রীয় যদিও খনিক উপাদানসমূহের পারস্পরিক অনুপাতের বিভিন্নতায় তারা বৈশিষ্ট্যময়।

উপরিউক্ত কঠিন শিলাসমূহ ঘন, শক্ত ও আঁটসাঁট। গবেষণাগারে পরীক্ষায় নির্ণয় করা হয় যে, এই শিলাসমূহের আর কিউ ডি (RQD – Rock quality designation) গড়ে ৮০% এবং এদের এফ এস আই (FSI – Fracture spacing index) প্রতি ফুটে ০.১ থেকে ২ পর্যন্ত। উক্ত প্রকৌশলী গুণ এবং তাদের সাথে এগ্রিগেট ক্রাশিং স্ট্রেনথ্

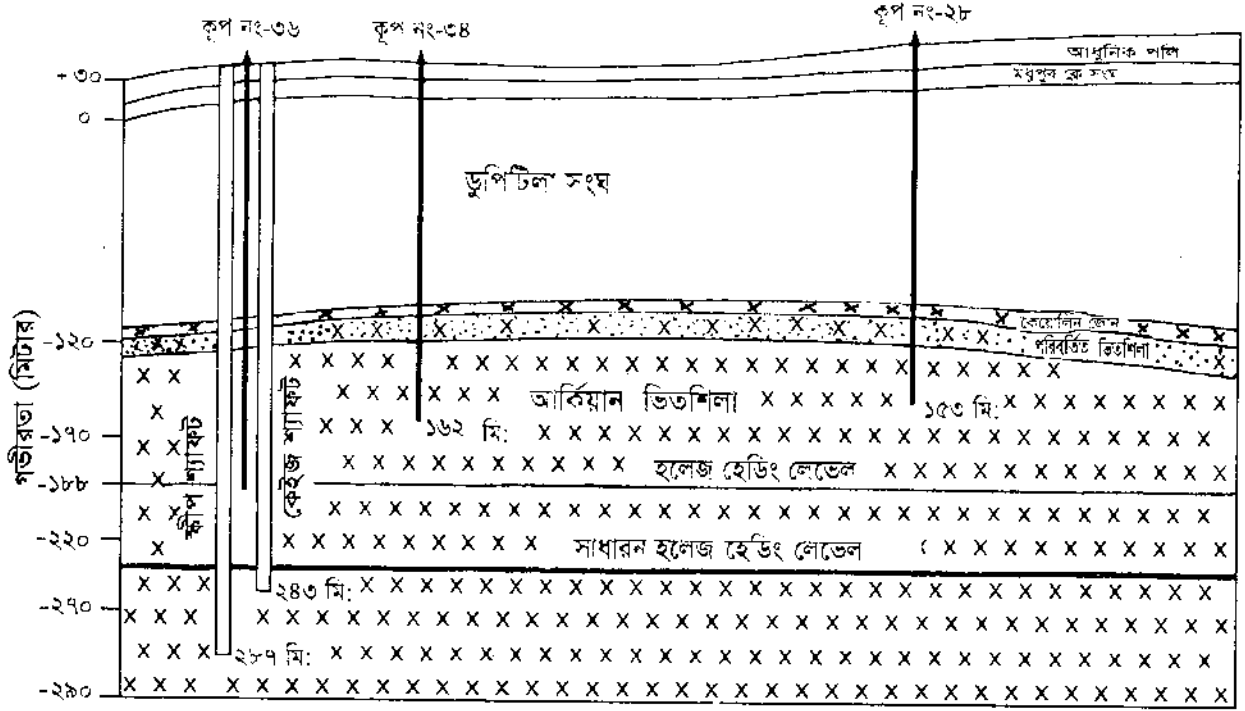

চিত্র ৬.৩ ঃ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা মজুত এলাকার ভূতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ (সূত্র: পেট্রোবাংলা ১৯৯৪)।

(Aggregate crushing strenth) এবং লস এনজেলস এব্রেশন টেস্ট (Los Angeles abration test) পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে এই কঠিন শিলা নির্মাণ শিলা হিসেবে উত্তম শ্রেণির (রহমান ১৯৮৭)।

পরিবর্তিত ভিত শিলা (Weathered basement rock) ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কেলাসিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপরে কিছু অংশ বিশেষ (৩ মিটার থেকে ৩০ মিটার পুরু) আবহাওয়া জনিত ক্ষয় (weathering) প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত ভিত শিলা অংশকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ নিচে পরিবর্তিত শিলা এবং উপরে কেয়োলিন ক্লে (kaolin clay) স্তর (চিত্র ৬.৩)। নিচের পরিবর্তিত শিলা অংশটি হালকা সবুজ বা ঘোলাটে সাদা রং এবং যথেষ্ট ফাটল যুক্ত এবং এখানে ফেল্ডস্পার, বায়োটাইট ও অন্যান্য মণিক উপাদানসমূহ পরিবর্তন দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। এর উপরাংশে কেয়োলিন ক্লে স্তরটি সাদা এবং তুলনামূলকভাবে হালকা ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। এই স্তরটির পুরুত্ব প্রায় ১ মিটার থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে এবং এটি মূলত কেয়োলিনাইট মণিক দিয়ে গঠিত যদিও এতে অল্প পরিমাণ সিলিকা, ক্লোরাইট ও অন্যান্য মণিকের সন্ধান পাওয়া যায়। কেয়োলিনাইট ক্লে স্তরটি ভূগর্ভে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এটি চীনামাটির একটি উল্লেখযোগ্য মজুত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

ডুপিটিলা সংঘ (Dupi Tila Formation) ঃ ভিত শিলার উপরে বিরাট অসংগতির ব্যবধানে মূলত বেলেপাথর স্তর দিয়ে গঠিত প্লায়োসিন উপযুগের ডুপিটিলা সংঘের অবস্থান। এই বেলেপাথর নরম, মধ্যম থেকে মোটা দানাদার এবং কখনও বা লৌহময় (ferruginous) উপাদানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ডুপিটিলা সংঘে বেলেপাথরের স্তরের সাথে কিছু কাদাশিলা ও পেবল্ স্তর (pebble bed) পাওয়া যায়। ডুপিটিলা সংঘের পুরুত্ব প্রায় ৯০ মিটার থেকে ১৪০ মিটার পর্যন্ত (সারণি ১৮)। এই সংঘটি মূলত নরম ফাঁকযুক্ত (porous) বেলেপাথরের হওয়ার ফলে তা একটি উত্তম পানির আধার বা একুউফার (aquifer) হিসেবে বিদ্যমান, তবে এর উপস্থিতি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খননের জন্য অসুবিধাজনক।

মধুপুর ক্লে সংঘ (Modhupur Clay Formation) ঃ ডুপিটিলা সংঘের উপর মূলত কাদাশিলা গঠিত প্লেইসটসিন মধুপুর ক্লে সংঘের অবস্থান। এই কাদাশিলা নরম, কিছুটা সিল্টযুক্ত ও লৌহময় উপাদান সংবলিত বিধায় লালচে রঙের। মধ্যপাড়া এলাকায় এর পুরুত্ব ৪ মিটার থেকে প্রায় ১৮ মিটার পর্যন্ত। কোনো কোনো স্থানে এই সংঘ ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত রয়েছে।

পলিমাটি (alluvium) ঃ মধ্যপাড়া এলাকায় ভূপৃষ্ঠে ০.৫ মিটার থেকে প্রায় ২ মিটার পুরু আধুনিক যুগের পলিমাটির আবরণ রয়েছে। এই পলিমাটি মূলত বালুময় কাদা এবং সিল্টময় কাদা দিয়ে গঠিত।

(গ) মধ্যপাড়া কঠিন শিলার মজুত ঃ মধ্যপাড়ায় ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলার উৎস প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলা এবং এই ভিত শিলা মহাদেশীয় ভূত্বকের (continental crust) উপরিভাগ মাত্র। বিশ্বের মহাদেশীয় ভূত্বকের গড় পুরুত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। সে হিসেবে মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার মজুত প্রায় অফুরন্ত। তবে বাস্তবিক পক্ষে মধ্যপাড়া খনি প্রকল্পটি তার এলাকা ও গভীরতার ক্ষেত্রে একটি সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে হিসেবে প্রথম পর্যায়ে মধ্যপাড়ায় ১.২২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং ১ কিলোমিটার প্রস্থ অর্থাৎ ১.২২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৬০ মিটার পুরুত্ব পর্যন্ত কঠিন শিলা খননের আওতায় ধরে মজুত হিসাব করা হয়েছে প্রায় ১৭২ মিলিয়ন টন। অবশ্য রুম এন্ড পিলার (room and pillar) পদ্ধতিতে খনন পরিকল্পনায় উপরিউক্ত মজুতের প্রায় ৪২% উত্তোলনযোগ্য, অর্থাৎ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে উত্তোলনযোগ্য কঠিন শিলার মজুত প্রায় ৭২ মিলিয়ন টন।

(ঘ) মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প ঃ ১৯৭৪-৭৫ সনে কূপ খননের মাধ্যমে মধ্যপাড়ায় অতি স্বল্প গভীরতায় কঠিন শিলার অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার পর বাংলাদেশ সরকার এই কঠিন শিলা খনন ও উত্তোলন প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে কানাডার একটি পরামর্শক ফার্ম এসএনসি (SNC অর্থাৎ Surveyor Nenniger and Chenvert) কে নিয়োগ করে। ১৯৭৭ সনে জরিপ শেষে উক্ত পরামর্শক এই প্রকল্প কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব ও লাভজনক হবে বলে মত প্রকাশ করে। ১৯৭৮ সনে বাংলাদেশ সরকার একটি ভূগর্ভস্থ খনি স্থাপন ও কঠিন শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প অনুমোদন করে।

১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ সরকার উপরিউক্ত প্রকল্পটিতে অর্থায়নের জন্য উত্তর কোরিয়া সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যাতে উত্তর কোরিয়া মধ্যপাড়া খনি প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান ও খনি স্থাপনে কারিগরি ব্যবস্থা সরবরাহ করতে রাজি হয়। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা এবং কোরিয়া সরকারের পক্ষে সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এর মধ্যে অনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী মোট ৬৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যপাড়া ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা প্রকল্পটির জন্য উত্তর কোরিয়া ৫২২ কোটি টাকা আর্থিক ঋণ দিতে এবং তাদের নিজস্ব কারিগরি ব্যবস্থাপনায় এই খনিটি স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে টার্ন কি (turn key) ভিত্তিতে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার ব্যাপারে সম্মত হয়।

মধ্যপাড়া ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা খনি এলাকার পরিসর হবে মোট ১.৪৪ বর্গ কিলোমিটার। রুম এন্ড পিলার এবং সাব লেভেল স্টোপিং (sub-level stoping) পদ্ধতিতে এই কঠিন শিলা খনন করা হবে। খনি স্থাপনের জন্য ২৪০ মিটার দূরত্বের

ব্যবধানে ৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট দুটি খাড়া মাইনিং শ্যাফট (mining shaft) নির্মাণ করা হবে। এদের একটি অর্থাৎ মালামাল যন্ত্রপাতি ও শ্রমিক পরিবহণের জন্য তৈরি কেইজ শ্যাফট (cage shaft) এর গভীরতা হবে ২৪৩ মিটার এবং অপরটি অর্থাৎ কঠিন শিলা পরিবহণ করবার জন্য তৈরি স্কিপ শ্যাফট (skip shaft) এর গভীরতা হবে ২৮৭ মিটার। এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু কঠিন ভিত শিলার উপর ১০০ মিটার থেকে ১৩০ মিটার পুরুত্বের নরম বেলেপাথর স্তরের ডুপিটিলা সংঘের অবস্থান, তাই এর মধ্য দিয়ে উপরিউক্ত খনন শ্যাফট নির্মাণের জন্য ব্যয়সাপেক্ষ বিশেষ পদ্ধতি তথা বরফীকরণ বা ফ্রিজিং পদ্ধতি (freezing technique) অবলম্বন করতে হবে। উপরিউক্ত খনন শ্যাফট দুটিকে মধ্যবর্তী স্থানে রেখে তার চার পাশে ১.৪৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূগর্ভস্থ খনন কাজ চালানো হবে। ভূপৃষ্ঠের নিচে ১৭০ মিটার থেকে ২৩০ মিটার গভীরতার মধ্যবর্তী স্থান থেকে কঠিন শিলা আহরণ করা হবে। এই লক্ষ্যে ১৭০ মিটার, ১৮৮ মিটার এবং ২৩০ মিটার গভীরতায় খাড়া খনন শ্যাফট থেকে সমতলে তৈরি তিনটি সুড়ঙ্গের মাধ্যমে কঠিন শিলা খনন ও উত্তোলন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

১৯৯৪ সনে মধ্যপাড়া ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা খনি প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সাড়ে ৬ বছর সময় লাগবে বলে ধরা হয়। অবশ্য কাজ শুরু হওয়ার চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯৮ সনে প্রাথমিক উৎপাদন শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন ৬০০ টন কঠিন শিলা উৎপাদন শুরু হওয়ার পর উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে। ২০০০ সালে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হলে প্রতিদিন ৪৫০০ টন অর্থাৎ প্রতি বৎসর ১৬.৫ লক্ষ টন কঠিন শিলা উৎপাদিত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে বলে ধরা হয়েছে। এই খনি প্রকল্প বাংলাদেশের কঠিন শিলার মোট চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম হবে। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পের আয়ু ৭০ বছর ধরা হয়েছে।

৬.২.২ ডোলাগঞ্জ-জাফলং এর কঠিন শিলার নুড়ি ঃ সিলেট জেলার উত্তর সীমান্ত বরাবর অধিকাংশ নদী উৎসরে ভারতের মেঘালয় প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণে বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করেছে। এই সমস্ত নদী মেঘালয়ে পাহাড়ি এলাকায় শিলং শিল্ড এর কেলাসিত কঠিন শিলা ক্ষয় ও চূর্ণ করে এনে বাংলাদেশের ভিতর পাহাড়ের পাদদেশে এবং নদীবক্ষে কঠিন শিলার নুড়ির (gravel) মজুত সৃষ্টি করেছে। এই নুড়িসমূহ গ্রানাইট, কোয়ার্টজাইট, নাইস ইত্যাদি নানা প্রকার শিলা দিয়ে গঠিত যা মেঘালয় প্রদেশের কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত ভিত শিলারই ক্ষয়প্রাপ্ত ও চূর্ণীভূত খণ্ড মাত্র। সাধারণত ৫ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিটার পর্যন্ত ব্যাসের মূলত গোলাকার এই নুড়িসমূহ নদীবক্ষে এবং তার নিচে প্রায় ৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত পাওয়া যায়। নদীবক্ষ এবং তার নিচ থেকে খননকৃত এই কঠিন শিলার নুড়িসমূহ

সাধারণভাবে উত্তোলন করে সরবরাহ করা হয়। বর্ষাকালে ঢাল ও স্রোতের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সাথে উত্তরে পাহাড়ি এলাকা থেকে নুড়ি বাহিত হয়ে এসে পুনরায় নদীবক্ষে জমা হয়। সিলেট জেলায় এ ধরনের কঠিন শিলা নুড়ির মজুত ও নুড়ি সরবরাহকারী স্থানসমূহের মধ্যে ভোলাগঞ্জ, জাফলং এবং শ্রীপুর অন্যতম।

(ক) ভোলাগঞ্জ ঃ ভোলাগঞ্জ সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরে মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। এই স্থানে মেঘালয় পাহাড়ি এলাকা থেকে আগত ঢালাই নদী বাংলাদেশের পাদদেশীয় সমতল বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে (চিত্র ৬.৪)। এখানে কঠিন শিলার নুড়ির মূল মজুতটি ঢালাই নদীর বক্ষ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে যদিও সংলগ্ন পাদদেশীয় সমভূমিতেও বালুর সাথে মিশ্রিত অবস্থায় নুড়ির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ভোলাগঞ্জ এলাকায় ঢালাই নদীবক্ষে উত্তর অংশে নুড়িসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার অর্থাৎ এখানে নুড়িসমূহের প্রায় ৪০% বোল্ডার (boulder) এবং ৫৫% ভাগ কোবল (cobble) এবং পেবল (pebble)। কিন্তু দক্ষিণে নুড়িসমূহের ৫% বোল্ডার এবং ৭০% কোবল ও পেবল। আরও দক্ষিণে নদীবক্ষ মূলত বালি দিয়ে পরিপূর্ণ মাত্র। নুড়িসমূহের মধ্যে কোয়ার্টজাইট সর্বাধিক লক্ষণীয় এবং এ ছাড়াও গ্রানাইট, নাইস, বাসল্ট শিলা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সাধারণভাবে নদী পৃষ্ঠের ৩ থেকে ৫ মিটার গভীর পর্যন্ত এই নুড়ির অবস্থান লক্ষ্য করা ও উত্তোলন হলেও ঢালাই নদীতে খননকৃত দুটি কূপে নদী পৃষ্ঠের ১১ মিটার গভীর পর্যন্ত নুড়ি পাথর লক্ষ্য করা গেছে (রহমান ও মনোয়ার ১৯৮৮)।

সিলেট অঞ্চলে ভোলাগঞ্জের কঠিন শিলার নুড়ির মজুতই সর্ববৃহৎ এবং তা সিলেট এলাকা থেকে প্রাপ্ত নুড়ির প্রায় ৬০% সরবরাহ করে থাকে। এখানে ঢালাই নদীর বক্ষ জুড়ে প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন ঘন মিটার কঠিন শিলার নুড়ি মজুত রয়েছে বলে হিসাব করা হয় (সারণি ১৯)। ভোলাগঞ্জ থেকে প্রতি বছর প্রায় ০.৪ মিলিয়ন ঘনমিটার পরিমাণ কঠিন শিলা নুড়ি উত্তোলন ও সরবরাহ করা হয়। এক হিসাব অনুযায়ী বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি হলে প্রতি বছর প্রায় ০.৩ মিলিয়ন ঘন মিটার নুড়ি পাথর পুনরায় মেঘালয় পাহাড়ি উৎস এলাকা থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এসে এখানে জমা হয়।

(খ) জাফলং ঃ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা থেকে আগত ডাউকী নদী সিলেটের তামাবিল সীমান্ত ফাঁড়ির সন্নিকটে জাফলং এলাকায় বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করেছে। ভোলাগঞ্জের ঢালাই নদীর মতোই ডাউকী নদীবক্ষেও একই পদ্ধতিতে মেঘালয় থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বাহিত হয়ে কঠিন শিলার নুড়ি এসে জমা হয়েছে। এখানে নদীবক্ষের নিচে ৩ মিটার বা তার বেশি গভীরতা পর্যন্ত নুড়ির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই নুড়িসমূহ মূলত গ্রানাইট, কোয়ার্টজাইট, নাইস ইত্যাদি শিলার তৈরি এবং আকারে ও আকৃতিতে তা ভোলাগঞ্জের নুড়ির মতোই। এখানেও নদীবক্ষ এবং নদীবক্ষের নিচ

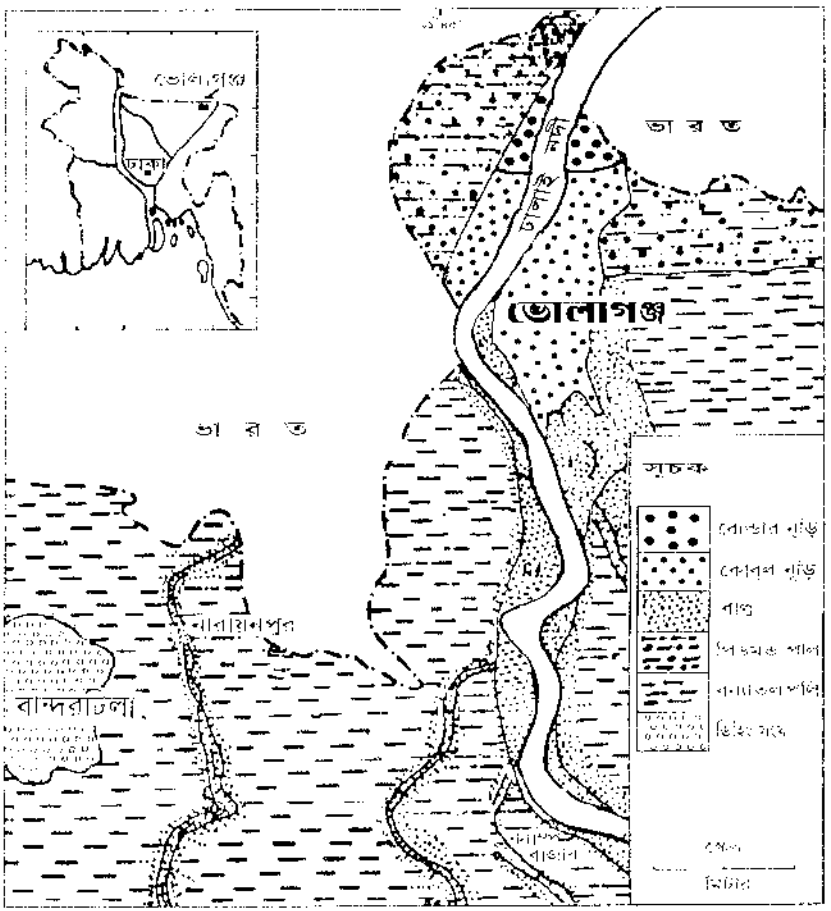

চিত্র ৬.৪ ঃ সিলেটের ভোলাগঞ্জে কঠিন শিলা নুড়ির মজুত এলাকা (সূত্র: রহমান ও মনোয়ার ১৯৮৮)।

থেকে খনন করে নুড়ি উত্তোলন ও সরবরাহ করা হয়। জাফলং এ নুড়ি পাথরের মজুত ১.৩ মিলিয়ন ঘনমিটার বলে হিসেব করা হয়েছে (সারণি-১৯)। জাফলং কঠিন শিলা নুড়ি মজুত থেকে প্রতি বছর প্রায় ০.২ মিলিয়ন ঘনমিটার নুড়ি উত্তোলন করা হয়।

সারণি ১৯ ঃ বাংলাদেশে কঠিন শিলা নুড়ির মজুত (সূত্র: নিপ্পন কোই কনসালটেন্ট লি: ১৯৯১)।

স্থান	মজুত (মিলিয়ন ঘনমিটার)	শতকরা অংশ
ভোলাগঞ্জ (সিলেট জেলা)	৩.৩	২৯
জাফলং (সিলেট জেলা)	১.৩	১১
অন্যান্য (সিলেট জেলা)	২	১৮
পঞ্চগড় তেতুলিয়া (পঞ্চগড় জেলা)	২.৫	২২
পাটগ্রাম-ডালিয়া-ডোমার (নীলফামারী জেলা)	০.৯	৮
চট্টগ্রাম- পার্বত্য চট্টগ্রাম	১.৩	১২
মোট	১১.৩	১০০%

জাফলং ছাড়াও সিলেটে আরও কয়েকটি স্থানে (যেমন শ্রীপুর) মেঘালয় থেকে আগত নদীসমূহ বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করে কঠিন শিলার মজুত সৃষ্টি করেছে। এক হিসাব অনুযায়ী সিলেটে এ ধরনের অন্যান্য স্থানে নুড়ি পাথরের মোট মজুত প্রায় ১.৫ মিলিয়ন থেকে ২ মিলিয়ন ঘনমিটার (সারণি ১৯)।

৬.২.৩ তেতুলিয়া-পঞ্চগড়-পাটগ্রামের কঠিন শিলার নুড়িস্তর ঃ বাংলাদেশের সব-উত্তর অংশ তথা পঞ্চগড়-নীলফামারী-লালমনিরহাট জেলাসমূহের (পূর্বে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত) উত্তর সীমানা অঞ্চল হিমালয় পর্বতের পাদদেশীয় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকা মূলত পাদদেশীয় পলি (piedmont alluvium) তথা মোটা দানাদার বালু ও নুড়িস্তর (gravel bed) দিয়ে গঠিত। এখানে পশ্চিমে তেতুলিয়া-পঞ্চগড় থেকে পূর্বে পাটগ্রাম-ডালিয়া-ডোমার বরাবর বিরাট এলাকা জুড়ে ভূপৃষ্ঠের অতি স্বল্প গভীরতায় বালু মিশ্রিত নুড়িস্তর (sandy gravel bed) বিদ্যমান।

এই নুড়িস্তরের গভীরতা ভূপৃষ্ঠ থেকে সর্বনিম্ন অর্ধ মিটার থেকে কোনো কোনো স্থানে ৫ মিটার বা তার বেশি। নুড়িস্তরের পুরুত্ব স্থানভেদে কয়েক মিটার থেকে ১০ মিটারের বেশি যা মধ্যবর্তী বালুস্তরের সাথে স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই নুড়ি-

সমূহের ব্যাস সাধারণভাবে ২ সেন্টিমিটার থেকে ১৫ সেন্টিমিটার এবং তা মূলত পেব্‌ল্ এবং কোব্‌ল্ শ্রেণির নুড়ি। এখানে বৃহৎ আকারের বোল্ডার নুড়ি অতি অল্প বা অনুপস্থিত। এই নুড়িসমূহ মূলত কোয়ার্টজইট, গ্রানাইট, নাইস এবং সিস্ট (schist) দিয়ে তৈরি এবং তা সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার বা লম্বাটে আকারের হয়ে থাকে। এই নুড়ি মোটা দানাদার বালির সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় (রায় ১৯৬৪)।

তেতুলিয়া - পঞ্চগড় এলাকায় নুড়ি পাথরের মজুত প্রায় ২.৫ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং পাটগ্রাম-ডালিয়া-ডোমার এলাকার নুড়ি পাথরের মজুত প্রায় ০.৯ মিলিয়ন ঘনমিটার বলে হিসেব করা হয়েছে (সারণি ১৯)। অবশ্য অপর এক হিসেবে তেতুলিয়া-পঞ্চগড় এলাকার নুড়িপাথরের মজুত অনেক বেশি তথা ১০ মিলিয়ন ঘনমিটার দেখানো হয়েছে (নিপ্পন কোই ও বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক: ১৯৯০)। উপরিউক্ত স্থানসমূহে স্থানীয়ভাবে খননের মাধ্যমে এই নুড়ি উত্তোলন করা হয়। তেতুলিয়া-পঞ্চগড় এলাকা থেকে বছরে প্রায় ৪৪ হাজার ঘনমিটার নুড়ি এবং পাটগ্রাম - ডালিয়া এলাকা থেকে বছরে প্রায় ৪৫ হাজার ঘন মিটার নুড়ি পাথর উত্তোলন ও সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৬.২.৪ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কনক্রিশন নুড়ি ঃ সাধারণত কঠিন শিলা আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শ্রেণিভুক্ত শিলা হয়ে থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাললিক শিলাস্তরেও অংশ বিশেষ কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বেলেপাথরের শিলাস্তরের মধ্যে বিদ্যমান চুনময় পিণ্ড বা ক্যালকেরিয়াস কনক্রিশন (calcareous concretion) কঠিন শিলা হিসেবে উৎকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয়। বস্তুত এই ক্যালকেরিয়াস কনক্রিশন নুড়িসমূহ বেলেপাথরেরই অংশ, তবে ভূগর্ভে অবস্থানকালে এর ভিতর ক্যালসাইট সিমেন্টের (calcite cement) ঘন সমাবেশ ঘটার কারণে তা পার্শ্ববর্তী নরম বেলেপাথরের তুলনায় বহু গুণে শক্ত রূপ ধারণ করে। এভাবে একটি গোলাকার পিণ্ড জন্ম নেয় যা সাধারণত ০.৫ মিটার থেকে ১ মিটার পর্যন্ত ব্যাসধারী গোলাকার আকৃতির যেমন বৃত্তাকার, ডিম্বাকার, উপবৃত্তাকার শক্ত পিণ্ড হিসেবে বেলেপাথরের স্তরে বিরাজ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহে এ ধরনের ক্যালকেরিয়াস কনক্রিশন নুড়ির বিরাট মজুত পাওয়া যায়। এ এলাকায় মায়োসিন উপযুগের ভুবন সংঘ এবং বোকাবিল সংঘের বেলেপাথরের স্তরসমূহে বিক্ষিপ্তভাবে এই ক্যালকেরিয়াস কনক্রিশন অবস্থান করে। বহু যুগের ক্ষয় প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত নরম বেলেপাথরে ক্ষয় হয়ে বিদূরিত হলেও এই কনক্রিশনসমূহ অক্ষত অবস্থায় রয়ে যায় এবং পাহাড়ি ছড়া বক্ষে (stream bed) জমা হয়ে বিরাট মজুত সৃষ্টি করে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উর্ধ্বভঙ্গ যুক্ত ৬ টি পাহাড়ি এলাকায় এক ভূতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে মূলত পাহাড়ি ছড়া বক্ষে অবস্থিত কনক্রিশন

নুড়ির মজুত নির্ণয় করা হয় (পার্থমার্ক এসোসিয়েট ১৯৯১)। প্রায় ৬০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যাপী সম্পাদিত এই জরিপ কাজের হিসেব অনুযায়ী লামা-আলীকদম এলাকায় প্রায় ০.৯২ মিলিয়ন ঘনমিটার, টেকনাফ-উখিয়া এলাকায় ০.২৫ মিলিয়ন ঘনমিটার, বান্দরবন এলাকায় ০.০৬৪ মিলিয়ন ঘনমিটার, সীতাকুন্ড-মিরসরাই এলাকায় প্রায় ০.০২৯ মিলিয়ন ঘনমিটার, নাইখংছড়ি এলাকায় ০.০১৫ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং রাজস্থলী এলাকায় ০.০১১ মিলিয়ন ঘনমিটার কনক্রিশন নুড়ির মজুত রয়েছে। অর্থাৎ উপরিউক্ত এলাকাসমূহে কনক্রিশন নুড়ির মোট মজুত প্রায় ১.২৯ মিলিয়ন ঘনমিটার।

সপ্তম অধ্যায়

সৈকত বালি ভারি মণিক

(Beach Sand Heavy Mineral)

৭.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি উৎপত্তি

বালির ভারি মণিক হলো সাধারণ মণিকের তুলনায় বেশি ঘনত্বপূর্ণ মণিক যা বেশি ঘনত্বের কারণে ভারি তরল ব্রোমোফর্ম (আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯) মাধ্যমে বালি থেকে তলানিরূপে আলাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ ভারি মণিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯ এর বেশি। অপরপক্ষে বালির প্রধান মণিক উপাদানসমূহ যেমন কোয়ার্টজ, ফেল্‌সপার ইত্যাদি কম ঘনত্বের কারণে ভারি তরল ব্রোমোফর্ম মাধ্যমে ভাসমান অবস্থায় থাকে বলে তাদেরকে হালকা মণিক (light mineral) বলা হয়। সাধারণভাবে বালির ভিতর খুব অল্প পরিমাণ ভারি মণিক থাকলেও কোনো কোনো ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় ভারি মণিকসমূহ আলাদা হয়ে ঘন সমাবেশে একত্র হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভারি মণিকের সমাবেশ ও মজুতকে ভারি মণিক প্লেসার (heavy mineral placer) নামে অভিহিত করা হয়।

বালির ভারি মণিক প্লেসারসমূহ পৃথিবীর অনেক স্থানে অর্থকরী মজুত সৃষ্টি করেছে এবং তা থেকে মূল্যবান ভারি মণিকসমূহ আহরিত হচ্ছে। এ সমস্ত মূল্যবান ভারি মণিকের মধ্যে ইলমেনাইট (ilmenite), ম্যাগনেটাইট (magnetite), রুটাইল (rutile), জিরকন (zircon), গারনেট (garnet), মোনাজাইট (monazite), সোনা (gold), হীরা (diamond), কোরানডাম (corrundum) ইত্যাদি অন্যতম। ২০ সারণিতে কিছু সংখ্যক মূল্যবান ভারি মণিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব, রাসায়নিক উপাদান ও ব্যবহার সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৭.১.১ ভারি মণিক প্লেসার ঃ ভূত্বকের শিলা আদি অবস্থা থেকে ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূর্ণীভূত হয়ে বালিকণা সৃষ্টি করে এবং পানি প্রবাহ তথা নদী ও সাগরের স্রোত দিয়ে বাহিত হয়ে নানা স্থানে অবক্ষেপণের (sedimentation) মাধ্যমে জমা হয়ে থাকে। এই পরিবহণ ও অবক্ষেপণ চলাকালে কোনো কোনো স্থানে ঢেউ ও স্রোতের ক্রমাগত প্রভাবে বালি কণাসমূহ তাদের ঘনত্ব অনুযায়ী বাছাই (sorting) ও আলাদা হয়ে একীভূত হতে পারে। বিশেষ করে সমুদ্র সৈকত বরাবর সামুদ্রিক স্রোত ও ঢেউ বহু সময় ধরে সৈকত বালির উপর এ ধরনের ক্রিয়া চালালে ভারি মণিকসমূহ হালকা মণিকসমূহ থেকে আলাদা হয়ে কোনো কোনো স্থানে ছোট বড় বিস্তৃতির ঘন সমাবেশ ঘটাতে পারে। ভারি মণিকসমূহের এই ধরনের ঘন সমাবেশকে প্লেসার মজুত (placer deposit)

বলা হয়। ভারি মণিকসমূহের এক বড় অংশ কালো রঙের হওয়ায় এই প্লেসারসমূহ সাধারণত কালো আকারে বিরাজ করে এবং এদেরকে কালো বালু (black sand) নামেও অভিহিত করা হয়।

সারণি ২০ ঃ কয়েকটি মূল্যবান ভারি মণিক পরিচিতি।

ভারি মণিক	রাসায়নিক সংকেত	আপেক্ষিক গুরুত্ব	প্রধান ব্যবহার
ইলমেনাইট	$FeTiO_3$	৪.৭২	রং শিল্পের উপাদান TiO_2 এর উৎস হিসেবে; ওয়েল্ডিং রড তৈরিতে; বিভিন্ন টাইটেনিয়াম লবণ ও সংকর তৈরিতে।
ম্যাগনেটাইট	Fe_2O_3	৫.১৮	লোহার প্রধান উৎস হিসেবে; নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর, এক্সরে-মেশিন যন্ত্রে রেডিয়েশন শিল্ডিং ব্লক তৈরিতে
রুটাইল	TiO_2	৪.২-৪.২৫	রং শিল্পে অন্যতম উপাদান TiO উৎস হিসেবে; ওয়েল্ডিং রড তৈরিতে, Ti ধাতুর উৎস হিসেবে
লিউকক্সিন			রুটাইলের বিকল্প হিসেবে
গারনেট	$X_3Y_2(SiO_4)_3$ X=Ca,Mg,Fe,Mn Y=Al,Fe,Cr	৩.৬ -৪.৩	সিরিশ কাগজ ও কাপড় তৈরিতে
জিরকন	$ZrSiO_4$	৪.৬ -৪.৭	ধাতব ঢালাই কাজে, জিরকনিয়াম ধাতুর উৎস হিসেবে
মোনাজাইট	$(Ce,La,Y,Th)PO_4$	৪.৬ -৫.৪	রেয়ার আর্থ ও থোরিয়াম ধাতুর উৎস হিসেবে
কায়ানাইট	Al_2SiO_5	৩.৬৫-৩.৬৯	অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর উৎস হিসেবে, সিরামিক শিল্পে

বিশ্বের বহু স্থানে বালুময় সমুদ্র সৈকত বরাবর এ ধরনের ভারি মণিকের প্লেসার অর্থকরী মজুতের সৃষ্টি করেছে এবং সেখান থেকে মূল্যবান ভারি মণিকসমূহ আহরিত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকূল বরাবর অনেক স্থানে ভারি মণিক প্লেসারের বিরাট মজুত পাওয়া যায়। সেদেশে তুগুম সমুদ্র সৈকতের প্লেসার বালিতে ৪২% জিরকন, ৩২% রুটাইল, ও ২৫% ইলমেনাইট পাওয়া যায়। শ্রীলঙ্কায় কোনো কোনো স্থানে সৈকত বালিতে ৭৫% থেকে ৮০% ইলমেনাইট, ৬% থেকে ১০% জিরকন, ৬% থেকে ৭% রিউটাইল ও ২% থেকে ৩% ম্যাগনেটাইট রয়েছে। ভারতের পশ্চিম, দক্ষিণ এবং

পূর্ব উপকূল বরাবর একাধিক স্থানে প্লেসারসমূহ ইলমেনাইট, মোনাজাইট, ম্যাগনেটাইট, রুটাইল ইত্যাদি মূল্যবান মণিকের উল্লেখযোগ্য মজুত সৃষ্টি করেছে। উপরিউক্ত দেশসমূহসহ বিশ্বের অনেক দেশেই প্লেসার মজুতসমূহ থেকে অর্থনৈতিক লাভজনকভাবে মূল্যবান ভারি মণিকসমূহ আহরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার সমুদ্র সৈকত ও উপকূলবর্তী দ্বীপ বরাবর বেশ কয়েকটি স্থানে ভারি মণিক প্লেসারের উল্লেখযোগ্য মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে।

৭.২ বাংলাদেশের সৈকত বালির ভারি মণিক প্লেসার

১৯৬১ সনে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে তেজস্ক্রিয় মণিকের (radioactive mineral) সন্ধান কালে সেখানে সৈকত বালিতে একাধিক মূল্যবান ভারি মণিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৭-৬৯ সময়ে তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশন কক্সবাজার-টেকনাফ সৈকত বরাবর এবং চট্টগ্রাম উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে ভারি মণিক বালির জন্য অনুসন্ধান চালালে বেশ কয়েকটি স্থানে মূল্যবান ভারি মণিক প্লেসারের সন্ধান পায়। উক্ত সৈকত বালির ভারি মণিকসমূহ আহরণ, আলাদাকরণ এবং তার বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সনে কক্সবাজারে অস্ট্রেলীয় সরকারের সহযোগিতায় একটি পাইলট প্লান্ট স্থাপন করা হয়। এই প্লান্টে অস্ট্রেলিয়ান মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি (AMDEL) এর পরামর্শ অনুযায়ী গৃহীত ফ্লো শীট (flow sheet) অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে ভারি মণিকসমূহ আলাদা করার কাজ শুরু হয়। ১৯৮৫ সন নাগাদ বাংলাদেশের ৫৫০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল বরাবর ভারি মণিক প্লেসার মজুতের সন্ধানে প্রাথমিক এবং কোনো কোনো স্থানে বিস্তারিত অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন হয়। উপরিউক্ত জরিপের ফলে আজ অবধি বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূল বরাবর বেশ কয়েকটি স্থানে উল্লেখযোগ্য ভারি মণিক প্লেসার মজুতের আবিষ্কার ঘটে। এই মজুতসমূহ মূলত চট্টগ্রাম জেলা ও কক্সবাজার জেলার সমুদ্র সৈকত বরাবর অবস্থিত।

৭.২.১ ভারি মণিক প্লেসারসমূহের অবস্থান ও প্রকৃতি ঃ অদ্যাবধি বাংলাদেশের পূর্ব এবং দক্ষিণ উপকূল বরাবর মোট ১৭টি ভারি মণিক প্লেসার মজুতের আবিষ্কার ঘটে যার ১৫টি কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র সৈকত ও উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে অবস্থিত। বস্তুত এই ১৭ টি মজুতের মধ্যে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বরাবর ৭ টি (যথা কক্সবাজার, ইনানী, শিলখালী, টেকনাফ সাবরাং ও বদরমোকাম), মহেশখালী দ্বীপে ৭টি, মাতারবারী দ্বীপে ১ টি, কুতুবদিয়া দ্বীপে ১টি এবং দক্ষিণ উপকূলে নিঝুম দ্বীপে ১টি ও কুয়াকাটায় ১টি মজুত অবস্থিত (চিত্র ৭.১)।

উপরিউক্ত ভারি মণিক প্লেসার মজুতে যে সমস্ত মূল্যবান অর্থকরী মণিক পাওয়া যায়, সেগুলো হলো ইলমেনাইট (ilmenite), ম্যাগনেটাইট (magnetite), রুটাইল

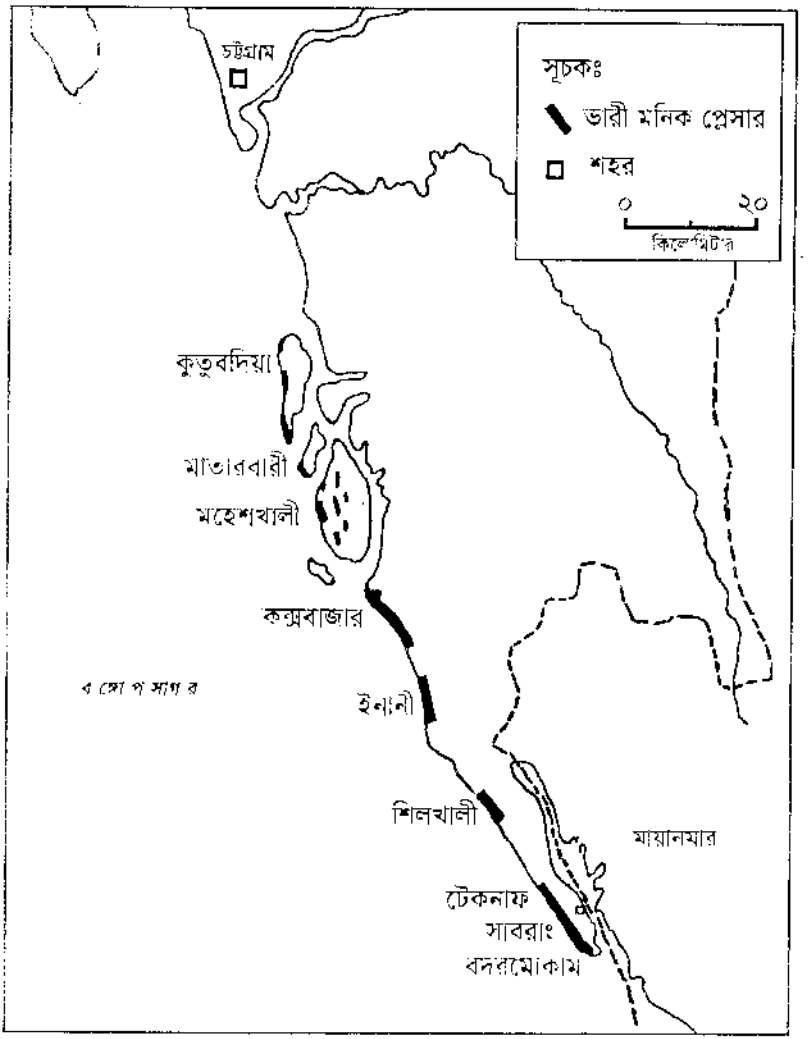

চিত্র ৭.১ ঃ কক্সবাজার জেলায় ভারি মণিক সৈকতবালি প্লেসারসমূহের অবস্থান (সূত্র: বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ১৯৯১)।

(rutile), জিরকন (zircon), লিওকক্সিন (leucoxene), মোনাজাইট (monazite), কায়ানাইট (kyanite) ও গারনেট (garnet)।

ভারি মণিক প্লেসারসমূহ আধুনিক যুগের সৈকত বালির (Recent beach sand) মধ্যে পাওয়া যায়। এই প্লেসারসমূহ সাধারণত সমুদ্র সৈকত রেখা (shore line) থেকে মূল ভূখণ্ডের দিকে ১ থেকে ৩ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করে। প্লেসার মজুতসমূহ সাধারণত লম্বায় ১৫০ মিটার থেকে ৩০০ মিটার, চওড়ায় ১৫ মিটার থেকে ৩০ মিটার এবং পুরুত্বে ১ মিটার থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সমস্ত প্লেসার মজুতসমূহ ভূপৃষ্ঠে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩ থেকে ৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অবস্থান করে। এই মজুত এলাকাসমূহ সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে ২ বা ৩ মিটার উচ্চতা লাভ করে এবং এগুলো স্থায়ী মজুত হিসাবে বিবেচিত হয় (বিশ্বাস ১৯৮৩, ১৯৮৬)। পক্ষান্তরে সমুদ্র সৈকত রেখার সন্নিকটে সৈকত বালির উপরিভাগে অনেক সময় ক্ষুদ্রাকারে মূলত বায়ু প্রবাহের ক্রিয়ায় ভারি মণিকের সাময়িক মজুত সৃষ্টি হয়। কালো বালির এলাকা হিসেবে দৃশ্যমান এই অস্থায়ী ভারি মণিকের সমাবেশ কোনো উল্লেখযোগ্য মজুত সৃষ্টি করে না বরং কেবল বছরের ব্যবধানে তা বায়ু তাড়িত হয়ে অন্যত্র সরে যায়।

প্লেসার মজুতসমূহ মূলত মিহি এবং অতিমিহি দানাদার বালিকণা (fine to very fine sand) দিয়ে গঠিত (মিত্র ও অন্যান্য ১৯৯০)। সাধারণত ইলমেনাইট, গারনেট ও রুটাইল বালি কণার তুলনায় জিরকন, ম্যাগনেটাইট এবং মোনাজাইট বালি কণাসমূহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। প্লেসার মজুত বালিসমূহ ধূসর, বাদামি এবং কখনও বা কালো রং ধারণ করে।

এই প্লেসার মজুতসমূহে ভারি মণিকের পরিমাণ গড়ে ২৩% যদিও স্থানভেদে তা সর্বনিম্ন ৭% থেকে সর্বোচ্চ ৪২% পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় (সারণি ২১)। প্লেসার বালিতে প্রতিটি মূল্যবান ভারি মণিকসমূহের পরিমাণও স্থানভেদে ভিন্ন এবং এতে গড়ে প্রায় ২৬% ইলমেনাইট, প্রায় ৬% গারনেট, প্রায় ৪% জিরকন, প্রায় ২% রিউটাইল, প্রায় ২% লিউকক্সিন, প্রায় ৪% কায়ানাইট, প্রায় ২% ম্যাগনেটাইট এবং প্রায় ০.৩১% মোনাজাইট লক্ষ্য করা যায় (সারণি ২২)।

৭.২.২ ভারি মণিকসমূহের মজুত ঃ বাংলাদেশের সৈকত বালি প্লেসারসমূহের প্রতিটির জন্য ভারি মণিকসমূহের মজুত নির্ণয় করা হয়েছে। আবিষ্কৃত ১৭টি প্লেসার মজুতে মোট কাচাবালির (crude sand) পরিমাণ প্রায় ২০.৫ মিলিয়ন টন এবং এর ভিতর মোট ভারি মণিকের পরিমাণ প্রায় ৪.৩৫ মিলিয়ন টন বলে হিসেব করা হয়েছে। এই মোট ভারি মণিকের মধ্যে মূল্যবান অর্থকরী ভারি মণিক (economic heavy mineral) তথা ইলমেনাইট, গারনেট, জিরকন, লিউকক্সিন, কায়ানাইট,

ম্যাগনেটাইট, রুটাইল এবং মোনাজাইটের মোট মজুত রয়েছে প্রায় ১.৭৬ মিলিয়ন টন (সারণি ২৩)।

সারণি ২১ ঃ বাংলাদেশে প্লেসারসমূহে মোট ভারি মণিকের শতকরা ভাগ
(সূত্র: বিশ্বাস ১৯৮৬)

স্থান	প্লেসারসমূহে মোট ভারি মণিকের শতকরা ভাগ
কক্সবাজার	১৮%
ইনানী	২৪%
শিলখালী	১৭%
টেকনাফ	২২%
সাবরাং	১৯%
বদরমোকাম	২৩%
মহেশখালী দ্বীপ	৭% থেকে ৪২%
মাতারবারী দ্বীপ	২২%
কুতুবদীয়া দ্বীপ	২৯%
নিঝুম দ্বীপ	২৫%
কুয়াকাটা	২৮%
গড়ে বাংলাদেশে	২৩%

আবিষ্কৃত সৈকত বালি প্লেসারসমূহের মধ্যে স্থানভেদে ভারি মণিকের পরিমানের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। স্থানভিত্তিক মোট ভারি মণিকের মজুতের হিসাবে দেখা যায় যে, কক্সবাজার, মহেশখালী দ্বীপ ও কুয়াকাটায় ভারি মণিকের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি এবং এগুলোর পরেই শিলখালী, টেকনাফ ও বদরমোকামের স্থান (সারণি ২৪)। অবশ্য কুয়াকাটায় মোট ভারি মণিকের মজুত অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও তাতে উপরে উল্লেখিত অধিকাংশ মূল্যবান ভারি মণিকের অংশ বা শতকরা ভাগ তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ্য করা যায়।

ইলমেনাইট : বাংলাদেশে প্রাপ্ত মূল্যবান অর্থকরী ভারি মণিকসমূহের মধ্যে ইলমেনাইট সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে। সৈকত বালি প্লেসারসমূহে এই

মণিকের পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৪৬% (মহেশখালী সৈকত) এবং সর্বনিম্ন প্রায় ৯%(কুয়াকাটা) এবং গড়ে প্রায় ২৬%। বাংলাদেশে প্লেসারসমূহে ইলমেনাইটের মোট মজুত প্রায় ১,০২৫ হাজার টন (সারণি ২৩)। ২৪ সারণিতে বাংলাদেশে ইলমেনাইটের স্থানভিত্তিক মজুত দেখানো হয়েছে। এই হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ইলমেনাইটের সর্বাপেক্ষা বেশি মজুত পাওয়া যায় কক্সবাজার, শিলখালী, টেকনাফ এবং মহেশখালী দ্বীপে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ইলমেনাইটের একটি বিশেষত্ব হলো যে, এই ইলমেনাইটের সাথে হেমাটাইট (hematite) এবং ম্যাগনেটাইট (magnetite) এর ইন্টারগ্রোথ (intergrowth) লক্ষ্য করা যায় যা এই মণিকের ব্যবহারিক মূল্য কিছুটা কমিয়ে দেয় (আহমেদ ও অন্যান্য ১৯৯২)।

সারণি ২২ : বাংলাদেশে প্লেসারসমূহে বিভিন্ন মূল্যবান ভারি মণিকের অংশ (সূত্র:বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ১৯৯১)

স্থান	শতকরা ভাগ	গড়
ইলমেনাইট	৯ থেকে ৪৬	২৬%
গারনেট	৪.৪ থেকে ৮	৬%
জিরকন	১.২ থেকে ৫.৯	৪.২%
কায়ানাইট	নগণ্য থেকে ৯.৯	৪.২%
লিউকক্সিন	০.২৫ থেকে ৫	৩.৯%
রিউটাল	১ থেকে ৬	০.৩১%
ম্যাগনেটাইট	০.৬৩ থেকে ৪.৫	১.৮৭%
মোনাজাইট	০.০১ থেকে ০.৭	৬.৪%

সারণি ২৩ : বাংলাদেশে প্রাপ্ত মূল্যবান ভারি মণিকসমূহের মজুত।

ভারি মণিক	মজুত (টন)
ইলমেনাইট	১,০২৫,৫৫৮
গারনেট	২২২,৭৬১
জিরকন	১৫৮,১১৭
লিউকক্সিন	৯৬,৭০৯
কায়ানাইট	৯০,৭৪৬
ম্যাগনেটাইট	৮০,৫৯৯
রুটাইল	৭০,২৭৪
মোনাজাইট	১৭,৩৫২

গারনেট : মূল্যবান ভারি মণিকসমূহের মজুতের পরিমাণ অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে গারনেটের অবস্থান। সৈকত বালি প্লেসারসমূহে এই মণিকের পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৮% (ইনানী) এবং গড়ে প্রায় ৬%। বাংলাদেশের প্লেসারসমূহে গারনেটের মোট মজুত প্রায় ২২৩ হাজার টন (সারণি ২৩)। গারনেটের সর্বাপেক্ষা বেশি মজুত পাওয়া যায় কুয়াকাটায় (৫২,২২৯ টন)। এছাড়াও কক্সবাজার, মহেশখালী ও শিলখালীতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গারনেট মজুত রয়েছে (সারণি ২৪)।

সারণি ২৪ : বাংলাদেশে বিভিন্ন ভারি মণিকসমূহের এলাকাভিত্তিক মজুত (টন এককে) (সূত্র : বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ১৯৯১)।

স্থান	কাচা বালু	ভারি মণিক	ইলমেনাইট	পারনেট	জিরকন	লিউকক্সিন	কায়ানাইট	ম্যাগনেটাইট	রুটাইল	মোনাজাইট
বদরমোকাম	১,৭৬৫,০০০	৪১১,০০০	৯৪,৫৩০	*	৪,৯৩২	১৮,০০২	*	১০,২৭৫	৩,২৮৮	৪,৯৩২
সাবরাং	৩৪৭,৫৫৮	৬৮,৫৮২	১৯,৬১৪	৩,০১৮	৪,১৮৪	৩,৪৭০	৭২৭	১,০০১	১,৩৭২	২০৬
টেকনাফ	১,৯৩৯,৫৮০	৪৪২,২৯১	১৬৩,১৭০	২২,৪২৪	২৮,৩০৬	২০,১২৪	১৪,৭২৮	৭,২০৯	১৩,২৩০	৩,০৪৫
শিলখালি	২,৭৫৬,৮২৮	৪৮৯,৭১৪	১৭৩,৩৬০	৩৯,৪২২	৩৩,৩০০	১০,৯৭০	৪,৪০৭	৩,০৮৫	১০,৭৭৪	৩,৯১৮
ইনানী	৭২৯,২৮৬	১৭৫,৪৭৬	৫৩,১৭০	১২,৮১০	১০,৮৮০	৪৩৯	১,৪০৪	৫,৫৪৫	৪,০৩৬	৯৬৫
কক্সবাজার	৫,১১৯,০০০	৯২০,০০০	১৬১,০০০	৫০,৬০০	২৩,০০০	১০,৪৮৮	*	৩৩,২১২	৬,৪৪০	২,০২৪
মহেশখালী দ্বীপ	৪,১১৪,২৩০	৭৮৪,২১০	২৪২,৯৬৩	৩৫,৯৫৮	৩৭,১২২	২০,৬৮২	৪৭,৪৯৬	৭,৬০৪	২৪,৫৯৬	২,০৪৪
মাতারবড়ীদ্বীপ	৬৯,০৩০	১৫,২১৫	৪,৯৬২	*	৭৯৪	৩৭৪	*	৫৭৫	২৯৫	২০
নিজুম দ্বীপ	৩৭৯,৩৩৭	৯৬,৩৪৮	১২,৯৭৮	*	২,০৫২	৭৭	২,৫৯২	৪,৩৮৪	৪২৪	১৯
কুতুবদীয়া দ্বীপ	৪০৪,৬৪৬	১২০,০০০	২৩,৭৯৬	৬,৩০০	৩,৯০০	২,৪৩৬	২,৫৯২	৩,৩৮৪	১,৯০৮	৯৬
কুয়াকাটা	২,৮৭২,৪৮৬	৮৩১,৬৬৮	৭৬,০১৫	৫২,২২৯	৯,৬৪৭	৯,৬৪৭	১৬,৮০০	৪,৩২৫	৩,৯১১	৮৩
মোট	২০,৪৯৬,৯৮১	৪,৩৫৪,৫০৪	১,০২৫,৫৫৮	২২২,৭৬১	১৫৮,১১৭	৯৬,৭০৯	৯০,৭৪৬	৮০,৫৯৯	৭০,২৭৪	১৭,৩৫২

জিরকন : মজুতের পরিমাণ অনুযায়ী তৃতীয় স্থানে জিরকনের অবস্থান। সৈকত বালি প্লেসারে এই মণিকের পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৭% (শিলখালী) এবং সর্বনিম্ন প্রায় ১%, যদিও গড়ে প্রায় ৪%। বাংলাদেশে জিরকনের মোট মজুত হিসাব করা হয়েছে প্রায় ১৫৮ হাজার টন। জিরকনের বড় মজুতসমূহের মধ্যে শিলখালী (৩৩,৩০০ টন), টেকনাফ (২৮,৩০৬ টন) এবং মহেশখালীর (৭টি প্লেসার মজুতে মোট ৩৭,১২২ টন) নাম উল্লেখযোগ্য (সারণি-২৪)।

লিউকক্সিন : সৈকত বালি প্লেসারে এর পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৫%(সাবরাং), সর্বনিম্ন ০.০৮%, যদিও গড়ে ২% এবং বাংলাদেশে এর মোট মজুত প্রায় ৯৭ হাজার টন।

কায়ানাইট : সৈকত বালি প্লেসারে এর পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৯% (মহেশখালী) এবং গড়ে প্রায় ৪%। বাংলাদেশে এর মোট মজুত প্রায় ৯১ হাজার টন।

ম্যাগনেটাইট : সৈকত বালি প্লেসারে এর পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৪.৫% (নিঝুম দ্বীপ), সর্বনিম্ন ০.১% যদিও গড়ে প্রায় ১.৮% এবং বাংলাদেশে এর মোট মজুত প্রায় ৮০ হাজার টন।

রুটাইল : সৈকত বালি প্লেসারে এর পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রায় ৪% (মহেশখালী), সর্বনিম্ন ০.৩৫% (কুয়াকাটা) এবং গড়ে প্রায় ২%। বাংলাদেশে এর মোট মজুত প্রায় ৭০ হাজার টন।

মোনাজাইট : সৈকত বালি প্লেসারে এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ১.২% (বদরমোকাম), সর্বনিম্ন ০.০১% (কুয়াকাটা) এবং গড়ে ০.৩১% । বাংলাদেশে মোনাজাইটের মোট মজুত প্রায় ১৭ হাজার টন।

৭.২.৩ সৈকত বালি ভারি মণিক পাইলট প্লান্ট ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৈকত বালি প্লেসারসমূহ থেকে মূল্যবান ভারি মণিকসমূহকে আলাদা করা এবং তার অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে ১৯৭৫ সনে কক্সবাজারে একটি পরীক্ষামূলক ভারি মণিক পৃথকীকরণ প্লান্ট স্থাপন করা হয়। প্রাথমিকভাবে মাত্র ৬ মাস এই প্লান্টে পরীক্ষামূলক কাজ চললেও বস্তুত ১৯৮১ সন থেকে এখানে প্রকৃত কাজ আরম্ভ হয় এবং এই সময় ভারি মণিকসমূহের অর্থনৈতিক গ্রেড অর্জনে বেশ সফলতা অর্জিত হয়। বিশেষ করে ম্যাগনেটাইট এবং ইলমেনাইট উভয় মণিকের ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক গ্রেড তথা ৯৯% গ্রেড অর্জন করা সম্ভব হয়। অন্য যে কয়েকটি ভারি মণিকের ক্ষেত্রে "প্রায় বাণিজ্যিক" গ্রেড অর্জিত হয় সেগুলো হলো জিরকন (গ্রেড ৯৪%), রুটাইল (গ্রেড ৯০%) এবং গারনেট (গ্রেড ৯৪%) (বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ১৯৯১)।

১৯৮১ সনে শুরু করে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে এই প্লান্টে ২২৭ টন ইলমেনাইট, ২০৬ টন ম্যাগনেটাইট, ৭.১২ টন জিরকন, ১.৫৩ টন রুটাইল এবং

১২.৩৭ টন গারনেট উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদিত ভারি মণিকসমূহকে স্থানীয় বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় যথা চট্টগ্রাম ইস্পাত মিল, বাংলাদেশ ওয়েলডিং ইলেকট্রড লিমিটেড, বাংলাদেশ অক্সিজেন, কর্ণফুলী পেপার মিলস্, কয়েকটি স্থানীয় সিরামিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিকভাবে সরবরাহ করা হয়। এক সূত্র অনুযায়ী বাংলাদেশে বাণিজ্যিক শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রুটাইল, জিরকন, গারনেট ইত্যাদি ভারি মণিকসমূহ বিদেশ থেকে আমদানি বাবদ বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়।

অধুনা বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার পাইলট প্লান্টটিকে অধিকতর উন্নত (upgrading) করার লক্ষ্যে বিদেশী কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে কয়েকটি বেসরকারি বিদেশী ভারি মণিক অনুসন্ধান ও আহরণ কোম্পানি নিজস্ব উদ্যোগে বাংলাদেশে ভারি মণিকসমূহের অনুসন্ধান এবং আহরণ করার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

চীনামাটি

(China Clay)

৮.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি

চীনামাটি বলতে মূলত কেয়োলিন (kaolin) কাদা মণিক দিয়ে গঠিত সিরামিক শিল্পে ব্যবহার্য উন্নতমানের কাদাকে বোঝানো হয়ে থাকে। কেয়োলিন নামটি চীনদেশের কেওলিং নামক স্থানের নামানুসারে হয়েছে। সেখানে সর্বপ্রথম এ ধরনের কাদার মজুত আবিষ্কার ঘটে ও ব্যবহার শুরু হয় এবং সে কারণে এ ধরনের কাদাকে চীনামাটি নামে অভিহিত করা হয়। চীনামাটির মূল উপাদান কেয়োলিনাইট (kaolinite) এর রং অনুযায়ী এই কাদা সাদা রঙের হয়ে থাকে বলে তা সাদা কাদা বা হোয়াইট ক্লে (white clay) নামেও পরিচিত। চীনামাটির মূল উপাদান কেয়োলিনাইট, তবে এর ভিতর কিছু পরিমাণ কোয়ার্টজ, মাইকা, লৌহময় মণিক বা অন্যান্য কাদা মণিক যেমন ইলাইট, মন্টমরিলোনাইট, ক্লোরাইট ইত্যাদিও থাকতে পারে যা চীনামাটির বিশুদ্ধতাকে খর্ব করে।

চীনামাটির মূল ব্যবহার সিরামিক শিল্পে উন্নতমানের পোরসেলিন অর্থাৎ থালা, বাসন, কাপ তথা চকচকে তৈজসপত্র ও মৃৎপাত্র তৈরি। অবশ্য উন্নতমানের তৈজসপত্র তৈরিতে চীনামাটির সাথে কিছু পরিমাণ ফেল্‌সপার মণিকের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও নানা ধরনের সিরামিক দ্রব্য যেমন ইনসুলেটর, টাইলস্ ইত্যাদি তৈরিতে এবং কাগজ, রাবার, চামড়া, ঔষধ ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পেও চীনামাটির ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত।

চীনামাটি সাধারণত শিলার আবহাওয়াজনিত ক্ষয় (weathering) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত গ্রানাইটিক (granitic) শিলা বহুদিনের আবহাওয়া জনিত ক্ষয় প্রক্রিয়ার প্রভাবে পড়লে শিলার মূল উপাদান ফেল্ডস্পার (feldspar) রাসায়নিকভাবে ক্ষয় হয়ে কেয়োলিনাইট মণিকে পরিণত হয়। এভাবে একটি অবশিষ্ট চীনামাটির মজুত (residual china clay deposit) সৃষ্টি হয়। ইংল্যান্ডের ডেভন এবং কর্নওয়াল প্রদেশে গ্রানাইট থেকে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সৃষ্ট চীনামাটির মজুত বিশ্বখ্যাত (হেনসন এবং বেটম্যান ১৯৮১)। কখনও বা কেয়োলিনাইট মণিক তার উৎস থেকে পানিবাহিত হয়েও অবক্ষেপণের (sedimentation) মাধ্যমে বেসিন অঞ্চলে জমা হয়ে একটি পরিবাহিত চীনামাটির মজুত (transported china clay deposit) সৃষ্টি করতে

পারে। এক্ষেত্রে চীনামাটির স্তর অন্যান্য শিলাস্তরের তথা বেলেপাথর বা কাদাশিলার সাথে স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়।

৮.২ বাংলাদেশে চীনামাটি সম্পদ

১৯৫৭ সনে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নেত্রকোনা জেলার (তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলায় অন্তর্ভুক্ত) বিজয়পুরে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত চীনামাটির স্তরের আবিষ্কার ঘটে। পরবর্তীকালে শেরপুর জেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি স্থানেও অনুরূপ চীনামাটির স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই চীনামাটির মজুতসমূহ মূলত নবীনতর টারশিয়ারি শিলাস্তরে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত অবস্থায় এবং ভূগর্ভে স্বল্প গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেখা যায়। ইতোমধ্যে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দিনাজপুর, রংপুর এবং নওগাঁ জেলায় খননকৃত কূপে তুলনামূলকভাবে অধিক গভীরতায় অতি প্রাচীন যুগের তথা প্রাক-ক্যামব্রিয়ান এবং মধ্যজীবীয় (Mesozoic) শিলাতেও চীনামাটির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত চীনামাটির মজুতসমূহকে দুটি ভাগে আলোচনা করা হলো, যথা : (১) পূর্বাঞ্চলের উন্মোচিত চীনামাটি এবং (২) উত্তরবঙ্গের ভূগর্ভস্থ চীনামাটি। ২৫ সারণিতে বাংলাদেশে চীনামাটির মজুতসমূহের প্রাপ্তিস্থান এবং মজুতের পরিমাণ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ২৫ ঃ বাংলাদেশে চীনামাটির মজুতসমূহ (সূত্র : ইসলাম ১৯৮৫; রহমান ১৯৯৫)।

আবিষ্কার সন	স্থান	বিস্তৃতি	মজুত (মিলিয়ন টন)
১,৯৫৭	বিজয়পুর, নেত্রকোনা জেলা	৬.৫ কি:মি: x ০.৫ কি:মি:	২.৫৭
১,৯৭৪	মধ্যপাড়া, দিনাজপুর জেলা	১ কি:মি: x ১ কি:মি:	১৫
১,৯৮৫	বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর জেলা	১ কি:মি: x ১ কি:মি:	১৫
১,৯৭৬	হাইটগাঁও,কাঞ্চপুর,এলাহাবাদ (চট্টগ্রাম জেলা)	-	০.০০১৮
১,৯৯০	ভুরুংগা, শেরপুর জেলা	২ কি:মি: x ০.২ কি:মি:	০.০০১৩

৮.২.১ পূর্বাঞ্চলের উন্মোচিত চীনামাটি ঃ দেশে পূর্বাংশে (যমুনা নদীর পূর্বদিকে) তিনটি স্থানে তথা নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুরে, শেরপুর জেলার ভুরুংগাতে এবং চট্টগ্রাম জেলার হাইডগাঁও এলাকায় ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত এবং স্বল্প গভীরতায় বিস্তৃত উর্ধ্ব টারশিয়ারি (Upper Tertiary) যুগের চীনামাটির স্তর বিদ্যমান। এই চীনামাটির

স্তরসমূহ প্লায়োসিন উপযুগের ডুপিটিলা সংঘে বেলেপাথর ও কাদাশিলা স্তরের সাথে লম্বাটে লেন্স আকারে ও অনিয়মিত স্তর হিসেবে বিরাজ করে।

উপরিউক্ত চীনামাটির স্তরসমূহ ভূতাত্ত্বিক অতীতে কেয়োলিনাইট কাদাসমৃদ্ধ পললের পরিবহণ ও অবক্ষেপণের মাধ্যমে মূলত নদীবাহিত সমতলভূমির পরিবেশে জমা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করে থাকেন যে চীনামাটির মূল উপাদান কেয়োলিনাইট কাদা ভূতাত্ত্বিক অতীতে ভারতীয় শিল্ড বা শিলং শিল্ড এর ফেলস্‌পারসমৃদ্ধ গ্রানাইটজাতীয় ভিত শিলা (granitic basement) অথবা তা থেকে উদ্ভূত ফেলসপারসমৃদ্ধ আরকোসিক বেলেপাথরের (arkosic sandstone) ক্ষয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তা নদীবাহিত হয়ে এসে স্তরীভূত অবস্থায় জমা হয়েছে। সে হিসেবে উপরিউক্ত মজুতসমূহ পরিবাহিত চীনামাটির মজুত হিসেবে গণ্য করা হয়। চীনামাটির স্তরসমূহের বিস্তৃতি ও পুরুত্ব ঐ সময় অবক্ষেপণের পরিবেশ ও নদীবাহিত কেয়োলিনাইট কাদার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল ছিল।

উপরে উল্লেখিত চীনামাটির মজুতসমূহের মধ্যে বিজয়পুরের মজুতই সর্ববৃহৎ এবং এখন পর্যন্ত এই স্থান থেকে চীনামাটির মূল উৎপাদন হয়ে আসছে।

(ক) বিজয়পুরের চীনামাটি ঃ নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানাধীন ভারত সীমান্তবর্তী বিজয়পুরে প্রাপ্ত চীনামাটির মজুত এলাকায় ১৯৫৭-৫৮ সনে বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক জরিপ এবং ১৯৬৪-৬৫ সনে বেশ কিছু সংখ্যক কূপ খননের মাধ্যমে এর ভূতত্ত্ব, বিস্তৃতি এবং মজুত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়।

ভূতত্ত্ব ঃ বিজয়পুর এলাকায় চীনামাটির স্তরসমূহ পশ্চিমে বেদকুরা এবং পূর্বে গোপালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ১০.৫ কিলোমিটার লম্বা ও ৬০০ মিটার চওড়া এলাকা বরাবর অবস্থিত অল্প উঁচু পাহাড়ি ভূমি বা টিলাসমূহে উন্মোচিত (চিত্র ৮.১)। টিলাসমূহের উচ্চতা প্রায় ১৫ মিটার থেকে প্রায় ৪০ মিটার পর্যন্ত। এই এলাকা ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশীয় সমতল ভূমির (piedmont alluvial plain) অন্তর্ভুক্ত। এখানে উর্ধ্ব টারশিয়ারি যুগের তিপাম সংঘ এবং ডুপিটিলা সংঘ ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত হয়েছে। উপরিউক্ত সংঘ শিলাস্তরসমূহ এই এলাকায় ৪৫ ডিগ্রি থেকে ৫০ ডিগ্রি নতিসহ (dip) দক্ষিণ দিকে ঢালু এবং এ সবই দক্ষিণে আধুনিক যুগের পলি আবরণের নিচে ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। চীনামাটির স্তরসমূহ ডুপিটিলা সংঘে বেলেপাথরে ও কাদাশিলার স্তরের সাথে স্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়।

২৬ সারণিতে বিজয়পুর এলাকার একটি স্তরক্রমবিন্যাস দেখানো হয়েছে। এই স্তর-ক্রমবিন্যাসের সর্বনিম্নে অবস্থিত তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘ মূলত বেলেপাথরের স্তর ও সাথে কিছু কাদা শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। এখানে তিপাম সংঘের মোট পুরুত্ব প্রায় ৬৭০

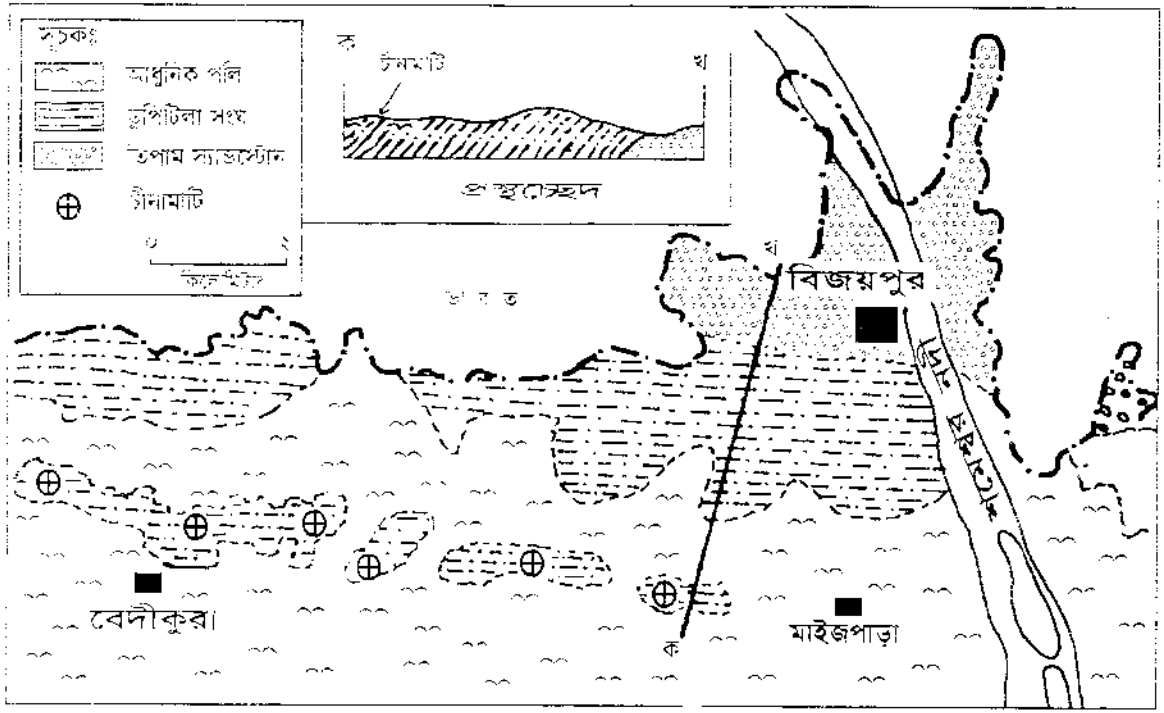

চিত্র ৮.১ঃ নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুরে চীনামাটির মজুত এলাকা (সূত্র: ইসলাম ১৯৮৫)।

মিটার। এই সংঘটি বিজয়পুর এলাকায় উত্তরাংশে উন্মোচিত (চিত্র ৮.১)। এর দক্ষিণে এবং স্তরক্রমবিন্যাসে তিপাম সংঘের উপরে ডুপিটিলা সংঘের অবস্থান।

সারণি ২৬ : বিজয়পুর (নেত্রকোনা জেলা) এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস (সূত্র: ইসলাম ১৯৮৫)।

উপযুগ	সংঘ (পুরুত্ব মিটারে প্রদত্ত)	শিলা লক্ষণ
আধুনিক	পলিমাটি	বালু ও কাদা
প্লায়োসিন	ডুপিটিলা সংঘ (৯১৫)	মোটা-মধ্যম দানাদার, লৌহময় বেলেপাথর, সামান্য কাদাশিলা ও চীনা মাটি
মায়োসিন	তিপাম সংঘ (৬৭০)	মূলত মধ্যম দানাদার বেলেপাথর, কিছু কাদাশিলা

ডুপিটিলা সংঘটি মূলত মধ্যম থেকে মোটা দানাদার বেলেপাথর স্তর নিয়ে গঠিত হলেও তার সাথে কিছু কাদাশিলা ও চীনামাটির স্তরের বিন্যাস ঘটেছে। চীনামাটির স্তরসমূহ অনিয়মিত স্তর এবং লেন্স আকারে ডুপিটিলা সংঘের স্ট্রাইক বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে উন্মোচিত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ দিকে এই স্তরসমূহ ৪৫ ডিগ্রি থেকে ৫০ ডিগ্রি নতিসহ ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং খননকৃত কূপসমূহে তা পাওয়া যায়। চীনামাটির স্তরসমূহের পুরুত্ব দক্ষিণ দিকে নতি বরাবর (down dip) বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। বিজয়পুর এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক চীনামাটির স্তর চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলোর এক একটির পুরুত্ব ০.৩ মিটার থেকে ৮ মিটার পর্যন্ত এবং স্ট্রাইক (strike) বরাবর বিস্তৃতি ২০ মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। বিজয়পুর এলাকায় ডুপিটিলা সংঘের মোট পুরুত্ব ৯১৫ মিটার।

স্তরক্রমবিন্যাসে ডুপিটিলা সংঘের উপর কাদা, বালুময় কাদা ও বালুস্তর গঠিত আধুনিক যুগের পলির আবরণ বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলসমূহে বিদ্যমান।

গুণাবলী : বিজয়পুরের চীনামাটি হালকা ধূসর থেকে সাদাটে রঙের এবং ভূপৃষ্ঠে কোনো কোনো স্থানে তাতে নানা রঙের সমন্বয় (mottled) লক্ষণীয়। এগুলো সাধারণত মসৃণ (soapy), অবশ্য মাঝে মাঝে খসখসে (gritty)। ভেজা অবস্থায় এই চীনামাটি আঠালো ও নরম এবং শুকনা অবস্থায় তা মধ্যম মাত্রায় শক্ত এবং ভঙ্গুর। এই চীনামাটিতে মূল উপাদান কেয়োলিনাইট ছাড়াও কিছু পরিমাণ কোয়ার্টজ, ইলাইট ও সামান্য ক্লোরাইট মর্ণিক শনাক্ত করা হয়েছে। এতে কোয়ার্টজের পরিমাণ প্রায় ২০%

থেকে ৩০% লক্ষ্য করা গেছে। এই কাদার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল হলো : সিলিকন অক্সাইড ৫০% থেকে ৬৮%, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ২০% থেকে ৩৩%, আয়রন অক্সাইড ০.৪% থেকে ২.৮%, টাইটানিয়াম অক্সাইড ০.৪% থেকে ২%, ক্যালসিয়াম অক্সাইড চিহ্নমাত্র থেকে ১% এবং ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড চিহ্নমাত্র থেকে ০.৮% (ইসলাম ১৯৮৫)। বিজয়পুর চীনামাটির প্লাস্টিসিটি (plasticity) তুলনামূলকভাবে কম অর্থাৎ বিজয়পুর চীনামাটি ২০%, রাজমহল চীনামাটি ৩৬% এবং ইংলিশ চীনামাটি ৪২% (রায় ১৯৬০)। বিজয়পুর চীনামাটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫৫ এবং এর মান মধ্যম শ্রেণীর।

মজুত : বিজয়পুর চীনামাটির মজুত নির্ণয়ে চীনামাটির স্তরসমূহের পুরুত্ব ও বিস্তৃতি আলাদাভাবে হিসেব করা হয়েছে এবং ভূগর্ভে এর বিস্তৃতির কয়েকটি উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। উপরিউক্ত হিসাব অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠ এবং তার নিচে ১৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত চীনামাটির প্রমাণিত মজুত ৬,১৯,৫০০ টন। একইভাবে নতি বরাবর ৬০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত চীনামাটির মোট মজুত প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন টন বলে হিসেব করা হয়েছে (ইসলাম ১৯৮৫)।

উৎপাদন ও ব্যবহার : ১৯৬০ সনে বিজয়পুর চীনামাটির উৎপাদন শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত দেশীয় সিরামিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে এখান থেকে উৎপাদিত চীনামাটি সরবরাহ করা হচ্ছে। এখানে উন্মুক্ত খনি পদ্ধতিতে (open pit) চীনামাটি উৎপাদন করা হয়। ২৭ সারণিতে বিজয়পুরে বার্ষিক চীনামাটি উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।এই চীনামাটি দেশীয় সিরামিক শিল্পে ইনসুলেটর, স্যানিটারি দ্রব্যাদি ও নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র বা পোরসেলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য উন্নতমানের তৈজসপত্র বানানোর জন্য এই চীনামাটির সাথে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত উন্নতমানের চীনামাটি মেশানো হয়ে থাকে।

(খ) অন্যান্য চীনামাটি ঃ বিজয়পুর ছাড়াও দেশের পূর্বাংশে একই ধরনের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে যে চীনামাটির মজুতসমূহ পাওয়া যায় সেগুলো হলো শেরপুর জেলার ভুরুংগা এবং চট্টগ্রাম জেলার হাইওগাঁও এবং বায়তুল ইজ্জত। এ সমস্ত চীনামাটির মজুত মূলত ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত এবং ভূগর্ভে স্বল্প গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত হিসেবে লক্ষ্য করা গেছে।

১৯৭৬ সনে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার হাইডগাঁও এলাকায় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ চীনামাটির সন্ধান লাভ করে। এখানে ডুপিটিলা সংঘে চীনামাটির স্তরসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে অনিয়মিত স্তর, লেন্স ও পকেট আকারে বিদ্যমান। এই এলাকায় চীনামাটির মজুত প্রায় ১৮৮৪ টন। এছাড়াও সন্নিকটস্থ সাতকানিয়া থানার বায়তুল ইজ্জত এলাকাতেও চীনামাটির স্তর পাওয়া গিয়েছে।

১৯৯০ সনে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার ভুরুংগা এলাকায় চীনামাটির মজুতের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ২ কিলোমিটার লম্বা এবং ২০০ মিটার প্রস্থ এলাকায় ডুপিটিলা সংঘের মধ্যে চীনামাটির স্তরসমূহ অনিয়মিত স্তর হিসেবে এবং কখনও বা লেন্স আকারে বিরাজ করে। এখানে চীনামাটির মজুত প্রায় ১৩০০ টন।

সারণি ২৭ ঃ বিজয়পুরে চীনামাটি উৎপাদন (সূত্র: ইসলাম ১৯৮৫; খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো)

সাল	উৎপাদন (টন)	সাল	উৎপাদন (টন)
১৯৬২	১২১	১৯৭৭	৪৩১৬
১৯৬৩	৫৩৭	১৯৭৮	৬৫৪১
১৯৬৪	৯৬৬	১৯৭৯	৮৪৭৭
১৯৬৫	১১০২	১৯৮০	৮৮৪৩
১৯৬৬	২৬০৫	১৯৮১	৭৫৫৮
১৯৬৭	২৮৪৫	১৯৮২	৪৫১৮
১৯৬৮	৩০০৭	১৯৮৩	২০২৬
১৯৬৯	৩৯৪৬		
১৯৭০	৩০২০	১৯৮৯	৩৩১২
১৯৭১	৭২৫	১৯৯০	৭৩৬৬
১৯৭২	২২৭৬	১৯৯১	৬৫৭০
১৯৭৩	৩৪৬০	১৯৯২	১৮৮০
১৯৭৪	৩৪৭৪	১৯৯৩	২৪৫২
১৯৭৫	৪৫৯৭	১৯৯৪	৩২৮৩
১৯৭৬	২২৩৬	১৯৯৫	৬৫৪১

৮.২.২ উত্তরবঙ্গের ভূগর্ভস্থ চীনামাটি ঃ দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভূগর্ভে তিনটি স্থানে প্রাচীন শিলায় চীনামাটির উল্লেখযোগ্য মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে : যথা: (ক) মধ্যপাড়া (খ) বড়পুকুড়িয়া এবং (গ) পত্নীতলা ।

(ক) মধ্যপাড়া ঃ দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় ১৯৭৪ সালে কূপ খননের মাধ্যমে ভূগর্ভে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগের চীনামাটি আবিষ্কৃত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর রংপুর এলাকায় তুলনামূলকভাবে স্বল্প গভীরতায়

প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলা অবস্থান করে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়া এলাকায় এই ভিত শিলা মাত্র ১২৮ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। এই ভিত শিলা মূলত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা দিয়ে গঠিত হলেও এর উপরের কিছু অংশ আবহাওয়াজনিত ক্ষয়ের কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে এর একেবারে উপরের অংশে কিছুটা পুরুত্ব বরাবর ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কেয়োলিনাইটসমৃদ্ধ একটি অবশিষ্ট চীনামাটি বা রেসিডিউয়াল চায়না ক্লে (residual china clay) মজুত সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত চীনামাটির স্তরটি খননকৃত কূপসমূহে ভূপৃষ্ঠের নিচে ১২৮ মিটার থেকে ১৩৭ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। এই চীনামাটি সাদাটে ধূসর থেকে ময়লা সাদা রঙের, শক্ত এবং ভঙ্গুর এবং এতে কেয়োলিনাইট ছাড়াও কিছু পরিমাণ কোয়ার্টজ ও অন্যান্য কাদা মণিক রয়েছে। এই চীনামাটির স্তরের পুরুত্ব ১.২ মিটার থেকে ৬.৪ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। মধ্যপাড়ায় ১ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে এই চীনামাটির মজুত প্রায় ১৫ মিলিয়ন টন (রহমান ১৯৯৫)। মধ্যপাড়ায় বর্তমানে নির্মাণাধীন ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা খনি থেকে কঠিন শিলার উপর অবস্থিত চীনামাটি আহরণের কোনো পরিকল্পনা নেই। উল্লেখ্য যে, এই এলাকায় উন্মুক্ত খনির (open pit mine)) মাধ্যমে কঠিন শিলা উত্তোলন করা গেলে তার সাথে উল্লিখিত চীনামাটির স্তরটি সহজেই আহরণ করা সম্ভব।

(খ) বড়পুকুরিয়া ঃ ১৯৮৫ সনে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় গন্ডোয়ানা বেসিনে কয়লার আবিষ্কার ঘটে। এই কয়লা বেসিনে প্রায় ৫০০ মিটার পুরুত্বের পারমিয়ান যুগের গন্ডোয়ানা শিলাস্তর মূলত আরকোসিক বেলেপাথর এবং কিছু কাদাশিলা, কংগ্লোমারেট ও কয়লাস্তর দিয়ে গঠিত। এই শিলাস্তরসমূহের উপরে অবস্থিত টারশিয়ারি যুগের ডুপিটিলা সংঘের নিম্নাংশে চীনামাটি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূবিজ্ঞানিগণ মনে করেন এই চীনা মাটির উৎস গন্ডোয়ানা দলের আরকোসিক বেলেপাথরের ফেলস্পার মণিকসমূহের রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত কেয়োলিনাইট। এই চীনামাটি স্তরের পুরুত্ব ১.৯৮ থেকে ১২.৫ মিটার এবং গভীরতা ১১৮ থেকে ১৮৪ মিটার। এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় এই চীনামাটির মোট মজুত প্রায় ২৫ মিলিয়ন টন বলে ধরা হয়েছে (রহমান ১৯৯৫)। বড়পুকুরিয়ায় বর্তমানে নির্মাণাধীন ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি থেকে কয়লাস্তরের উপর অবস্থিত চীনামাটি আহরণের কোনো পরিকল্পনা নেই। উল্লেখ্য যে, বড়পুকুরিয়া এলাকায় উন্মুক্ত খনির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন করা গেলে তার সাথে উল্লিখিত চীনামাটির স্তরটি সহজেই আহরণ করা সম্ভব।

(গ) **পত্নীতলা ঃ** দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নওগাঁ জেলায় পত্নীতলা নামক স্থানে দুটি কূপে ভূগর্ভে চীনামাটির স্তর আবিষ্কৃত হয়। এই চীনামাটির স্তর ক্রিটেশাস যুগের

শিবগঞ্জ ট্রাপওয়াশ সংঘে বেলেপাথর ও কাদাশিলা স্তরের সাথে স্তরীভূত অবস্থায় বিদ্যমান। চীনামাটির স্তর সংবলিত শিবগঞ্জ সংঘটি তার নিচে অবস্থিত জুরাসিক যুগের আগ্নেয়গিরি উদ্ভূত ব্যাসাল্ট শিলা দিয়ে গঠিত রাজমহল ট্রাপ সংঘের অংশবিশেষের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পত্নীতলায় চীনামাটির স্তর সংবলিত শিবগঞ্জ সংঘের গভীরতা ৪০৮ মিটার,পুরুত্ব প্রায় ৩০ মিটার থেকে ৬০ মিটার এবং এর ভিতর অবস্থিত চীনামাটির স্তরের গড় পুরুত্ব প্রায় ৯ মিটার। পর্যাপ্ত ভূতাত্ত্বিক উপাত্তের অভাবে পত্নীতলায় চীনামাটির মজুত নির্ণয় সম্ভব হয় নি।

--

নবম অধ্যায়

কাচবালি

(Glass Sand)

৯.১ সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি

কাচবালি হলো উন্নতমানের কোয়ার্টজ (quartz) বালি যা দিয়ে কাচ ও কাচজাতীয় দ্রব্যাদি তৈরি করা যায়। কাচবালির রাসায়নিক উপাদানে ন্যূনতম ৯৫% সিলিকা (SiO_2) থাকা প্রয়োজন। সাধারণত কাচবালিতে ৯৫% থেকে ৯৯.৮% সিলিকা থেকে থাকে। সিলিকা ছাড়া অন্যান্য উপাদান কাচবালির গুণাগুণের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। আয়রন অক্সাইড (Fe_2O_3) কাচবালির বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এবং এর অতি সামান্য পরিমাণ (০.০৩%) উপস্থিতির কারণেই তৈরি গ্লাসের রং সবুজাভ বা হলদে হয়ে থাকে। এলুমিনা (Al_2O_3) সাধারণত গ্লাসের জন্য ক্ষতিকারক নয় তবে এর পরিমাণ ৪% এর কম থাকা বাঞ্ছনীয়। কাচবালিতে সামান্য পরিমাণ লাইম (CaO) ও ম্যাগনেশিয়া (MgO) এবং অ্যালকালি (Na_2O) কাম্য, যেহেতু কাচ তৈরিতে এ উপাদানসমূহ সহায়ক।

কাচবালি প্রধানত কোয়ার্টজ মণিক কণা দিয়ে গঠিত। এ ছাড়াও এর ভিতর সামান্য পরিমাণ ফেল্ডস্পার, মাইকা, লৌহময় মণিক (iron mineral) ইত্যাদি থেকে থাকে। কাচবালির কণাসমূহ মিহি দানাদার (fine grained) এবং উন্নত বাছাই শ্রেণির (well sorted) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাচবালির মজুত প্রাচীন যুগের কোয়ার্টজাইট শ্রেণির বিশুদ্ধ শক্ত বেলেপাথর অথবা নবীন যুগের আলগা ভঙ্গুর বালিস্তর উভয়ই হতে পারে। কাচবালি উৎপত্তির প্রধান পূর্বশর্ত হলো সাধারণ বালির পরিবহণ ও পললক্ষেপণ (sedimentation) প্রক্রিয়ায় কোয়ার্টজ মণিকের অতি অধিক হারে ঘন সমাবেশ হওয়া এবং সেই সাথে বালির অন্যান্য মণিক উপাদান বিদূরিত হওয়া। বালির উৎস, পরিবহণ ও পললক্ষেপণের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে বালি কখনও প্রথম চক্রেই (cycle) উল্লেখযোগ্য বিশুদ্ধতা লাভ করে কাচবালি সৃষ্টি করতে পারে। অন্যথায় প্রথম চক্রে জমা হওয়া একটি সাধারণ বেলেপাথর স্তর দ্বিতীয় চক্রে পুনরায় ক্ষয় পরিবহণ ও পললক্ষেপণের মাধ্যমে কাচবালির নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই কাচবালি বিশুদ্ধতা অর্জনের সাথে সাথে অধিকতর শুভ্র হয়ে থাকে।

৯.২ বাংলাদেশের কাচবালি সম্পদ

বাংলাদেশের কাচবালি দুই ধরনের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে পাওয়া যায়- যথা : (১) পূর্বাঞ্চলের আধুনিক পাদদেশীয় পলিজ কাচবালি এবং (২) উত্তর-বঙ্গের ভূগর্ভস্থ প্রাচীন কাচবালি। বর্তমানে কেবল পূর্বাঞ্চলের পাদদেশীয় পলিজ কাচবালি উত্তোলন ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যদিও উত্তরবঙ্গে ভূগর্ভে অধিক গভীরতায় প্রাপ্ত কাচবালির মজুত অনেক বেশি ও তা উন্নততর শ্রেণিরও বটে। ২৮ সারণিতে বাংলাদেশের কাচবালির মজুতসমূহের প্রাপ্তিস্থান ও মজুতের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২৮ ঃ বাংলাদেশের কাচবালির মজুতসমূহ (সূত্র: ইসলাম ১৯৮৫; রহমান ১৯৯৪)।

স্থান	আবিষ্কার সন	বিস্তৃতি	মজুত (মিলিয়ন টন)
বালিজুরী (শেরপুর জেলা)	১৯৬০	১১ কি:মি x ১.৬ কি:মি	০.৬৪
শাহজীবাজার (হবিগঞ্জ জেলা)	১৯৫২	১৫ কি:মি: x ১ কি:মি	১.৪১
চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা জেলা)	১৯৬৮	১৬ কি:মি x ১.৫ কি:মি	-
মধ্যপাড়া (দিনাজপুর জেলা)	১৯৭৪	১ কি:মি x ১ কি:মি	১৭.২৫
বড়পুকুরিয়া (দিনাজপুর জেলা)	১৯৮৫	১:কি:ম x ১: কি:মি	৯০

৯.২.১ পূর্বাঞ্চলের আধুনিক পাদদেশীয় পলিজ কাচবালি ঃ দেশের পূর্বাঞ্চলে (যমুনা নদীর পূর্বদিকে) যে সমস্ত স্থানে ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটে আধুনিক পাদদেশীয় পলিজস্তরে (Recent piedmont alluvium) উল্লেখযোগ্য কাচবালির মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো হলো শেরপুর জেলার বালিজুরী, হবিগঞ্জ জেলার শাহজিবাজার এবং কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম। এছাড়াও মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া, সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট লামকা এবং চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার দক্ষিণ জংগল এলাকাতেও কাচবালির মজুত পাওয়া যায়। ভূবিজ্ঞানিগণ এই মত পোষণ করেন যে, পূর্বাঞ্চলের পাদদেশীয় পলিজ সমতল ভূমিতে আরো একাধিক স্থানে অনুরূপ কাচবালির মজুত আবিষ্কৃত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও কুমিল্লার ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় পাদদেশীয় পলিজ সমতল ভূমির অবস্থান। এই পাদদেশীয় পলিজ সমতল ভূমি আধুনিক যুগে (Holocene epoch), উত্তরে গারো-খাসিয়া পাহাড়ি এলাকা এবং পূর্বে ত্রিপুরা - সিলেটের পাহাড়ি এলাকার পাদদেশ বরাবর ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত তিপাম, ডুপিটিলা ও

ডিহিং সংঘ দিয়ে গঠিত উচ্চভূমির ক্ষয়, পরিবহণ ও পললক্ষেপণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। উপরিউক্ত শিলাসংঘসমূহ মূলত বেলেপাথর স্তর দিয়ে গঠিত এবং এদের দ্বিতীয় চক্রের ক্ষয় ও পললক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় নদীবাহিত ভূমির পরিবেশে (fluvial environment) এই পাদদেশীয় পলির সৃষ্টি হয়। এই পাদদেশীয় পলি মূলত বালি, সিল্টময় বালি, কাচবালি, কাদাময় বালি ও কাদাস্তরসমূহ দিয়ে গঠিত। বস্তুত এই কাচবালি তার উৎস তিপাম, ডুপিটিলা ও ডিহিং সংঘের বেলেপাথর স্তরের ক্ষয়, নদী পরিবহণ ও ধৌত হওয়ার মাধ্যমে বিশুদ্ধতা লাভ করে।

আধুনিক পাদদেশীয় পলিজ স্তরে অবস্থিত কাচবালির স্তরসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ও মধ্যম আকারের লম্বাটে ও সরু লেন্স ও অনিয়মিত স্তর হিসেবে ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটে বিরাজ করে। কাচবালির স্তরসমূহের গভীরতা ভূপৃষ্ঠের নিচে ০.১৫ থেকে ৩.৫০ মিটার এবং এগুলোর পুরুত্ব ০.১ মিটার থেকে ২.১ মিটার। এই কাচবালিতে সিলিকার পরিমাণ প্রায় ৮৩%থেকে প্রায় ৯৭% এবং আয়রন অক্সাইডের পরিমাণ ০.১% এর কম থেকে ১.৮৬% পর্যন্ত। আয়রন অক্সাইডের আধিক্য হেতু এর মান মধ্যম থেকে নিম্ন মাত্রার বলে চিহ্নিত করা হয়। এই কাচবালি দিয়ে উন্নতমানের বর্ণহীন গ্লাস তৈরি করা যায় না, তবে সাধারণ মানের সবুজাভ বা হলদেটে গ্লাস তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়।

(ক) বালিজুরীর কাচবালি ঃ ১৯৬০ সনে শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী থানার বালিজুরী এলাকায় কাচবালির সন্ধান পাওয়া যায় (চিত্র ৯.১)। এখানে ভারত সীমান্তের নিকটে পূর্ব-পশ্চিমে ১১ কিলোমিটার লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ০.৮ থেকে ১.৬ কিলোমিটার চওড়া এলাকা বরাবর কাচবালির অবস্থান লক্ষ্য করা যায় (ইসলাম ১৯৮৫)।

বালিজুরী এলাকাটি ভারতের গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত অল্প উচ্চ টিলা (hillock) ও উপত্যকা সমন্বয়ে গঠিত। টিলাসমূহের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০ মিটার বা তার বেশি। এলাকাটি আংশিকভাবে আধুনিক যুগের পাদদেশীয় পলি এবং আংশিকভাবে প্লায়োসিন প্লেইসটোসিন সময়ের ডুপিটিলা সংঘ দিয়ে গঠিত।

২৯ সারণিতে বালিজুরী এলাকার একটি স্তরক্রমবিন্যাস দেখানো হয়েছে। স্তর ক্রমবিন্যাসের নিচের অংশে অবস্থিত ডুপিটিলা সংঘটি বেলেপাথর, নুড়িময় বেলেপাথর (pebbly sandstone) ও কাদাশিলা সমন্বয়ে গঠিত এবং তা মূলত টিলাসমূহ গঠন করে। ডুপিটিলা সংঘের উপরে এবং মূলত উপত্যকা ও পাদদেশীয় সমতল বরাবর উন্মোচিত আধুনিক পলিস্তর বিন্যস্ত রয়েছে যার উপরের অংশ বালিময় কাদা স্তর, মধ্য অংশ কাদাময় বালি, বালি ও কাচবালি স্তর এবং নিম্ন অংশ কাদা ও বালুময় কাদাস্তর দিয়ে গঠিত। আধুনিক পলিস্তরের মোট পুরুত্ব ০.৫ মিটার থেকে ৬ মিটারের বেশি। আধুনিক পাদদেশীয় পলিস্তরের মধ্যবর্তী অংশে বিক্ষিপ্তভাবে মোট ৩০টি কাচবালির অনিয়মিত স্তর বা লেন্সের দেখা পাওয়া গেছে যাদের একেকটি প্রায় ১৪২২ বর্গমিটার থেকে ৭৪,৭১১ বর্গমিটার পর্যন্ত এলাকাব্যাপী বিস্তৃত। এই কাচবালির লেন্স বা স্তরসমূহের

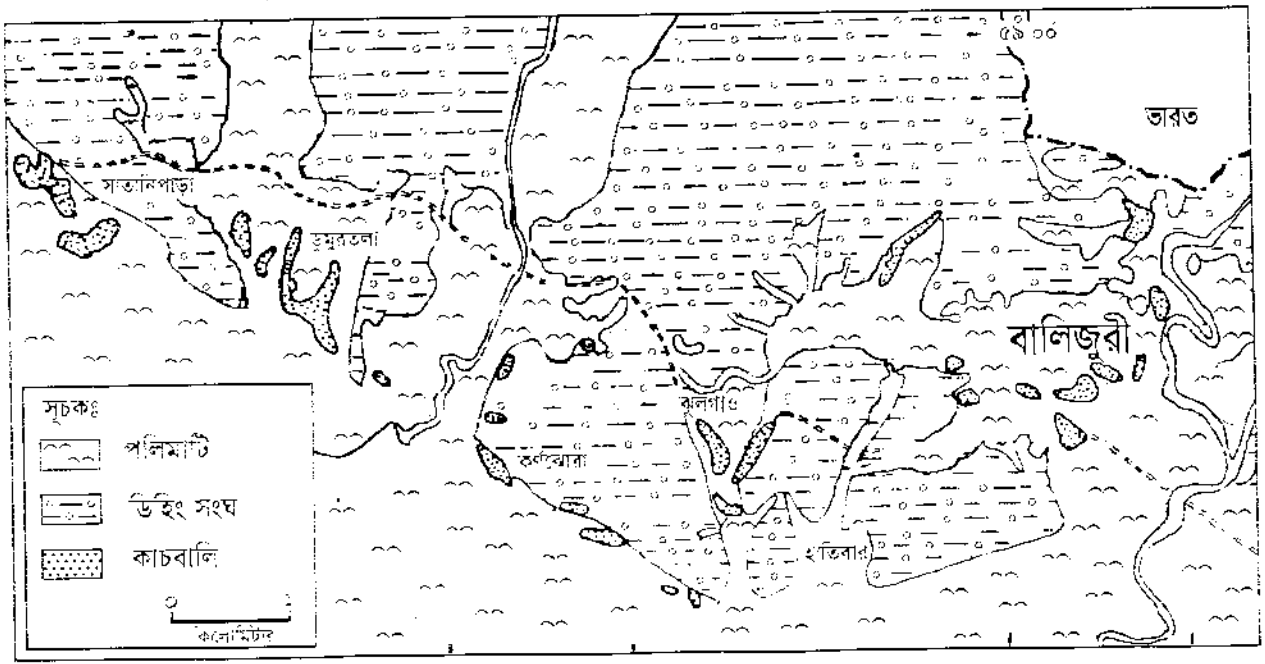

চিত্র ৯.১ : শেরপুর জেলায় বালিজুরী এলাকায় কাচবালির মজুতসমূহ (সূত্র: ইসলাম ১৯৮৫)।

পুরুত্ব ০.১৫ মিটার থেকে ২.১৩ মিটার পর্যন্ত এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে এগুলোর গভীরতা ০.১৫ মিটার থেকে ২.৪৪ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। এই কাচবালি হালকা হলদে বা হালকা ধূসর রঙের, মিহি থেকে মধ্যম দানাদার (fine to medium grained) বালি কণা দিয়ে গঠিত এবং এদের মধ্যে সিল্ট (silt) ও কাদা কণার (clay) পরিমাণ ৬.৪২% থেকে ১৯.৪৫%। অবশ্য কাচবালি পানি দিয়ে ধৌত করলে সিল্ট ও কাদা কণার

সারণি ২৯ ঃ বালিজুরী এলাকার স্তরক্রমবিন্যাস (সূত্র : ইসলাম ১৯৮৫)।

উপযুগ	সংঘ (পুরুত্ব মিটারে)	শিলা লক্ষণ
আধুনিক	উর্দ্ধ অংশ (০.১৫ ২.৫৯)	সিল্টযুক্ত কাদা ও বালুময় কাদা
	পলিমাটি মধ্য অংশ (০-২.১৩)	কাদাময় বালু এবং বালু, কিছু কাচবালু
	নিম্ন অংশ (০.১৫-১.৮৩)	কাদা ও বালুময় কাদা
প্লায়োসিন	ডিহিং (?) / ডুপিটিলা (?)	নরম বেলেপাথর ও নুড়িময় বেলেপাথর কিছু কাদা শিলা

পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ০.১৪% থেকে ৪.৪% পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই কাচবালির রাসায়নিক বিশ্লেষণে এতে ৮৩.৭৭% থেকে ৯৩.৭৯% সিলিকা এবং ০.৩৬% থেকে ১.৮৬% আয়রন অক্সাইড পাওয়া যায়। সাধারণভাবে পানি দিয়ে ধৌত করলে কাচবালিতে সিলিকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯.০৩% থেকে ৯৭.১৬% এবং আয়রন অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ০.১১% থেকে ০.৪১% পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বালিজুরী এলাকায় প্রাপ্ত ৩০টি লেন্স বা স্তরে কাচবালির মোট মজুতের পরিমাণ প্রায় ০.৬৪ মিলিয়ন টন।

(খ) শাহজীবাজারের কাচবালি ঃ হবিগঞ্জ জেলার শাহজীবাজার এলাকায় রঘুনন্দ পাহাড়ের পশ্চিম পাদদেশ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে ১৫ কিলোমিটার লম্বা ও ০.৫ থেকে ১ কিলোমিটার চওড়া সমতল এলাকায় কাচবালির সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাচবালি ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ কর্তৃক পঞ্চাশ দশকে আবিষ্কৃত হয় ও পরবর্তীকালে ১৯৭২-৭৫ সময়ে এস্থানে বিস্তারিত জরিপ চালানো হয়।

শাহজীবাজার এলাকায় কাচবালি হালকা হলদে থেকে হালকা ধূসর সাদা রঙের এবং মধ্যম থেকে মিহি দানাদার কণাবহুল। এর রাসায়নিক বিশ্লেষণে এতে সিলিকা ৯৫.৯৫% থেকে ৯৬.৪০% পর্যন্ত এবং আয়রন অক্সাইড ০.১% বা তার কিছু বেশি পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সাধারণভাবে পানি দিয়ে ধৌত করলে এই কাচবালির মান অধিকতর উন্নত হয়ে থাকে।

এখানে কাচবালির মজুতসমূহ আধুনিক পাদদেশীয় পলির মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অনিয়মিত স্তর ও লেন্স আকারে ভূপৃষ্ঠ থেকে ০.১৫ মিটার থেকে ১.২০ মিটার গভীরতার মধ্যে বিরাজ করে। এ পর্যন্ত এ এলাকায় ৩৬টি কাচবালির লেন্স পাওয়া যায় এবং এদের পুরুত্ব ০.১৫ মিটার থেকে ১ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। এ লেন্স বা স্তরসমূহ আকারে বিভিন্ন রকম, তথা একেকটিতে কাচবালির পরিমাণ ১০০০ টন থেকে ২০০,০০০ টন পর্যন্ত। শাহজীবাজার এলাকায় কাচবালির মোট মজুত প্রায় ১.৪১ মিলিয়ন টন।

(গ) **চৌদ্দগ্রামের কাচবালি ঃ** কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানায় ১৯৬৮ সনে কাচবালির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৭২-৭৪ সময়ে এই এলাকায় বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক জরিপ সম্পন্ন করা হয়। এখানে উত্তরে নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণে দত্তাসার নামক স্থান পর্যন্ত ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী ১৬ কিলোমিটার লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ০.৫ থেকে ১.৫ কিলোমিটার চওড়া এলাকা বরাবর আধুনিক যুগের পাদদেশীয় পলির মধ্যে কাচবালির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই কাচবালি বিক্ষিপ্তভাবে অনিয়মিত স্তর ও লেন্স আকারে বিরাজ করে। এই লেন্স বা স্তরসমূহের ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা ০.৫ মিটার থেকে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত এবং এদের পুরুত্ব ০.১৫ মিটার থেকে ১.৭ মিটার পর্যন্ত (ইসলাম ১৯৮৬)।

সারণি ৩০ ঃ বাংলাদেশে কাঁচবালি উৎপাদন (সূত্র ঃ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো)।

সাল	উৎপাদন (ঘনমিটার)
১৯৮৯	১৫৪,৩০০
১৯৯০	১৩২,২৫০
১৯৯১	১১৫,৮৯০
১৯৯২	৮৫,৪৮৫
১৯৯৩	৫১,৪৫০
১৯৯৪	৫২,১৩০
১৯৯৫	৫৫,২৭০

এই কাচবালি সাদা থেকে হলদেটে সাদা, মিহি থেকে মধ্যম দানাদার। রাসায়নিক বিশ্লেষণে কাচবালিতে ৯১.৪৮% থেকে ৯৭.৮৬% সিলিকা এবং ০.০৬% থেকে ০.৭২% আয়রন অক্সাইড পাওয়া যায়। পানি দিয়ে ধুয়ে এই কাচবালি অধিকতর বিশুদ্ধ করা যায়।

চৌদ্দগ্রাম এলাকায় মোট ৩৪টি কাচবালির লেন্স বা স্তর পাওয়া যায়, যেগুলো আকারে ৪১৪ ঘনমিটার থেকে ২৪,২৯০ ঘনমিটার পর্যন্ত বড়। এখানে কাচবালির মোট মজুত প্রায় ০.২৮ মিলিয়ন টন।

৯.২.২ উত্তরবঙ্গে ভূগর্ভস্থ প্রাচীন কাচবালি ঃ দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দিনাজপুর জেলায় খননকৃত কূপে প্রাচীন শিলায় কাচবালির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে ভূতাত্ত্বিকভাবে পরিচিত রংপুর স্যাডল অঞ্চলে মধ্যপাড়া এলাকায় তুলনামূলকভাবে স্বল্প গভীরতায় কেলাসিত ভিত শিলা তথা কঠিন শিলায় মজুত এবং পার্শ্ববর্তী বড়পুকুরিয়া এলাকায় গন্ডোয়ানা বেসিনে কয়লার আবিষ্কার ও খনন প্রকল্প সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (ষষ্ঠ এবং চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। উভয় স্থানেই খননকৃত কূপে ভূগর্ভে কাচবালির সন্ধান পাওয়া যায়।

(ক) মধ্যপাড়ার কাচবালি ঃ ১৯৭৪ সনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১২৮ মিটার গভীরে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কেলাসিত ভিত শিলা আবিষ্কারের পর সেখানে বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালানো হয়। এই কেলাসিত ভিত শিলা উপরের কিছু অংশ ক্ষয় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে চীনামাটির স্তরের সৃষ্টি করেছে। এই চীনামাটির স্তরের উপরে কাচবালির স্তরের লক্ষ্য করা যায়। এই এলাকায় কাচবালির স্তরের গভীরতা ভূপৃষ্ঠের নিচে ১১০ মিটার থেকে ১৩০ মিটার। এ কাচবালির স্তরের পুরুত্ব ৬ মিটার থেকে ১৪ মিটার এবং গড়ে ৯.৭ মিটার। এ কাচবালি সাদা রঙের এবং এতে সিলিকার পরিমাণ ৯৭.০৪% থেকে ৯৭.৩১% ভাগ। মধ্যপাড়ায় এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় কাচবালির মজুত প্রায় ১৭.২৫ মিলিয়ন টন বলে হিসাব করা হয়েছে (রহমান ১৯৯৫)।

(খ) বড়পুকুরিয়ার কাচবালি ঃ ১৯৮৫ সনে দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়া নামক স্থানে গন্ডোয়ানা বেসিনে পারমিয়ান যুগের কয়লাস্তর আবিষ্কারের পর সেখানে বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও খনন প্রকল্প পরিচালিত হয়। এই কয়লাবাহী শিলাস্তরের উপরে কাচবালির স্তর লক্ষ্য করা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে এই কাচবালি স্তরের গভীরতা ১১৮ মিটার থেকে ১৮০ মিটার। এই কাচবালি স্তরের সর্বোচ্চ পুরুত্ব ৪০ মিটার ও সর্বনিম্ন পুরুত্ব ১৬ মিটার এবং গড়ে তা ২২ মিটার বলে লক্ষ্য করা যায়। এই কাচবালিতে সিলিকার পরিমাণ ৮০.৫০% ভাগ থেকে ৯৭.২৫% ভাগ পর্যন্ত। বড়পুকুরিয়ায় এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় এই কাচবালির মজুত প্রায় ৯০ মিলিয়ন টন (রহমান ১৯৯৫)।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বড়পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে একটি ভূগর্ভস্থ খনি (underground mine) স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই প্রকল্পে কয়লাস্তরের উপরে অবস্থিত কাচবালি উত্তোলনের কোন পরিকল্পনা নেই। ভূগর্ভস্থ কয়লা খনির পরিবর্তে উন্মুক্ত কয়লাখনি (open pit coal mine) স্থাপন করা গেলে কয়লা এবং কাচবালি উভয়ই খনন ও উত্তোলন করা সম্ভব হতো।

দশম অধ্যায়

ধাতব খনিজ

(Metallic Mineral)

১০.১ ভূমিকা

লোহা, তামা, সীসা, রুপা, সোনা, দস্তা ইত্যাদি ধাতব পদার্থের আকরিকসমূহ (metallic ore) তাদের উৎপত্তিগত কারণে সাধারণত কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত ভিত শিলার (crystalline igneous and metamorphic basement) ভিতর জমা হয়ে থাকে। তাই পৃথিবীর শিল্ড এলাকাসমূহে (shield area) যেখানে ভিত শিলা ভূপৃষ্ঠে বা স্বল্প গভীরতায় অবস্থান করে সেখানে ধাতব খনিজ পদার্থের বিশাল মজুতের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে ভূতাত্ত্বিকভাবে পরিচিত রংপুর স্যাডল এলাকায় প্রাক-ক্যামব্রিয়ান আগ্নেয় ও রূপান্তরিত ভিত শিলা স্বল্প গভীরতায় অবস্থান করে। এলাকাটি প্রাক-ক্যামব্রিয়ান প্লাটফর্মের অন্তর্ভুক্ত যদিও খান (১৯৯১) এই এলাকাটিকে বাংলাদেশের শিল্ড এলাকা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এখানে মধ্যপাড়াতে সর্ব স্বল্প গভীরতায় (১৩০ মিটার মাত্র) ভিত শিলার অবস্থান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ যেমন রানীগঞ্জ, পীরগঞ্জ, কানসাট, গাইবান্ধা স্থানসমূহেও কূপ খননের মাধ্যমে স্বল্প গভীরতায় কেলাসিত ভিত শিলার অবস্থান শনাক্ত করা হয় এবং তা থেকে শিলা নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এই সমস্ত শিলা নমুনা বিশ্লেষণ করে ভূবিজ্ঞানিগণ এই ভিত শিলার ভিতর ধাতব পদার্থের আকরিকের মজুত যেমন তামা, লোহা, সোনা ইত্যাদির বাণিজ্যিক মজুত থাকার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ভিত শিলার উপর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য এবং বিশ্লেষণ উপাত্ত অপ্রতুল এবং এর উপর ভিত্তি করে এখানে ধাতব পদার্থের অর্থনৈতিক মজুতের অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি মধ্যপাড়ায় এই কেলাসিত ভিত শিলা খনন ও উত্তোলনের জন্য যে কঠিন শিলা খনি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাতে করে ভিত শিলার ভিতর ধাতব আকরিকের (metallic ore) সম্ভাবনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত তথ্য লাভের অবকাশ রয়েছে। ভূবিজ্ঞানিগণ এই

মত প্রকাশ করেন যে এই এলাকায় ধাতব আকরিক সমাবেশের প্রয়োজনীয় ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে এবং মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনন ও উত্তোলনের কোনো এক পর্যায়ে মূল্যবান ধাতব খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত ভিত শিলার ভিতর ধাতব খনিজের সমাবেশ তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটে থাকলেও, পাললিক প্রক্রিয়ার (sedimentary process) মাধ্যমেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাললিক শিলাতেও ধাতব খনিজের বাণিজ্যিক মজুতের সমাবেশ ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পলি অবক্ষেপণ (sedimentation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট প্লেসার মজুত (placer deposit) এর ভিতর মূল্যবান ধাতব খনিজের সমাবেশ ঘটার প্রক্রিয়ার কথা এই পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরিউক্ত অধ্যায়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার-টেকনাফ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্লেসারসমূহে ভারি মণিকের মজুতসমূহ এবং তার ভিতর অবস্থিত মূল্যবান ধাতব আকরিক ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

প্লেসার শ্রেণির মজুত ছাড়াও পাললিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য ধরনের ধাতব খনিজ পদার্থের সমাবেশও ঘটতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যবান ধাতব ইউরেনিয়ামের আকরিক সৃষ্টি ও সমাবেশ ঘটে থাকার ব্যাপারে ভূবিজ্ঞানিগণ আশাপ্রদ তথ্যের সন্ধান লাভ করেছেন। সে হিসেবে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিলেট-মৌলভীবাজার জেলাসমূহে পাললিক শিলাস্তরে ইউরেনিয়াম আকরিকের (uranium ore) অর্থনৈতিক মজুত থাকার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে কয়েকটি ধাতব খনিজ আকরিক সম্পদের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

১০.২ প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলায় ধাতব খনিজের সম্ভাবনা

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ক্যাল্ক-অ্যালকালাইন ম্যাগমার (calc-alkaline magma) উৎপত্তি ও তা থেকে উদ্ভূত আগ্নেয় শিলার অবস্থানের সাথে পরফিরি তামা ও মলিবডেনাম (porphyry copper and molybdenum) ধাতব খনিজের সঞ্চয়নের (deposit) ওতপ্রোত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় (সিলিটো ১৯৭২)। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে (উত্তরবঙ্গ) ভূতাত্ত্বিকভাবে পরিচিত রংপুর স্যাডল অঞ্চলে তথা দিনাজপুর-রংপুর-রাজশাহী এলাকায় ভূপৃষ্ঠ থেকে স্বল্প গভীরতায় অবস্থিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কেলাসিত ভিত শিলার মধ্যে ক্যাল্ক-অ্যালকালাইন ম্যাগমা উদ্ভূত আগ্নেয় শিলা, যথাঃ ডায়োরাইট (diorite), গ্রানোডায়োরাইট (granodiorite), মনজোনাইট monzonite) শিলাসমূহের সন্ধান পাওয়া যায় (রহমান ১৯৭৫)। এই সমস্ত শিলায় কোনো কোনো স্থানে বিশেষ

করে ফাটল বা চ্যুতি (fracture or fault) বরাবর পরবর্তীকালে ভূগর্ভের উত্তপ্ত জলীয় দ্রবণের (hydrothermal solution) অনুপ্রবেশ ঘটে যার ফলে এ সমস্ত শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয় (রহমান ১৯৭৩, ১৯৭৫)। ভূবিজ্ঞানিদের মতে এ ধরনের উত্তপ্ত জলীয় দ্রবণ নানা ধরনের মূল্যবান মৌলিক ধাতব পদার্থসমূহ যেমন তামা, লোহা, সীসা, দস্তা, সোনা ইত্যাদি বয়ে নিয়ে আসে এবং উপযুক্ত ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে তাদের সঞ্চায়ন ঘটাতে পারে।

উত্তরবঙ্গের রংপুর স্যাডল অঞ্চলে পীরগঞ্জ এবং রানীপুকুর এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপের ফলে দুটি জোরালো চৌম্বক ও গ্রাভিটি অসামঞ্জস্যতা (magnetic and gravity anomaly) লক্ষ্য করা যায় (রহমান ১৯৭৩)। এখানে খননকৃত কূপে প্রাপ্ত আগ্নেয় ভিত শিলা বিশ্লেষণে তামার আকরিক কপার সালফাইডের তুলনামূলক আধিক্য লক্ষ্য করা গেছে। ভূবিজ্ঞানিগণ মত প্রকাশ করেন যে, এ এলাকায় কোনো স্থানে তামার আকরিক কপার সালফাইডের অর্থনৈতিক মজুত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উল্লেখিত ভূচৌম্বক ও গ্রাভিটি অসামঞ্জস্যতা সম্ভবত এ ধরনের ধাতব খনিজের মজুতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উত্তরবঙ্গে পীরগঞ্জ ও রানীপুকুর এলাকা ছাড়াও মধ্যপাড়া ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে একই ধরনের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ তথা আরো স্বল্প গভীরতায় কেলাসিত ভিত শিলা, ক্যাল্‌ক্ অ্যালকালাইন ম্যাগমা উদ্ভূদ আগ্নেয় শিলা যথা গ্রানোডায়োরাইট, ডায়োরাইট ইত্যাদির অবস্থান প্রমাণিত হয়েছে এবং এখানে একাধিক স্থানে পরবর্তীতে ভূগর্ভের উত্তপ্ত জলীয় দ্রবণ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এই শিলাসমূহের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় (রহমান ১৯৭৫)। সে হিসেবে ভূবিজ্ঞানিগণ মনে করে থাকেন যে, রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহীর অঞ্চলসমূহে আগ্নেয় ভিত শিলার ভিতর তামার আকরিক এবং সম্ভবত অন্যান্য ধাতব খনিজ যেমন লোহা, মলিবডেনাম, দস্তা, সীসা ইত্যাদি এমনকি অতি মূল্যবান সোনার সঞ্চয়নও ঘটে থাকতে পারে।

মধ্যপাড়া এলাকায় প্রাক্-ক্যামব্রিয়ান ভিতে (Precambrian basement) নাইস (gneiss) জাতীয় শিলার মধ্যে লোহার আকরিক সিডেরাইট (siderite - Fe_2CO_3) সমৃদ্ধ শিরা (vein) লক্ষ্য করা গেছে (খান ১৯৮৯, ১৯৯১)। এই শিরাসমূহ সাধারণত ০.০৫ ইঞ্চি থেকে ০.২৫ ইঞ্চি পুরু এবং এগুলো নানা দিকে বিস্তারিত হতে দেখা যায়। শিরাসমূহের ভিতর কখনও বা বাদামি রঙের গোটা সিডেরাইট স্ফটিক (crystal) লক্ষ্য করা যায়। সিডেরাইটসমৃদ্ধ শিরাসমূহে আয়রন অক্সাইডের (Fe_2O_3) পরিমাণ ৬০% থেকে ৬৩% পর্যন্ত পাওয়া গেছে। যদিও সিডেরাইটসমৃদ্ধ শিরাসমূহের বিস্তৃতি, প্রকৃতি ও বিশ্লেষণ যথার্থভাবে সম্পাদন সম্পন্ন করা হয় নি, মধ্যপাড়ায় ৪৩২০,০০০ বর্গফুট

ব্যাপী জরিপ এলাকায় সিডেরাইটের মজুত ২ মিলিয়ন টন হিসাব করা হয়েছে (খান ১৯৮৯)।

অতি সম্প্রতি রংপুর দিনাজপুর এলাকায় খননকৃত কূপসমূহ থেকে উত্তোলিত প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার রাসায়নিক বিশ্লেষণে একটি শিলা নমুনার ভিতর উল্লেখযোগ্য সোনার পরিমাণ লক্ষ্য করা গেছে। এই একটি বিশ্লেষণের ফলাফল যদিও সোনার মজুতের অবস্থান সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে পারে না, তথাপি ভূতত্ত্ববিদগণ এই বিশ্লেষণের ফলাফলকে আশাব্যঞ্জক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বস্তুত উত্তরবঙ্গের রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার উপর এ পর্যন্ত সম্পাদিত ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও বিশ্লেষণের পরিমাণ অতি অপ্রতুল। সম্প্রতি মধ্যপাড়া এলাকায় কঠিন শিলা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে এবং এর ফলে এই এলাকায় বিস্তারিত কূপ খনন, ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি কঠিন শিলা উত্তোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে এখানকার ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ইতিহাস যথাযথভাবে উন্মোচিত হতে সহায়ক হবে। অভিজ্ঞ মহল মনে করে থাকেন যে, মধ্যপাড়া এলাকায় কঠিন শিলা উত্তোলনের সাথে সাথে তার যথার্থ ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হলে ঐ এলাকায় একাধিক মূল্যবান ধাতব খনিজ আকরিকের অর্থনৈতিক মজুত খুঁজে পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

১০.৩ সিলেট এলাকায় ইউরেনিয়াম সম্ভাবনা

বিশ্বের বহু স্থানে পাললিক প্রক্রিয়া তথা মাধ্যমিক খনিজ সঞ্চয়ন (secondary mineralization) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাললিক শিলাস্তরে ইউরেনিয়াম আকরিকের (uranium ore) মজুত সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সঞ্চয়ন ঘটবার পূর্বশর্ত হিসেবে ইউরেনিয়ামের একটি প্রাথমিক উৎস প্রয়োজন যেখান থেকে তা পানি দিয়ে দ্রবীভূত হয়ে ভূগর্ভস্থ পানির সাথে বাহিত হয় এবং একটি সুবিধাজনক ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে জমা হয়ে ঘন সঞ্চয়ন ঘটায়।

ভারতের মেঘালয় প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চল বরাবর খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ি এলাকায় ক্রিটেশাস যুগের মহাদেও সংঘের (Mahadeo Formation) বেলেপাথর স্তরে এই প্রক্রিয়ায় বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম আকরিকের সঞ্চয়ন ঘটেছে (সরস্বত ১৯৭৭)। ভূতাত্ত্বিকভাবে এটি প্রমাণিত হয় যে, এই সঞ্চয়িত ইউরেনিয়ামের উৎস হলো মেঘালয় প্রদেশে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভিত শিলার মধ্যে অবস্থিত ইউরেনিয়ামবাহী গ্রানাইট শিলা যা মিলিয়েম গ্রানাইট (Mylliem granite) নামে পরিচিত।

এই গ্রানাইট শিলা থেকে ইউরেনিয়াম দ্রবীভূত (leached) হয়ে ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে দক্ষিণ দিকে বাহিত হয় এবং ভূতাত্ত্বিকভাবে সুবিধাজনক পরিবেশে তথা এক্ষেত্রে মহাদেও সংঘের বেলেপাথর স্তরের ভিতর ইউরেনিয়াম আকরিক বা মণিকের ঘন সঞ্চয়ন ঘটায়। ভূবিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করেন যে ইউরেনিয়াম বহনকারী ভূগর্ভস্থ দ্রবণ বা পানির দক্ষিণমুখী গমন কেবল খাসিয়া-জয়ন্তিয়া অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং স্বাভাবিকভাবে তা আরো দক্ষিণে বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করেছে এবং সে হিসেবে বাংলাদেশের মেঘালয় সীমান্তবর্তী এলাকায় তথা সিলেট অঞ্চলে সুবিধাজনক ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ সাপেক্ষে ইউরেনিয়াম খনিজের ঘন সঞ্চয়ন ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অধুনা বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত ইউরেনিয়াম অনুসন্ধান কার্যক্রমে উপরিউক্ত তত্ত্বের সপক্ষে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ইঙ্গিত বা চিহ্ন ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল তথা সিলেট ও মৌলভীবাজার এলাকায় বেশ কয়েকটি রেডিওমেট্রিক অসামঞ্জস্যতা (radiometric anomaly) ধরা পড়ে। এই সমস্ত রেডিওমেট্রিক অসামঞ্জস্যতা বিশেষ করে তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘ এবং ডুপিটিলা সংঘের শিলাস্তরে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিশেষ করে একটি স্থানে তথা মৌলভীবাজার জেলার ফুলতলী নামক স্থানে খুব জোরালো একটি রেডিওমেট্রিক অসামঞ্জস্যতা সন্ধান বিশেষ বিবেচনার দাবিদার। এই স্থানে গামা রে কাউন্টের (gamma ray count) মানের মাত্রা পশ্চাদভূমির (background) মানের তুলনায় ৬০ গুণ বেশি (চৌধুরী ও অন্যান্য ১৯৯১)। এ বৈষম্যটি বস্তুত হারারগঞ্জ ঊর্ধ্বভাঁজের পূর্ব অংশে উন্মোচিত তিপাম স্যান্ডস্টোন সংঘের বেলেপাথরের মধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি এই বেলেপাথরের গবেষণাগার ভিত্তিক বিশ্লেষণে এর ভিতর দুইটি ইউরেনিয়াম আকরিক তথা ইউরানোনাইট (ইউরেনিয়াম সিলিকেট) এবং থোরিয়ানাইট (ইউরেনিয়াম অক্সাইড) শনাক্ত করা হয়েছে (আখন্দ ১৯৯৫-মৌখিক যোগাযোগ; ইমাম ১৯৯৫)। এই আকরিক মণিকসমূহে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ ৪০% এবং এখানে মোট শিলা নমুনার (bulk sample) মধ্যে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ ০.১% পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান করে। যদিও ফুলতলীর এই রেডিওমেট্রিক অসামঞ্জস্যতার বিস্তৃতি খুব অল্প, ইউরেনিয়াম আকরিকের এই সন্ধান প্রমাণ করে যে, এই এলাকার শিলাসমূহে মাধ্যমিক ইউরেনিয়াম সঞ্চয়ন (secondary uranium mineralization) প্রক্রিয়া কাজ করেছে।

বাংলাদেশের সিলেট সীমান্তের উত্তরে ভারতের মেঘালয় প্রদেশে ইউরেনিয়ামবাহী গ্রানাইট শিলার অবস্থান, সেখান থেকে ইউরেনিয়ামবাহী দ্রবণের দক্ষিণমুখী গমন এবং

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের দক্ষিণ অঞ্চল বরাবর খাসিয়া-জয়ন্তিয়া এলাকায় মাধ্যমিক খনিজ সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়ামের উল্লেখযোগ্য মজুত সৃষ্টি এবং সর্বোপরি সিলেট-মৌলভীবাজার এলাকায় অনেক সংখ্যক রেডিওমেট্রিক অসামঞ্জস্যতার সন্ধান লাভ এবং এদের একটিতে ইউরেনিয়াম মণিক আকরিক শনাক্তকরণ – এ সবই এদেশে ইউরেনিয়াম মজুত আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান করে। ভূবিজ্ঞানিগণ এই মত পোষণ করেন যে, বিস্তর ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম এদেশে ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কারের সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারবে।

--

একাদশ অধ্যায়

ভূগর্ভস্থ পানি

(Ground Water)

১১.১. সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তি

ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে শিলাস্তরে ছিদ্রসমূহ প্রথমত পানি দিয়ে আংশিকভাবে এবং এক পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ থাকে। পানি দিয়ে সংপৃক্ত এই শেষোক্ত অঞ্চলকে সংপৃক্ত অঞ্চল (saturated zone) বলা হয় এবং এর উপরিতলকে ভূজলপৃষ্ঠ বা ওয়াটার টেবিল (water table) বলে। ওয়াটার টেবিলের নিচে জমে থাকা পানি ভূগর্ভস্থ পানি নামে পরিচিত। ভূগর্ভস্থ পানি একটি অতি মূল্যবান সম্পদ এবং এর উত্তোলন ও ব্যবহার বিশ্বের সর্বত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের শহর বন্দরে গৃহস্থালী ও শিল্প ক্ষেত্রে এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষি সেচ কাজ ভূগর্ভস্থ পানির উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

ভূগর্ভে ওয়াটার টেবিল সমতলে থাকে না বরং তা ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতার সাথে সমতা রেখে বন্ধুর আকারে বিরাজ করে। কখনও উপত্যকা এলাকায় ওয়াটার টেবিল ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে একটি প্রাকৃতিক ঝরনা সৃষ্টি করে। ওয়াটার টেবিল বছরের সব সময় একই তলে থাকে না বরং ভেজা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের কারণে তা উপরের দিকে উঠে আসে এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা হেতু নিচের দিকে নেমে যায়। এই তলের উপরে উঠানামার পরিমাণ নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও শিলাস্তরের প্রবেশ্যতা (permeability) মানের উপর। কমে যাওয়া পানি এভাবে পুনরায় পূর্ণ হওয়াকে রিচার্জ (recharge) বলা হয়।

যে শিলাস্তর তার ভিতর পর্যাপ্ত ছিদ্র এবং প্রবেশ্যতা মানের কারণে পর্যাপ্ত উত্তোলনযোগ্য ভূগর্ভস্থ পানি ধারণ করতে পারে তাকে অ্যাকুইফার (aquifer) বলা হয়। সাধারণত মোটা দানাদার (coarse grained) বালিস্তর বা নুড়িময় (gravelly) বালিস্তর উন্নতমানের অ্যাকুইফার সৃষ্টি করে। সন্তোষজনক অ্যাকুইফার হবার প্রধান উপাদান হিসেবে তার স্টোরেজ কোয়েফিসিয়েন্ট (storage coefficient) এবং ট্রান্সমিসিবিলিটি কোয়েফিসিয়েন্ট (transmissibility coefficient) মান বিবেচ্য হয়ে থাকে। যে শিলাস্তর প্রবেশ্যতা মানের স্বল্পতার কারণে তার ভিতর দিয়ে সহজে পানি প্রবাহ ঘটতে

দেয় না বা মোটেই দেয় না তাকে অ্যাকুইক্লুড (aquiclude) বলা হয়। কাদাশিলা স্তর একটি সাধারণ একুইক্লুড।

অ্যাকুইফার প্রধানত দুই প্রকার, যথা ঃ উন্মুক্ত বা আনকনফাইন্ড (unconfined) এবং আবদ্ধ বা কনফাইন্ড (confined)। যে অ্যাকুইফার তার উপর কোন অ্যাকুইক্লুড দ্বারা আবদ্ধ থাকে না অর্থাৎ যা পানি প্রবেশের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে তাকে আনকনফাইন্ড অ্যাকুইফার বলে। পক্ষান্তরে কোন অ্যাকুইফার তার উপরে এবং নিচে প্রবেশ্যতা নেই এরকম অ্যাকুইক্লুড দিয়ে আবদ্ধ থাকলে তাকে কনফাইন্ড অ্যাকুইফার বলা হয়। একটি কনফাইন্ড অ্যাকুইফার তার ভিতর উচ্চচাপে অবস্থিত পানি থাকার কারণে কূপ খনন করলে পানির ঝরনা সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের কূপকে আর্টেসিয়ান কূপ (artesian well) বলা হয়।

ভূগর্ভস্থ পানির প্রধান উৎস বৃষ্টিপাত (বা বরফপাত)। বৃষ্টির পানি ভূপৃষ্ঠে পতিত হবার পর আংশিকভাবে সরাসরি ভূ-অভ্যন্তরে অ্যাকুইফারে পৌঁছে, আংশিকভাবে ভূপৃষ্ঠে গড়িয়ে নদী, হ্রদ বা খাল-বিলে জমা হয় এবং ক্রমে সেখান থেকে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অ্যাকুইফারে গিয়ে পৌঁছে। বায়ুমণ্ডলে উদ্ভূত এই পানিকে মিটিয়োরিক ওয়াটার (meteoric water) বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিলাস্তর জমা হবার সময় তার সাথে যে পানি জমা হয় তাই আবদ্ধ বা ফাঁদবদ্ধ হয়ে থেকে যায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির জন্ম দেয়, যেমন সাগর তলে জমা হওয়া বালিস্তরে সাগরের লবণাক্ত পানি আবদ্ধ বা ফাঁদবদ্ধ হয়ে (trapped) ভূগর্ভস্থ পানি সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের পানিকে কনেট ওয়াটার (connate water) বলা হয়।

কোন এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক উত্তোলন ও ব্যবহার করার পূর্বশর্ত হিসেবে যে সকল প্রধান হাইড্রোলজিক্যাল (hydrological) উপাদান বিবেচ্য তা হলো ঃ

(১) অ্যাকুইফারের উপস্থিতি এবং তার সন্তোষজনক স্টোরেজ কোয়েফিসেয়েন্ট এবং ট্রান্সমিসিবিলিটি কোয়েফিসিয়েন্ট মান থাকা। (২) উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানি প্রতি বছর পুনরায় প্রাকৃতিকভাবে রিচার্জ হওয়া। অন্যথায় ভূগর্ভস্থ ওয়াটার টেবিল ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামতে থাকবে এবং কালক্রমে পানির উত্তোলনযোগ্যতা হারাতে হবে। এছাড়াও ওয়াটার টেবিল নিচে নেমে যেতে থাকলে ভূমি তলিয়ে যাওয়া (land subsidence) সমস্যার উদ্ভব হবে। (৩) ভূগর্ভস্থ পানির সন্তোষজনক গুণগত মান থাকা। পানির মান নির্ধারক উপাদানসমূহের মধ্যে তার লবণাক্ততা (salinity), কাঠিন্য (hardness), লৌহময় (iron) পদার্থ এবং বিষাক্ত (toxic) পদার্থের উপস্থিতি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। অধিক লবণাক্ত ভূগর্ভস্থ পানি যেমন একদিকে গৃহস্থালী বা কৃষি সেচ কাজে ব্যবহার উপযোগী নয়, অন্যদিকে তেমন কোনো কোনো বিষাক্ত পদার্থ যেমন আর্সেনিকের (arsenic) সামান্য উপস্থিতিই স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি ঘটাতে পারে।

১১.২ বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা নদীধারা ও বদ্বীপ গঠিত আধুনিক যুগের পলিজ সমতল (alluvial plain) দিয়ে গঠিত। কেবল পূর্বাঞ্চল বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত টারশিয়ারি যুগের পাহাড় শ্রেণি উপরিউক্ত সমতলের সীমানা নির্ধারণ করে। অবশ্য পলিজ সমতলের মধ্যবর্তী অল্প কয়েকটি স্থানে প্লেইসটোসিন টিরেস (Pleistocene terrace) নামে পরিচিত পুরাতন পলিমাটি (older alluvium) অল্প উচ্চ ভূমি সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে সমতল ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো এর উপর দিয়ে বাহিত বিশাল নদীধারার সক্রিয়তা যা এ এলাকায় আধুনিক যুগের বেশ পুরুত্বের পলিজ স্তর জমা করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে অতি অল্প ঢালু এই পলিজ তলের অর্ধেকাংশ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১২ মিটার উচ্চতার নিচে অবস্থান করে।

বাংলাদেশে বিপুল বৃষ্টিপাত এই সমতলের উপর দিয়ে বাহিত বিশাল জলধারা এবং সমভূমির নিচে অনেক পুরুত্বের আধুনিক পলিজ শিলাস্তর এদেশে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদকে বিপুলভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পুরু পলিজ শিলাস্তরে অধিক প্রবেশ্যতা (permeability) মানসম্পন্ন উন্নতমানের বালিময় ও নুড়িময় অ্যাকুইফারের উপস্থিতির ফলে এর ভিতর বিশাল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানির মজুত সৃষ্টি হয়েছে। এই মজুত প্রতি বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যার পানি প্রবাহের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে রিচার্জ হয়ে থাকে। এদেশের নদীধারার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাও ভূগর্ভস্থ অ্যাকুইফারকে রিচার্জ করতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী (tropical monsoon) জলবায়ু বিদ্যমান। এদেশে সামগ্রিকভাবে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে যদিও স্থানভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তর-পশ্চিমে রাজশাহী অঞ্চলে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৫০০ মিলিমিটার থেকে উত্তর পূর্বে সিলেট অঞ্চলে প্রতি বছর গড়ে ৪০০০ মিলিমিটারের বেশি। উপরিউক্ত বৃষ্টিপাতের ৮০% থেকে ৯০% বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে অক্টোবর এই পাঁচ মাসে ঘটে থাকে। শুষ্ক গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের অভাব ও অধিক তাপমাত্রা প্রাকৃতিকভাবে ভূগর্ভস্থ পানিস্তর অর্থাৎ ওয়াটার টেবিলের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।

ওয়াটার টেবিল শুষ্ক মৌসুম শুরু হবার পর অর্থাৎ অক্টোবরের পর থেকে নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে এবং এপ্রিল-মে মাসে সর্বনিম্ন তলে অবস্থান নেয়। এ সময় বাংলাদেশে ওয়াটার টেবিলের গভীরতা স্থানভেদে ৩ মিটার (উত্তরবঙ্গে) থেকে ১৫ মিটারেরও বেশি (ঢাকা এলাকা) হয়ে থাকে। ওয়াটার টেবিল বর্ষা মৌসুমে অর্থাৎ জুন মাস থেকে বৃষ্টিপাতের ফলে রিচার্জ হবার কারণে উপরে উঠতে থাকে এবং জুলাই মাসে সর্বোচ্চ তলে গিয়ে পৌছে। এ সময় পলিজ সমতল এলাকায় এই তল তথা পানির স্তর

প্রায় ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের নিচে স্বল্প গভীরতায় অবস্থান করে। দেশের পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি এলাকায় উপত্যকা বরাবর কোনো কোনো স্থানে আর্টেসিয়ান কূপের দেখা পাওয়া যায়।

১১.২.১. ভূগর্ভস্থ পানি এলাকার বিভাগ ঃ জোনস্ (১৯৭২) বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে প্রধান চারটি ভূগর্ভস্থ পানি এলাকায় ভাগ করেন (চিত্র-১১.১), যথা ঃ (ক) নবীন পলিজ (younger alluvium) এলাকা, (খ) পুরাতন পলিজ (older alluvium) এলাকা, (গ) সমুদ্র উপকূল (coastal) এলাকা এবং (ঘ) জটিল ভূতাত্ত্বিক (complex geology) এলাকা।

(ক) নবীন পলিজ এলাকা ঃ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীধারা ও বদ্বীপ দিয়ে গঠিত আধুনিক যুগের পলিজ সমতল এলাকা (সমুদ্র উপকূল ছাড়া) ভূগর্ভস্থ পানি উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে পরিচিত। এখানে নরম পুরু বালিস্তর ধারণকারী পলিস্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েকশত মিটার নিচ/গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ এলাকার সর্ব উত্তর-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ বৃহত্তর দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চল ভূগর্ভস্থ পানির জন্য সর্বোত্তম। এখানে পলিস্তরে তুলনামূলকভাবে মোটা বালি ও নুড়িময় বালিস্তরসমূহ যথেষ্ট প্রবেশ্যতামান ধারণ করে এবং এখানে সহজেই বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে উন্মুক্ত বা আনকনফাইন্ড (unconfined) অ্যাকুইফার সৃষ্টি করে। এ এলাকায় বহুসংখ্যক ১০০ মিটার বা তার বেশি গভীর সেচকূপ চালু করা হয়েছে এবং এগুলোর উৎপাদন বা ইল্ড (yield) ১ থেকে ৪ কিউসেক।

নবীন পলিজ এলাকার বাকি অংশে অপেক্ষাকৃত মিহি দানাদার (finer grained) বালুস্তর রয়েছে এবং তার উপর সিল্ট ও কাদাময় আবরণের পুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। অবশ্য এখানে মোট পলিজ স্তরের পুরুত্ব বেশি হবার কারণে অ্যাকুইফার হিসেবে তা সন্তোষজনক বলে বিবেচিত। এ এলাকায় সেচকূপসমূহ ৬০ থেকে ১০০ মিটারের অধিক গভীর এবং এগুলোর উৎপাদন বা ইল্ড ১ থেকে ২ কিউসেক। নবীন পলিজ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির মান ভাল এবং তা সেচকার্য, শিল্প এবং গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার উপযোগী। অবশ্য কোন কোন এলাকায় লৌহের আধিক্য লক্ষণীয় এবং অন্তত একটি এলাকায় তথা কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর - দাউদকান্দি থানা এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ত হবার কারণে ব্যবহার করার উপযোগী নয়।

(খ) পুরাতন পলিজ এলাকা ঃ প্লেইসটোসিন টিরেস (Pleistocene terrace) নামে পরিচিত ঢাকা থেকে উত্তর বরাবর মধুপুর অঞ্চল (Modhupur tract), রাজশাহীর বরেন্দ্র ভূমি (Barind tract) এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ি ভূমি (Lalmai hills) এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত (চিত্র ১১.১)। এ এলাকাসমূহ ভূ-আন্দোলনের ফলে অল্পভাবে উত্তোলিত (teetonically uplifted) যেখানে প্লেইসটোসিন উপযুগের পুরাতন পলিজ অর্থাৎ মধুপুর ক্লে সংঘ ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত (exposed)। মধুপুর ক্লে সংঘ মূলত কাদা ও

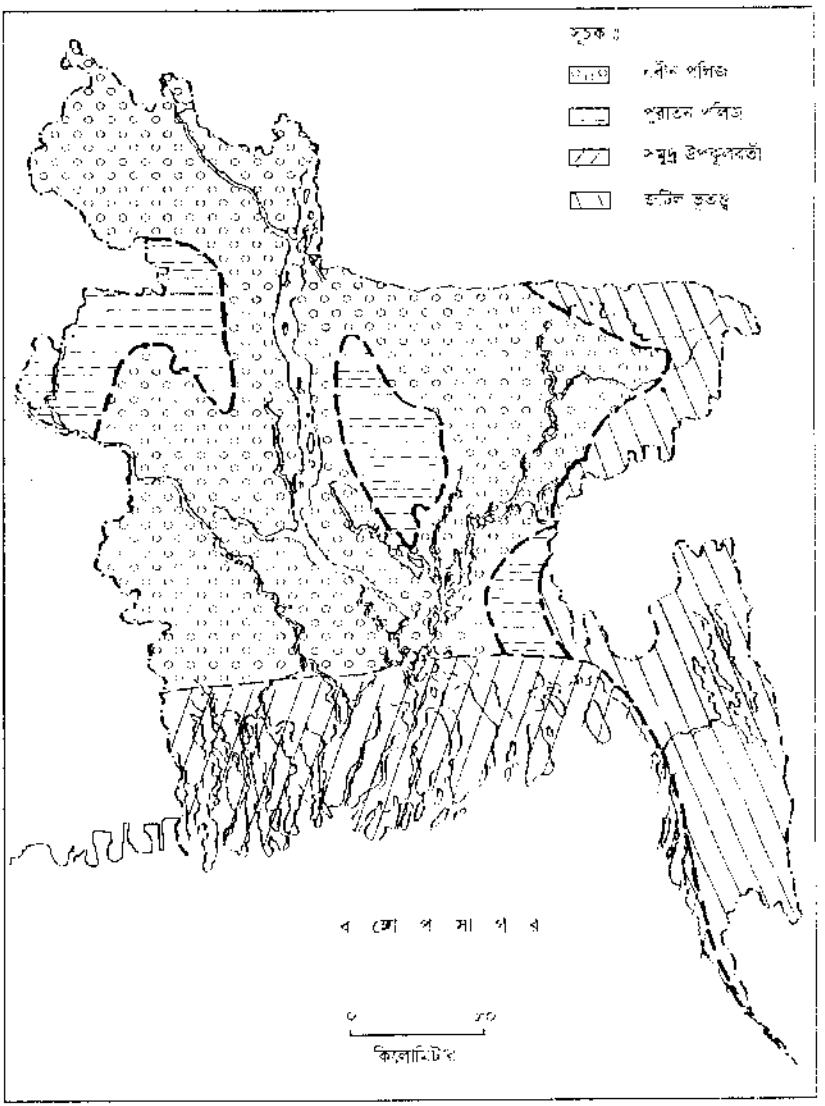

চিত্র ১১.১ ঃ বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানি এলাকার বিভাগসমূহ (সূত্র: জোন্স ১৯৭২)।

সিল্ট দিয়ে গঠিত একটি অ্যাকুইক্লুড হিসেবে এই এলাকাসমূহে আবরণ সৃষ্টি করেছে। এর পুরুত্ব ৬ মিটার থেকে ৫০ মিটারের বেশি। মধুপুর ক্লে অ্যাকুইক্লুড এর নিচে অবস্থিত প্লায়োসিন উপযুগের ডুপিটিলা সংঘের বালিস্তর এসব এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির অ্যাকুইফার গঠন করে। এই অ্যাকুইফার মোটা দানাদার বালি থেকে কোথাও নুড়িময় বালি প্রকৃতির এবং তার ভিতর যথেষ্ট ফাঁকা স্থান ও প্রবেশ্যতা মান থাকার কারণে সন্তোষজনক ভূগর্ভস্থ পানির আধার সৃষ্টি করেছে।

ঢাকা শহর এবং তার উত্তরে শিল্পনগর এলাকাসমূহে মধুপুর ক্লে অ্যাকুইক্লুডের পুরুত্ব ৮ মিটার থেকে ৪৫ মিটার এবং গড়ে ১০ মিটার। এর নিচে অবস্থিত ডুপিটিলা অ্যাকুইফার এ এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটায়। রাজশাহী এলাকায় মধুপুর ক্লে অ্যাকুইক্লুডের পুরুত্ব প্রায় ৩০ মিটার এবং এখানেও এর নিচে অবস্থিত ডুপিটিলা অ্যাকুইফার ভূগর্ভস্থ পানির মজুত ধারণ করে, তবে রাজশাহী এলাকায় বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা এবং তাপমাত্রার আধিক্য হেতু এখানে অ্যাকুইফার রিচার্জ হবার সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সেজন্য ব্যাপক ভূগর্ভস্থ পানির উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য এ এলাকা অপেক্ষাকৃত কম সন্তোষজনক।

(গ) সমুদ্র উপকূল এলাকা ঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৫% সমুদ্র উপকূল এলাকায় বসবাস করে যেখানে সাধারণভাবে পানি লবণাক্ত। এখানে সাগরের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট এই লবণাক্ততা সাধারণত অগভীর অ্যাকুইফারসমূহে প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়। তবে এ এলাকায় গভীর অ্যাকুইফারসমূহ মিঠাপানি ধারণ করে। বস্তুত উপকূলবর্তী এলাকায় ভূগর্ভস্থ অ্যাকুইফারকে অগভীর এবং গভীর এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। অগভীর অ্যাকুইফার সাধারণভাবে লবণাক্ত পানি ধারণ করে এবং তা ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। তবে এর ভিতর স্থানবিশেষে মিঠাপানি ধারণকারী ছোট অ্যাকুইফার লেন্স বা পকেট রয়েছে যা কিনা স্থানীয়ভাবে বৃষ্টি, বন্যা বা নদীর মিঠাপানির অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্টি হয়। এ সব মিঠা পানির অ্যাকুইফার লেন্স ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ২০ মিটার গভীরতার মধ্যে অবস্থান করে।

উপকূল এলাকায় মিঠাপানির প্রধান উৎস গভীর অ্যাকুইফারসমূহ যেগুলো ভূপৃষ্ঠের নিচে ২০০ মিটার থেকে ৩৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে অবস্থান করে। এই গভীর অ্যাকুইফার আবদ্ধ (confined) শ্রেণির এবং তা উপরের অগভীর অ্যাকুইফার থেকে একটি পুরু কাদা শিলাস্তরের ব্যবধানে আলাদা। এই কাদা শিলাস্তর উপরের অগভীর অ্যাকুইফারের লবণাক্ত পানির সংস্পর্শ থেকে গভীর অ্যাকুইফারের মিঠাপানির মজুতকে রক্ষা করে। গভীর অ্যাকুইফারটি উপকূলবর্তী এলাকার উত্তরে অবস্থিত অগভীর মিঠাপানি ধারণকারী এলাকা থেকে পানির দক্ষিণে নিম্নমুখী গমনের মাধ্যমে রিচার্জ হয়ে

থাকে। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, উপকূল এলাকায় সাধারণত গৃহস্থালী বা অন্যান্য কাজে পানি সরবরাহের জন্য অন্তত ২৫০ মিটার গভীর নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন।

(ঘ) জটিল ভূতাত্ত্বিক এলাকা ঃ দেশের পূর্ব সীমানা বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত টারশিয়ারি পাহাড়ি অঞ্চল অপেক্ষাকৃত পুরাতন তথা মায়োসিন-প্লায়োসিন শিলাস্তর উন্মোচিত করেছে বা ভূপৃষ্ঠের অতি নিকটে এনেছে। এখানকার ভূতাত্ত্বিক কাঠামো শিলাস্তরে ভাঁজ বা ফোল্ড (fold) সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যান্য এলাকার তুলনায় জটিলতর আকারে বিরাজমান। উপরিউক্ত ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভূগর্ভস্থ পানির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এখানে ভূগর্ভস্থ পানির অ্যাকুইফারসমূহ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মায়োসিন - প্লায়োসিন যুগের ভুবন, বোকাবিল, তিপাম ও ডুপিটিলা সংঘের বেলেপাথর স্তরে বিদ্যমান। এই এলাকায় আবদ্ধ বা কনফাইন্ড অ্যাকুইফার উপস্থিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে আর্টেসিয়ান কূপে পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ লক্ষণীয়।

১১.২.২ ভূগর্ভস্থ পানির অ্যাকুইফার বিন্যাস ঃ বাংলাদেশ তার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উন্নতমানের অ্যাকুইফার বিন্যাস লাভ করেছে। ভূগর্ভস্থ পানি জরিপের ফলশ্রুতিতে সামগ্রিকভাবে বিস্তৃত একটি অ্যাকুইফার স্তরবিন্যাস মডেল বর্ণনা করা হয়েছে যাকে মূলত তিনস্তর মডেল নামে অভিহিত করা যায় (ইউ এন ডি পি ১৯৮২)। এই অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার গভীরতার মধ্যে উপর থেকে নিচে প্রযোজ্য অ্যাকুইফার স্তরবিন্যাসটি হলো ঃ (১) ঊর্ধ্ব সিল্ট ক্লে স্তর বা আপার সিল্ট ক্লে লেয়ার (upper silt clay layer), (২) মধ্য সংমিশ্রিত অ্যাকুইফার বা মিড্‌ল্ কমপোসিট অ্যাকুইফার (middle composite layer) এবং (৩) প্রধান অ্যাকুইফার (main aquifer)।

ঊর্ধ্ব সিল্ট ক্লে স্তরটি মূলত কাদা ও সিল্টময় কাদা দিয়ে গঠিত একটি অ্যাকুইক্লুডের আবরণ হিসেবে বিদ্যমান এবং এটিকে আপার অ্যাকুইক্লুড (upper aquiclude) নামেও অভিহিত করা হয়। উত্তরে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় এর পুরুত্ব ২ মিটারের কম এবং এটি দক্ষিণ দিকে সর্বোচ্চ ১০০ মিটারেরও বেশি পুরুত্ব ধারণ করে। এই স্তরটি মধুপুর অঞ্চল, বরেন্দ্রভূমি ও লালমাই এলাকায় যথেষ্ট পুরু এবং এ অঞ্চলসমূহে তা প্লেইসটোসিন উপযুগের মধুপুর ক্লে সংঘ দিয়ে গঠিত। অন্যত্র এ স্তরটি আধুনিক উপযুগের পলিজ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্য মিশ্রিত অ্যাকুইফার (middle composite layer) মূলত মিহি থেকে খুব মিহি দানাদার (fine to very fine grained) বালিস্তর দিয়ে গঠিত। এর পুরুত্ব দেশের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় ৩ মিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৬০ মিটার ধারণ করে। যদিও এটি একটি সন্তোষজনক অ্যাকুইফার, অতি মিহি

দানাদার বালিস্তর দিয়ে গঠিত হবার কারণে কৃষি সেচ কাজে এর ব্যবহার উপযোগিতা কম। হাতে চালু নলকূপে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অবশ্য এই অ্যাকুইফার ব্যবহার উপযোগী।

আলোচিত স্তরবিন্যাসের সবচেয়ে নিচে প্রধান অ্যাকুইফারের অবস্থান। এটি মূলত মধ্যম থেকে মোটা দানাদার (medium to coarse grained) বালিস্তর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নুড়িময় বালিস্তর সমন্বয়ে গঠিত একটি অতি উন্নত মানের জলাধার। দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর) এই অ্যাকুইফারটি মূলত নুড়িস্তর ও নুড়িময় বালিস্তর দিয়ে গঠিত হবার কারণে সর্বোত্তম মানের অধিকারী। দক্ষিণে এটি অপেক্ষাকৃত ছোট দানাদার বালি দিয়ে গঠিত যদিও সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নুড়িস্তর বিদ্যমান। এই অ্যাকুইফারটির গভীরতা এর উপরে অবস্থিত মিশ্রিত অ্যাকুইফার (composite aquifer) এবং সিল্ট কাদার অ্যাকুইক্লুডের পুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। তবে সাধারণভাবে এই অ্যাকুইফারটির গভীরতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩ মিটার থেকে ১২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই অ্যাকুইফারটির নিম্নতল পর্যন্ত খনন করা হয়েছে এমন ভূগর্ভস্থ পানি কূপের সংখ্যা খুব কম, তাই এর পুরুত্ব যথার্থভাবে জানা যায় নি। তবে প্রাপ্ত জরিপের ভিত্তিতে জানা যায় যে এর পুরুত্ব ১০০ মিটারের বেশি। প্রধান অ্যাকুইফারটি ভূপৃষ্ঠের নিচে ১৫০ মিটারের অধিক গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান অ্যাকুইফারটি আনকনফাইন্ড (unconfined) বা সেমিকনফাইন্ড (semiconfined) শ্রেণিভুক্ত। এর ট্রান্সমিসিবিলিটি মান অতি উত্তম এবং এটি ব্যাপকভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও উন্নয়নের উপযোগী।

১১.২.৩ ভূগর্ভস্থ পানির মান ঃ বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানি সাধারণভাবে ভাল মানসম্পন্ন এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী। তবে দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে এবং ভূখণ্ডের কোনো কোনো এলাকায় অত্যধিক লবণাক্ততা বা লৌহময় পদার্থের আধিক্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। অধুনা এদেশের কিছু এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে বিষাক্ত আর্সেনিক পদার্থের উপস্থিতির সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে এবং বিষয়টি পানি বিশারদগণের জরুরি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অগভীর অ্যাকুইফারসমূহ সাধারণত সাগরের লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে প্রভাবিত। এখানে কেবল বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ছোট মিঠাপানির অ্যাকুইফার লেন্স বা পকেট ছাড়া অগভীর অ্যাকুইফারের পানি লবণাক্ততার কারণে ব্যবহার উপযোগী নয়। তবে এ অঞ্চলে গভীর তথা ২০০ থেকে ৩৫০ মিটার গভীরে অ্যাকুইফারসমূহ মিঠাপানি ধারণ করে। সমুদ্র উপকূল থেকে ভূখণ্ডের দিকে লবণাক্ত পানির সীমানা (salinity front) উত্তর দিক থেকে মিঠাপানির অনুপ্রবেশ বা রিচার্জের

মাত্রার উপর নির্ভরশীল। বিগত বছরগুলোর পর্যবেক্ষণে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে উত্তরে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহের মাত্রা কমে যাওয়ার ফলে মিঠাপানির দক্ষিণমুখী অনুপ্রবেশের মাত্রাও ক্ষীণতর হয়ে পড়ে এবং এর ফলে উপকূল এলাকা থেকে লবণাক্ত পানির সীমানা উত্তর দিকে ক্রমে এগিয়ে যায়।

সমুদ্র উপকূল থেকে দূরবর্তী এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার সমস্যা ব্যতিক্রমধর্মী ও অপ্রত্যাশিত হলেও, বাংলাদেশে এরকম কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্ত ও স্থানীয়ভাবে ভূগর্ভস্থ পানিতে অধিক লবণাক্ততা লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর, দাউদকান্দি এবং বাঞ্ছারামপুর থানা এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার আধিক্য উল্লেখযোগ্য। এখানে ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে তা সেচকাজে ব্যবহার করা যায় না। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে এ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার কারণ সমুদ্র থেকে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ নয় বরং এই লবণাক্ত পানি আদি (original) সমুদ্র বা নদী মোহনার কনেট ওয়াটার (connate water) যা অ্যাকুইফারটি জমা হবার সময় তার সাথে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানিতে লৌহের পরিমাণ চিহ্নমাত্রা থেকে উর্ধ্বে ১০ মিলিগ্রাম/লিটার পর্যন্ত। এই শেষোক্ত উচ্চমাত্রার লৌহময় পানির এলাকা হিসেবে ব্রহ্মপুত্র নদী বরাবর বিস্তৃত এলাকা চিহ্নিত। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব সিলেট অঞ্চল, খুলনা ও বরিশালের কিছু কিছু এলাকাতেও ভূগর্ভস্থ পানিতে উল্লেখযোগ্য লৌহের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অবশ্য বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লৌহের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ২ মিলিগ্রাম / লিটার। এই মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত পানযোগ্য পানির লৌহমাত্রার (অনূর্ধ্ব ৫ মিলিগ্রাম / লিটার) কম। ভূগর্ভস্থ পানিতে লৌহের পরিমাণের বিভিন্নতা অ্যাকুইফারের গঠনে লৌহময় মণিক উপাদানের বিভিন্ন মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভারত সীমান্তবর্তী কিছু এলাকাতে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক পদার্থ থাকবার সম্ভাবনা অধুনা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ঐ এলাকার সীমান্তের ওপারে পশ্চিম বাংলার ছয়টি জেলা তথা চব্বিশ পরগোনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা ও বর্ধমানে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের মধ্যে আর্সেনিক দূষণের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। উক্ত এলাকাসমূহের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে এবং এই পানি ব্যবহারের ফলে আর্সেনিকজনিত বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। গবেষণাভিত্তিক জরিপে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ভূগর্ভস্থ পানিতে এই আর্সেনিকের উৎস ভূতাত্ত্বিক (খান ১৯৯৫)। ভূগর্ভে শিলাস্তরে আর্সেনিকবাহী মণিক (আর্সেনোপাইরাইট, পাইরাইট, বিয়ালগার ইত্যাদি) দ্রবীভূত হবার কারণে আর্সেনিক ভূগর্ভস্থ পানিতে পৌঁছে তা দূষিত করে। পশ্চিম বাংলার উপরিউক্ত জেলাসমূহ বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন। উভয় দেশের সীমান্ত সংলগ্ন এই এলাকাসমূহ ভূতাত্ত্বিক ও

BARCDOC Library

ভূগর্ভস্থ পানির ক্ষেত্রে একই এককের অন্তর্ভুক্ত তথা একই প্রকৃতির উপাদানধারী। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন পশ্চিম বাংলার উল্লেখিত এলাকার আর্সেনিক দূষণের কারণ সংলগ্ন বাংলাদেশ এলাকাতেও থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য বাংলাদেশে পর্যাপ্ত জরিপ ও পানি বিশ্লেষণ উপাত্তের অভাবে আর্সেনিক দূষণের সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও প্রকাশিত হয় নি। ইতোমধ্যে আর্সেনিকজনিত রোগের প্রভাব এদেশের কোনো কোনো এলাকাতে লক্ষ্য করা গেছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মত প্রকাশ করেন।

১১.২.৪ ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানি ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা প্রায় ৮৫ লক্ষ এবং তা ক্রমবর্ধমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই শহরে পানির চাহিদা ও সরবরাহ বেড়ে চলেছে : এই শহরে গৃহস্থালী ও শিল্প কারখানার কাজের জন্য ১৯৮০ সালে যেখানে ৮০ টি কূপের মাধ্যমে ১১২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি সরবরাহ করা হয় সেখানে ১৯৯০ সালে ১৩৬ টি কূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৮৩ মিলিয়ন কিউবিক মিটার (ওয়াসা ১৯৯১)। সরবরাহকৃত এই পানির মধ্যে প্রায় ৯৬% ভূগর্ভস্থ পানি এবং মাত্র প্রায় ৪% ভূপৃষ্ঠের পানি অন্তর্ভুক্ত। ভূগর্ভস্থ পানির উপর ঢাকা শহরের বিপুলভাবে নির্ভরশীলতা এখানের ভূগর্ভস্থ অ্যাকুইফার সম্পর্কে বিশদ জরিপ ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কারণ ব্যাখ্যা করে।

ভূতাত্ত্বিকভাবে ঢাকা শহর মধুপুর টিরেস বা ট্রাকের (Pleistocene terrace or tract) দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এখানে ভূপৃষ্ঠে প্লেইসটোসিন উপযুগের মধুপুর ক্লে সংঘ মূলত লালচে কাদা ও সিল্ট উপাদানে গঠিত একটি অ্যাকুইক্লুড হিসেবে তার নিচে অবস্থিত ডুপিটিলা সংঘের অ্যাকুইফারের উপর আবরণ সৃষ্টি করেছে। এখানে মধুপুর ক্লে সংঘের পুরুত্ব ৮ মিটার থেকে ৪৫ মিটার এবং গড়ে ১০ মিটার। এর নিচে প্লায়োসিন যুগের ডুপিটিলা সংঘ মূলত বালিস্তর দিয়ে গঠিত এবং এটি ঢাকা শহর এলাকার প্রধান অ্যাকুইফার। এই অ্যাকুইফারটির উপরের অংশ মূলত মিহি দানাদার (fine grained) বালুস্তর যা গড়ে প্রায় ৫০ মিটার পুরু, মধ্যম অংশ মিহি থেকে মধ্যম দানাদার বালুস্তর যা ১৫ মিটার থেকে ৮০ মিটার, গড়ে ৫০ মিটার পুরু এবং নিচের অংশ মধ্যম থেকে মোটা দানাদার বালিস্তর এবং কিছু নুড়িময় (gravelly) স্তর যা ১৫ মিটার থেকে ১২৫ মিটার, গড়ে ৭০ মিটার পুরু। এই অ্যাকুইফারটির মধ্যম ও নিম্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাদা শিলাস্তরের লেন্স রয়েছে। ডুপিটিলা অ্যাকুইফারের মোট পুরুত্ব ১০০ মিটার থেকে ২০০ মিটার, গড়ে ১৪০ মিটার। এটি উপরে মধুপুর ক্লে স্তর দিয়ে আবদ্ধ (confined)। বিগত এক দশকে ঢাকা শহরে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মিঠাতে এই অ্যাকুইফার থেকে অধিক হারে পানি উত্তোলনের ফলে অ্যাকুইফারটির পিজোমেট্রিক তল (piezometric level) প্রায় ১০ মিটার নিচে নেমে গেছে এবং এটি আদিকার

কনফাইন্ড অবস্থা থেকে আনকনফাইন্ড অবস্থায় পরিণত হয়েছে (আহমদ ও অন্যান্য ১৯৯৫)। অ্যাকুইফার টেস্ট উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে ডুপিটিলা অ্যাকুইফারের নিচের অংশটিই সর্বোত্তম। এখানে এর প্রবেশ্যতা মান প্রায় ১১ মিটার/দিন থেকে ১৮ মিটার/দিন গড়ে ১৫ মিটার/দিন। এই অ্যাকুইফার থেকে পানি উত্তোলনের জন্য ঢাকা শহরে খননকৃত পানি কূপসমূহ ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৩৫ থেকে ১৭০ মিটার গভীর পর্যন্ত খনন করা হয়।

ডুপিটিলা অ্যাকুইফারের সর্বোচ্চ ওয়াটার টেবিল মানভিত্তিক কনট্যুর (contour) ম্যাপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শহরের কেন্দ্র বা মধ্যস্থল বরাবর একটি ওয়াটার টেবিল নিম্নতল (depression) সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র ১১.৩)। ১১.৩ চিত্রে বৃহত্তর ঢাকা শহর এলাকায় ডুপিটিলা অ্যাকুইফারের ১৯৯০ সনের সর্বোচ্চ ওয়াটার টেবিল কনট্যুর দেখানো হয়েছে। এই ম্যাপ অনুযায়ী ওয়াটার টেবিল শহরের সীমানা এলাকায় ৪ মিটার গভীর থেকে শহরের কেন্দ্রস্থল বরাবর প্রায় ১৫ মিটার গভীর (গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ সাপেক্ষে)। এই চিত্র থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, শহরের সীমানা এলাকা থেকে কেন্দ্রস্থল বরাবর ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ ঘটে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মিটাতে বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলনের ফলে এখানে ওয়াটার টেবিল নিচের দিকে নেমে গেছে। বিশেষ করে শহরের কেন্দ্রস্থল বরাবর একটি ওয়াটার টেবিল নিম্নতল সৃষ্টি হবার ফলে শহরের সীমানা এলাকার তুলনায় কেন্দ্র এলাকায় ওয়াটার টেবিল অনেক নিচে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির শহর কেন্দ্রমুখী প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন উপরিউক্ত কারণসমূহে দুটি পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমত, শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিয়ত যে গৃহস্থালী ও শিল্প বর্জ্য স্তূপাকারে ফেলা হয়ে থাকে তার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন লিচেট (leachate) অর্থাৎ ক্ষতিকর পদার্থ বা যৌগ ভূগর্ভে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহের সাথে মিশে সমগ্র শহর এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত করবে (আহমেদ ও অন্যান্য ১৯৯৫)। একইভাবে, ঢাকা শহরের দক্ষিণ সীমানা বরাবর প্রবাহিত বুড়িগঙ্গার পানি গার্হস্থ্য বর্জ্য, কারখানা বর্জ্য ইত্যাদির মাধ্যমে দূষিত হয়ে পড়েছে এবং এই দূষিত পানির শহরমুখী প্রবাহ বা রিচার্জের ফলে বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী নলকূপসমূহে অধিক মাত্রায় মোট দ্রবীভূত পদার্থ (total dissolve solid) বিদ্যমান। ঢাকার দক্ষিণ অঞ্চলের নলকূপসমূহের পানিতে উত্তর অঞ্চলের নলকূপসমূহের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি মোট দ্রবীভূত পদার্থ বিদ্যমান (আহমেদ ও অন্যান্য ১৯৯৫)। দ্বিতীয়ত ওয়াটার টেবিল অধিক হারে নেমে যেতে থাকলে শহরের পৃষ্ঠতল নিচের দিকে বসে বা তলিয়ে যাবে (subside)। পৃথিবীর একাধিক শহর এলাকা অত্যধিক ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলনের ফলে নিচের দিকে বসে

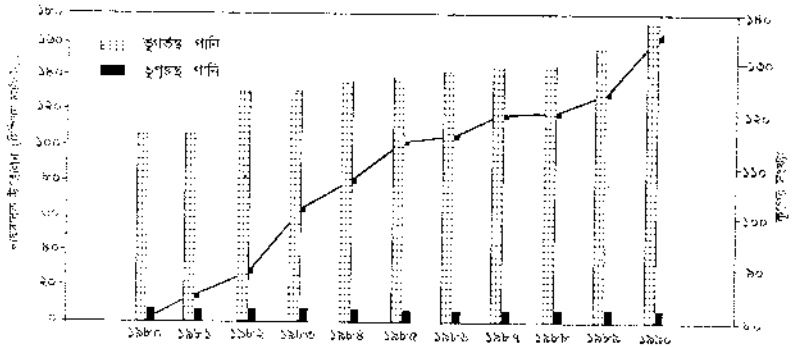

চিত্র ১১.২ ঃ ঢাকা শহরে ক্রমবর্ধমান ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন মাত্রা (সূত্র : আহমেদ ১৯৯৫)।

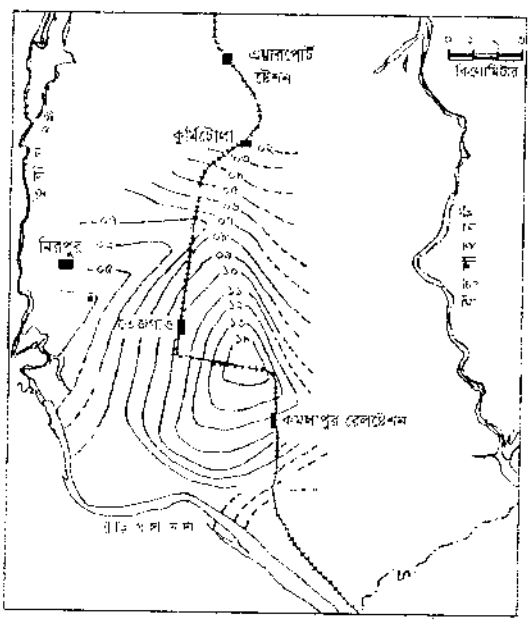

চিত্র ১১.৩ ঃ ঢাকা শহরে ১৯৯০ সালে ডুপিটিলা অ্যাকুইফারে ওয়াটার টেবিলের সর্বোচ্চ অবস্থান কনটুর (মিটারে প্রদত্ত) (সূত্র : আহমেদ ১৯৯৫)।

যাবার উদাহরণ বহন করে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান জোয়ান শহরে অত্যধিক ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ৪৫ বছরে ওয়াটার টেবিল প্রায় ৪৫ মিটার নেমে যায় এবং এর ফলে ঐ সময়ে শহর অঞ্চল এলাকা ৩ মিটার বসে যায়। একইভাবে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে অধিক হারে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে ৪০ বছরে ওয়াটার টেবিল ৪০ মিটার নেমে যায় এবং এর ফলে স্থানীয়ভাবে এই এলাকা বছরে ১৩ সেন্টিমিটার করে নিচে বসে যেতে থাকে। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাত্রা সেই পর্যায়ে রাখা বাঞ্ছনীয় যাতে উল্লেখিত পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে শহরকে মুক্ত রাখা যায়।

—

সহায়ক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ

আরেফিন,এ, হায়দার,কে.জে. এবং হোসেন,এম.এ, ১৯৯১, Haripur structure - Sylhet, seismic interpretation, Bangladesh Petroleum Institute, Report no. 11 (unpublished).

আলম,এম. এবং পিয়ারসন,এম.জে, ১৯৯০, Bicadinanes in oils from the Surma basin, Bangladesh.Organic Geochemistry, v.15, p.461-464.

আহমেদ,এম, ১৯৭৫, General Report for the year 1972 - 74. Records of the Geological Survey of Bangladesh, v.1 , pt. 1, 19 p.

আহমেদ,এম, ১৯৮০, Forward, Seminar Issue, Seminar & Exhibition, Oct.1980, Petroleum & Mineral Resources of Bangladesh, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Govt. of People's Republic of Bangladesh, p.3-5.

আহমেদ,এস.এস, পাল,টি. এবং মিত্র,এস, ১৯৯২, Ilmenite from Cox's Bazar beach sands, Bangladesh - their intergrowths, Journal of the Geological Society of India, v. 40, p. 29 - 41.

আহমেদ,কে.এম, উবাইদউল্লাহ,এ.এস.এম, এবং হাসান,এম.এ, ১৯৯৫, Hydro geo chemistry of the Dupitila aquifer of Dhaka city, Bangladesh, Acta Universitatis Carolinae Geologica, v.39, p.113-121

ইলাহী, মকবুল এ, ১৯৯৫, Coal bed methane as an alternative energy source for Bangladesh, Paper presented in the International Conference on coal bed methane development and utilization, Beijing, China, Octuber 1995.

ইউএনডিপি,১৯৮২, The hydrogeological conditions of Bangladesh, United Nation Development Programme, DP/UN/BGD-74-009.

ইমাম,এম.বি, ১৯৯০, *বাংলাদেশে তেল সম্ভাবনা ও হরিপুর তেল বিতর্ক*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

ইমাম,এম.বি, ১৯৯৫, Prospect of Uranium in Bangladesh, Daily Star, 14 Sept.1994.

ইমাম,এম.বি, এবং শ,এইচ.এফ, ১৯৮৭, Diagenetic controls of the reservoir properties of gas bearing Neogene Surma group sandstones in the Bengal Basin, Bangladesh, Marine and Petroleum Geology, v. 4, p. 103 - 111.

ইসমাইল,এম. এবং শামসুদ্দিন,এ.এইচ.এম, ১৯৯১, Organic matter maturity and its relationship with time temparature and depth in the Bengal foredeep, Bangladesh. Journal of South East Asian Earth Science, v. 5, p. 381-390

ইসলাম,এম.এন, ১৯৮৫, White clay (kaolin) deposits of Bijaipur area, Netrokona district, Bangladesh. Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 4, pt. 3., 51 p.

ইসলাম,এম.এন, ১৯৮৬, Glass sand deposits of Chauddagram area, Comilla district, Bangladesh, Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 4, pt. 5, 39 p.

ইসলাম,এম.এম, ১৯৮৫, Glass sand deposits of the Balijuri area, Sherpur district, Bangladesh. Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 3, pt. 4, 28p.

ইসলাম,এম.এন, এবং ইসলাম,এম.এস, ১৯৯৩, জ্বালানি উৎসের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার বাংলাদেশের কয়লা সম্পদ, দৈনিক দেশ।

ইসমাইল, এম, এবং শামসুদ্দিন,এ.এইচ.এম, ১৯৯১, Organic matter maturity and its relationship with time temparature and depth in the Bengal foredeep, Bangladesh, Journal of South East Asian Earth Science, v. 5, p. 381-390.

ইসলাম,কিউ, এস, এবং বাটলার,জি,এম, ১৯৮৫, The use of peat for power generation in southwestern Bangladesh. (unpublished report).

ওয়ারডেল আর্মস্টং মাইনিং কনসালট্যান্ট, ১৯৯১ Tecno-economic feasibility study of Barapukuria coal project, Dinajpur, Bangladesh v. 1 of 12, Report submitted to the Ministry of Energy & Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh.

কারি,জে.আর, ১৯৯১, Possible greenschist metamorphism of the base of a 22 km sedimentary section, Bay of Bangal, Geology, v. 19, p. 1097 - 1100.

খান,এ.এ, ১৯৯৫, Arsenic contamination in groundwater, its causes,effects and remedies --- a geological perspective, Proc. International Conference on Arsenic, Jadavpur University, Calcutta, India, February 1995.

খান,এ.এইচ., হোসেন,এম.এ. এবং হারুন,এ., ১৯৯১, Preliminary engineering calculation --- Horipur oil field, Bangladesh Petroleum Institute Report no. 10. (unpublished)

খান,এফ.এইচ, ১৯৭২, Jaipurhat limestone mining and cement project --- A must for the development of Bangladesh, Conference Issue, 1st Annual Conference, 1972, Bangladesh Geological Society, Dhaka, p. 16 - 18.

খান,এফ.এইচ, ১৯৮৯, Siderite and other minerals in Maddapara area of Dinajpur district, Bangladesh, Abstracts-Geological Conference, March 1989, Bangladesh Geological Society, p. 5.

খান,এফ.এইচ, ১৯৯১, *Geology of Bangladesh*, The University Press Ltd. 207p.

খান,এম.এ.এন, ইসমাইল,এম. এবং আহমেদ,এম, ১৯৮৮, Geology and hydrocarbon prospect of Surma basin, Bangladesh, Proc. 7th Offshore South East Asia Conference, 1988, Singapore.

খান,এম.আর. এবং মমিনুল্লাহ,এম, ১৯৮০, Stratigraphy of Bangladesh. Seminar Issue, Seminar & Exhibition,Oct 1980, Dhaka, Petroleum and mineral resources of Bangladesh, Ministry of Petroleum & Mineral Resources, Govt. of People's Republic of Bangladesh, p.35-40.

খান,এম.এ.এম এবং হোসেন,এম, ১৯৮০, Geology of Bangladesh gas fields, Proc. 3rd Offshore Southeast Asia Conference, 1980, Singapore.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৩, Petroleum Policy, 1993, Ministry of Energy and Mineral Resources, Govt. of Peoples Republic of Bangladesh.

গুহ,ডি.কে, ১৯৭৮, Tectonic framework and oil & gas prospect of Bangladesh, Proc. 4th Annual Conference, Bangladesh Geological Society, Dhaka, p. 65-75.

চৌধুরী,এম.আই, ভূইয়া,এ.ডি, এবং আহমেদ,এম, ১৯৯১, Some observations on uranium occurrence within a radiometric anomaly in Hararganj anticline, Bangladesh Journals of Geology, v.10, p. 31 - 39.

চৌধুরী,এম.আই. এবং ভূইয়া,এ.ডি, ১৯৯০, Subsurface radioactive occurrences in the Pliocene sandstone of Sylhet anticline, Bangladesh Journal of Geology, v. 9, p. 19 - 27.

জাহের,এম.এ, আলম,এম.কে, রহমান,কিউ.এম.এম. এবং চৌধুরী,এস. আই, ১৯৮৬, Subsurface geology of the limestone deposit of Jaypurhat area, Jaypurhat district, Bangladesh, Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 4, pt. 4, 23 p.

জাহের,এম.এ. এবং রহমান,এ, ১৯৮০, Prospect and investigation for minerals in the northern part of Bangladesh. Seminar Issue, Seminar & Exhibition, October 1980, Petroleum & Mineral Resources of Bangladesh, Ministry of Petroleum & Mineral Resources, Govt. of the People`s Republic of Bangladesh p. 9 - 17.

জেনসন,এম.এল. এবং বেইটম্যান,এ.এম, ১৯৮১, *Economic Mineral deposits*, John Wiley and Sons, New York.

জোনস,জে,আর, ১৯৭২, Brief summary of the hydrogeology of Bangladesh. USGS Open file Report prepared in cooperation with Ground water Circle, BWDB under the auspieces of USAID. 12 p.

নরমান,পি.এস, ১৯৯২, Evaluation of the Barapukuria coal deposit NW Bangladesh, In Annels, A.E (ed.) 1992, Case histories and methods in mineral resource evaluation, Geological Society Publication no. 63, pp. 107 - 120.

নিপ্পন কোই কনসালট্যান্ট লিঃ এবং বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট লিঃ, ১৯৯০, Report for Maddhypara Hard rock Mining Project phase 1.

নেহাল উদ্দিন,এম, এবং ইসলাম,এম.এস, ১৯৯২, Gondwana basins and their coal reserves in Bangladesh. Proc. 1st South Asian Geological Congress, Feb. 23 - 24, 1992, Islamabad, Pakistan.

পাথমার্ক এসোসিয়েট লিমিটেড, ১৯৯১, Hard rock study in Chittagong and Chittagong Hill Tracts, Final Report Submitted to Jamuna Multipurpose Bridge Authority, Govt. of the People`s Republic of Bangladesh.

পেট্রোবাংলা, ১৯৯৩, Exploration opportunity in Bangladesh. Brochure published by Petrobangla, Ministry of Energy & Mineral Resources, Govt.of the People`s Republic of Bangladesh, 40 p.

পেট্রোবাংলা, ১৯৯৪ (ক) মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন। পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য তালিকা, ২০ অক্টোবর ১৯৯৪।

পেট্রোবাংলা, ১৯৯৪ (খ) "বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন"। পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য তালিকা, ২৭ জুন ১৯৯৪

পেট্রোমিন, ১৯৯৪ Natural gas in Bangladesh --- principal energy resource focus of development, Petromin, September 1994, p. 40 - 46.

ফারুকী,এ.আর, ১৯৮৮, Uranium exploration in Bangladesh, Proceeding Technical Committee Meeting, Vienna, IAEA - TC - 543 / 22.

বাখতিন,এম.আই, ১৯৬৬, Major Tectonic features of Pakistan - part-2, The Eastern Province, Science & Industry, v. 4, p. 89 -100.

বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন, ১৯৮৩, Report on the Seminar on beach sand minerals in economic development, Beach Sand Exploitation Centre, Cox's Bazar, No. 26 - 27, 1983.

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, ১৯৯১, Beach Sand Exploitation Centre (BSEC) Cox's Bazar. Brochure, 13 p.

বিশ্বাস,এম.এ.বি, ১৯৮১, Mechanism of heavy mineral concentration in the beach sands of Cox' Bazar, Nuclear Science and Applications, v. 12 & 13, p. 74 - 83.

বিশ্বাস, এম.এ.বি, ১৯৮৩, Evaluation of scientific and technical activities of beach sand exploration centre, Cox's Bazar, Atomic Energy Commission, Report no. 1, Nov. 1983 (Unpublished)

বিশ্বাস,এম.এ.বি, ১৯৮৬, Evaluation and commercialization of beach sand minerals of Bangladesh. Bangladesh Atomic Energy Commission Report no. 2, April 1986 (Unpublished).

মাস্টার প্লান অরগানাইজেশন (এমপিও), ১৯৮৭, Technical report no.5, The groundwater resources and its availibility for development, Ministry of Irrigation Water Dev. and Flood control, Govt. of Bangladesh.

মারফি,আর.ডব্লিউ, ১৯৮৮, Bangladesh enters the oil era. Oil & Gas Journal, Feb. 24, 1988, p.76 -82.

মিত্র,এস. এবং আহমেদ,এস, ১৯৯০, Distribution and textural characteristics of the heavy minerals in the beach and dune sand of Cox's Bazar, Bangladesh, Journal of Geological Society of India, v. 36, p. 54 - 66.

রহমান,এ, ১৯৮৭, Geology of Madhyapara area, Dinajpur district, Bangladesh, Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 5, pt. 2., 60 p.

রহমান,এ. ১৯৯৪, মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা আবিষ্কার --- সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) ফিচার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দৈনিক বাংলা, ৩ রা মে, ১৯৯৪।

রহমান,এ. ১৯৯৪, বাংলাদেশে চুনাপাথর সম্ভাবনা। প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) ফিচার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দৈনিক বাংলা, ১২ই জুন, ১৯৯৪।

রহমান,এ. ১৯৯৪, Gondwana coal in Bangladesh --- from myth to reality, Press Information Department (PID) Feature, Govt. of People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Times, 3rd Nov. 1994.

রহমান,এ. ১৯৯৫, বাংলাদেশের কাচবালি। প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) ফিচার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দৈনিক বংলা, ৩ রা জানুয়ারি, ১৯৯৫।

রহমান,এ. ১৯৯৫, Gravels in Bangladesh, Press Information Department (PID) Feature, Govt. of People's Republic of Bangladesh, Observer 21 July, 1995.

রহমান,এ. ১৯৯৫, White Clay in Bangladesh, Press Information Department (PID) Feature, Govt. of People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Times, 1st December, 1995

রহমান,এইচ, ১৯৭৩, ধাতব সম্পদ সম্ভাবনায় বাংলাদেশ। সম্মেলনী সংকলন /৭৩, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতি, পৃ - ২৩ - ২৪।

রহমান,এইচ, ১৯৭৫, Plate tectonics and possible porphyry copper occurrence in Bangladesh, Conference issue/75, Third Annual Conference, Bangladesh Geological Society Dhaka, 1973, p. 15 - 19.

রহমান,এ, এবং ইসলাম,এম.এন, ১৯৮৫, Limestone deposits of Bhangerghat, Sunamganj district, Bangladesh, Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 4, pt. 2, 24 p.

রহমান,এ, এবং ইসলাম,এম.এন, ১৯৮৫, Limestone deposits of Lalghat, Sunamganj district, Bangladesh, Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 4, pt. 1, 29 p.

রহমান,এম.এম. এবং জাহের,এম.এ, ১৯৮০, Jamalganj coal, its quantity, quality and mineability, Proc. Seminar & Exhibition, Petroleum & Mineral Resources of Bangladesh, Oct. 1980, Ministry of Petroleum & Mineral Resources, Govt. of the People's Replublic of Bangladesh.

রহমান,এ, এবং মনোয়ার,এ, ১৯৮৮, Gravel deposits of Bholaganj and its adjoining areas, Sylhet district, Bangladesh, Records of the Geological Survey of Bangladesh, v. 5, pt. 4, 24 p.

রায়,এ.বি, ১৯৬০, Report on the white clay and ferruginous rocks of the Bijaipur area, Mymensingh district, Information Release no.17; Govt. of Pakistan, Bureau of Mineral Resources, Geological Survey, 19p.

রায়,এ.বি, ১৯৬৪, Gravel deposits of Patgram thana, Rangpur district,Rajshahi Division, East Pakistan, Information Release no. 18,

Govt. of Pakistan, Bureau of Mineral Resources, Geological Survey, 18p.

রেইমান,কে.ইউ, ১৯৯৩, *Geology of Bangladesh*, Gerbrides Borntraceger, Berlin, 155 p.

শামসুদ্দিন,এ.এইচ.এম. এবং খান,এম. এ, ১৯৯১ Geochemical criteria of migration of natural gases in Miocene sediments of Bengal foredeep, Bangladesh. Journal of South East Asian Earth Science, v. 5, p. 89 - 100.

শিকদার,এ.এম, হায়দার,কে,এইচ, এবং নারায়ানান,কে, ১৯৯২, Tectonic evolution of eastern folded belt of Bangladesh. Proceedings of First South Asian Geological Congress, Islamabad, Pakistan, Feb 1992.

সরস্বত,এ.সি, ঋষি,এম.কে, গুপ্ত,আর.কে. এবং ভাস্কর,ডি.ভি, ১৯৭৭, Recognition of a favourable uraniferous area in sediments of Meghalaya, India, IAEA - TC - 25 /13, p. 165 - 182

সাহা,এস.এন, রায়,এ.কে, ব্রাহ্মণ,সি.ভি, শাস্ত্রী,সি.বি এবং দে,এম.কে, ১৯৯২, Geophysical exploration for coal bearing Gondwana basins in the states of West Bengal & Bihar in NE India, Tectonophysics, v. 212, p. 171 - 192.

সিমিটার এক্সপ্লোরেশন লিমিটেড, ১৯৮৯, Surma 1A Well Report, December 1989 (unpublished).

সিলিটো,আর.এইচ, ১৯৭২, A plate tectonic model for the origin of porphyry topper deposits, Economic Geology, v. 67, p. 184 - 197.

সেন্ট্রাল মাইন প্লানিং এন্ড ডিজাইন ইন্সটিটিউট, ১৯৯১, Opencast potential of Barapukuria coal project (Bangladesh). Central Mine planning and Design Institute Ltd, Gondwana place, Rachi, India.

হিলার,কে, ১৯৮৮, On the petroleum geology of Bangladesh, Geologisches Jahrbuch Reihe D, Heft 90, p. 3 - 32.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ ঃ বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খননকৃত কূপসমূহের তালিকা (সূত্র: পেট্রোবাংলা)।

কূপ	সাল	সংস্থা	মোট গভীরতা (মিঃ)	মন্তব্য/ফলাফল
সীতাকুন্ড-১	১৯১০	আইপিপিসি	৭৬২	গ্যাসের চিহ্ন
সীতাকুন্ড-২	১৯১৪	আইপিপিসি	-	শুষ্ক কূপ
সীতাকুন্ড-৩	১৯১৪	আইপিপিসি	-	গ্যাসের চিহ্ন
সীতাকুন্ড-৪	১৯১৪	বার্মাহ্ অয়েল	১০২৪	গ্যাসের চিহ্ন
সীতাকুন্ড-৫	১৯৮৩	পেট্রোবাংলা	৪০০৫	শুষ্ক কূপ
পাথারিয়া-১	১৯২৩	বার্মাহ্ অয়েল	৮৭৫	শুষ্ক কূপ
পাথারিয়া-২	১৯৩৩	বার্মাহ্ অয়েল	১০৪৭	শুষ্ক কূপ
পাথারিয়া-৩	১৯৫১	পি পি এল	১৬৪৯	তেলের প্রবাহ
পাথারিয়া-৪	১৯৫৩	পি পি এল	৮৩০	শুষ্ক কূপ
পাথারিয়া-৫	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	৩৪৩৮	শুষ্ক কূপ
পটিয়া-১	১৯৫৩	পি পি এল	৩১০২	শুষ্ক কূপ
সিলেট-১	১৯৫৫	পি পি এল	২৩৭৯	গ্যাস প্রবাহ ও ব্লোআউ
সিলেট-২	১৯৫৬	পি পি এল	২৮১৯	পরিত্যক্ত গ্যাস কূপ
সিলেট-৩	১৯৫৭	পি পি এল	১৬৭৭	গ্যাস কূপ
সিলেট-৪	১৯৬২	পি পি এল	৩১৬	ব্লোআউট
সিলেট-৫	১৯৬৩	পি পি এল	৫৭৫	গ্যাসের চিহ্ন
সিলেট-৬	১৯৬৪	পিপিএল	১৪০৬	গ্যাস কূপ
সিলেট-৭ (হরিপুর-১)	১৯৮৬	পেট্রোবাংলা	২০৬৫	তেল কূপ
লালমাই-১	১৯৫৮	পি পি এল	২৯৯৩	শুষ্ক কূপ
লালমাই-২	১৯৬০	পি পি এল	৪১১৭	শুষ্ক কূপ
ছাতক-১	১৯৫৯	পি পি এল	২১৩৫	গ্যাস কূপ
কুচমা-১	১৯৫৯	স্ট্যানভাক	২৮৭৫	কয়লা
বগুড়া-১	১৯৬০	স্ট্যানভাক	২১৮৭	শুষ্ক কূপ
বগুড়া-২	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	২১০০	শুষ্ক কূপ
ফেঞ্চুগঞ্জ-১	১৯৬০	পি পি এল	২৪৩৮	শুষ্ক কূপ

কূপ	সাল	সংস্থা	মোট গভীরতা (মিঃ)	মন্তব্য/ফলাফল
ফেঞ্চুগঞ্জ-২	১৯৮৫	পেট্রোবাংলা	৪৮৭৭	গ্যাস কূপ
হাজিপুর-১	১৯৬০	স্ট্যানভাক	৩৮১৬	শুষ্ক কূপ
রশিদপুর-১	১৯৬০	শেল অয়েল	৩৮৬২	গ্যাস কূপ
রশিদপুর-২	১৯৬১	শেল অয়েল	৪৫৯৭	গ্যাস কূপ
রশিদপুর-৩	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	২৯৬০	গ্যাস কূপ
রশিদপুর-৪	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	২৯০২	গ্যাস কূপ
কৈলাশটিলা-১	১৯৬২	শেল অয়েল	৪১৩৯	গ্যাস কূপ
কৈলাশটিলা-২	১৯৮৮	পেট্রোবাংলা	৩২৬২	গ্যাস কূপ
কৈলাশটিলা-৩	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	৩২৯১	গ্যাস কূপ
তিতাস-১	১৯৬২	শেল অয়েল	৩৭৫৮	গ্যাস কূপ
তিতাস-২	১৯৬২	শেল অয়েল	৩২২৫	গ্যাস কূপ
তিতাস-৩	১৯৬৯	শেল অয়েল	২৮৪১	গ্যাস কূপ
তিতাস-৪	১৯৬৯	শেল অয়েল	২৮৫২	গ্যাস কূপ
তিতাস-৫	১৯৮০	পেট্রোবাংলা	৩২৯৮	গ্যাস কূপ
তিতাস-৬	১৯৮৩	পেট্রোবাংলা	৩০৭০	গ্যাস কূপ
তিতাস-৭	১৯৮৪	পেট্রোবাংলা	৩৮৯৫	গ্যাস কূপ
তিতাস-৮	১৯৮৫	পেট্রোবাংলা	৩৮৩৩	গ্যাস কূপ
তিতাস-৯	১৯৮৭	পেট্রোবাংলা	৩৫০০	গ্যাস কূপ
তিতাস-১০	১৯৮৮	পেট্রোবাংলা	৩৭০০	গ্যাস কূপ
তিতাস-১১	১৯৯০	পেট্রোবাংলা	৩১৮৮	গ্যাস কূপ
হবিগঞ্জ-১	১৯৬৩	শেল অয়েল	৩৫০৮	গ্যাস কূপ
হবিগঞ্জ-২	১৯৬৭	শেল অয়েল	১৫৫৬	গ্যাস কূপ
হবিগঞ্জ-৩	১৯৮৪	পেট্রোবাংলা	১৬১০	গ্যাস কূপ
হবিগঞ্জ-৪	১৯৮৪	পেট্রোবাংলা	১৬০০	গ্যাস কূপ
হবিগঞ্জ-৫	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	৩৫৪৫	গ্যাস কূপ
হবিগঞ্জ-৬	১৯৯০	পেট্রোবাংলা	১৬৮১	গ্যাস কূপ
জলদি-১	১৯৬৫	ওজিডিসি	২৩০০	শুষ্ক কূপ
জলদি-২	১৯৬৬	ওজিডিসি	৩৩৬০	শুষ্ক কূপ

কূপ	সাল	সংস্থা	মোট গভীরতা (মিঃ)	মন্তব্য/ফলাফল
জলদি-৩	১৯৬৮	ওজিডিসি	৪৫০০	শুষ্ক কূপ
কক্সবাজার-১	১৯৬৯	শেল অয়েল	৩৬৯৮	শুষ্ক কূপ
সেমুতাং-১	১৯৬৯	ওজিডিসি	৪০৯১	গ্যাস কূপ
সেমুতাং-২	১৯৭০	ওজিডিসি	১৫৩৬	গ্যাস কূপ
সেমুতাং-৩	১৯৭০	ওজিডিসি	১৫৫৩	গ্যাস কূপ
সেমুতাং-৪	১৯৭০	ওজিডিসি	১৪৬৫	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-১	১৯৬৯	শেল অয়েল	২৮৩৮	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-২	১৯৮১	পেট্রোবাংলা	২৬০৮	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-৩	১৯৮১	পেট্রোবাংলা	২৮৪৮	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-৪	১৯৮২	পেট্রোবাংলা	২৮৭৪	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-৫	১৯৮২	পেট্রোবাংলা	২৯৪৯	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-৬	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	২৬৬০	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-৭	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	২৬২২	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-৮	১৯৮৯	পেট্রোবাংলা	২৬৯৪	গ্যাস কূপ
বেগমগঞ্জ-১	১৯৭৬	পেট্রোবাংলা	৩৬৫৬	গ্যাস কূপ
বেগমগঞ্জ-২	১৯৭৮	পেট্রোবাংলা	৩৫৮০	শুষ্ক কূপ
মূলাদি-১	১৯৭৫	পেট্রোবাংলা	৪৭৩৫	শুষ্ক কূপ
মূলাদি-২	১৯৭৯	পেট্রোবাংলা	৪৫৫৬	শুষ্ক কূপ
বিওডিসি-১	১৯৭৬	বিওডিসি	৪৫৯৮	শুষ্ক কূপ
বিওডিসি-২	১৯৭৬	বিওডিসি	৪৪৩৬	শুষ্ক কূপ
বিওডিসি-৩	১৯৭৮	বিওডিসি	৪৪৮৮	শুষ্ক কূপ
আরকো-১	১৯৭৬	আরকো	৩৯০৩	শুষ্ক কূপ
বিনা-১	১৯৭৬	ইনা নাপ্তাপ্রিন	৪০৯৫	শুষ্ক কূপ
বিনা-২	১৯৭৭	ইনা নাপ্তাপ্রিন	৪২৯৪	শুষ্ক কূপ
কুতুবদিয়া-১	১৯৭৭	ইউনিয়ান অয়েল	৩৫০৮	গ্যাস কূপ
ফেনী-১	১৯৮১	পেট্রোবাংলা	৩২০০	গ্যাস কূপ
সিংড়া-১	১৯৮১	পেট্রোবাংলা	৪১০০	শুষ্ক কূপ
বিয়ানীবাজার-১	১৯৮১	পেট্রোবাংলা	৪১০৯	গ্যাস কূপ

কূপ	সাল	সংস্থা	মোট গভীরতা (মিঃ)	মন্তব্য/ফলাফল
বিয়ানীবাজার-২	১৯৮৮	পেট্রোবাংলা	৩৬৭৩	গ্যাস কূপ
কামতা-১	১৯৮২	পেট্রোবাংলা	৩৬১৪	গ্যাস কূপ
আটগ্রাম-১	১৯৮২	পেট্রোবাংলা	৪৯৬১	শুষ্ক কূপ
সালবনহাট এ	১৯৮৮	শেল অয়েল	২৫১৮	শুষ্ক কূপ
সীতাপাহাড়-১	১৯৮৮	শেল অয়েল	২৬১	শুষ্ক কূপ
সীতাপাহাড়-২	১৯৮৮	শেল অয়েল	১৫৬০	শুষ্ক কূপ
সুরমা-১/১এ	১৯৮৯	সিমিটার	২৪৯৭	তেলের চিহ্ন
জালালাবাদ-১	১৯৮৯	সিমিটার	২৬২৬	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-৯ (মেঘনা-১)	১৯৯০	পেট্রোবাংলা	৩০৬৯	গ্যাস কূপ
বাখরাবাদ-১০ (বেলাবো)	১৯৯০	পেট্রোবাংলা	৩৫৬০	গ্যাস কূপ
শাহবাজপুর	১৯৯৫	বাপেক্স	৩৬৫০	গ্যাস কূপ
সাংগু-১	১৯৯৬	কেয়ার্ন	৩৫০০	গ্যাস কূপ
সাংগু-২	১৯৯৬	কেয়ার্ন	৩৯৮০	গ্যাস কূপ

পরিশিষ্ট ২ ঃ উত্তরবঙ্গে (প্রাক-ক্যামব্রিয়ান প্লাটফর্ম) খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের জন্য খননকৃত কূপসমূহের তালিকা (সূত্র: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ)।

কূপ	স্থান	সাল	সংস্থা	গভীরতা(মিঃ)	ফলাফল
ইডিএইচ-১	কানসাট	১৯৬১	জিএসবি	৮৯৯	
ইডিএইচ-২	কানসাট	১৯৬২	জিএসবি	৭৮৭	
ইডিএইচ-৩	দুর্গাদহ	১৯৬২	জিএসবি	৬৯১	চুনাপাথর
ইডিএইচ-৪	খঞ্জনপুর	১৯৬২	জিএসবি	৬০৯	চুনাপাথর
ইডিএইচ-৫	গোলাপভিটা	১৯৬৩	জিএসবি	১১১৬	চুনাপাথর
ইডিএইচ-৬	চককামাল	১৯৬৩	জিএসবি	১১১৮	চুনাপাথর
ইডিএইচ-৭	ইনসিরা	১৯৬৩	জিএসবি	১০২৫	চুনাপাথর
ইডিএইচ-৮এ	বুজরাগ	১৯৬৩	জিএসবি	৫১৩	
ইডিএইচ-৮বি	বুজরাগ	১৯৬৩	জিএসবি	৯৯২	চুনাপাথর, কয়লা
ইডিএইচ-৯	তাহিরপুর	১৯৬৪	জিএসবি	৭০১	চুনাপাথর, কয়লা
ইডিএইচ-১০	রবিন্দ্রপুর	১৯৬৩	জিএসবি	৪৫৫	চুনাপাথর
ইডিএইচ-১১	পুবা	১৯৬৪	জিএসবি	১১১৭	চুনাপাথর
ইডিএইচ-১২	দুদ্রাসগ্রাম	১৯৬৪	জিএসবি	৯৪৮	চুনাপাথর, কয়লা
ইডিএইচ-১৪	জগদীশপুর	১৯৬৫	জিএসবি	১০৫১	চুনাপাথর
ইডিএইচ-১৫	মিঠাপুকুর	১৯৬৫	জিএসবি	৪৭৯	কঠিন শিলা
ইডিএইচ-১৬	চক্রিয়াখান	১৯৬৬	জিএসবি	৭৩০	চুনাপাথর
ইডিএইচ-১৭	লালপুকুর	১৯৬৬	জিএসবি	৩৩৫	কঠিন শিলা
ইডিএইচ-১৮	আমবাতি	১৯৬৮	জিএসবি	৫৩০	চুনাপাথর, চীনামাটি
ইডিএইচ-২২	আমবাতি	১৯৬৮	জিএসবি	৪৭৭	চীনামাটি
ইডিএইচ-২৩	মধ্যপাড়া	১৯৭৪	জিএসবি	১৮২	কঠিন শিলা
জিডিএইচ ২৩এ	মধ্যপাড়া	১৯৭৪	জিএসবি	১৫৮	কঠিনশিলা, চীনামাটি
জিডিএইচ-২৫	মধ্যপাড়া	১৯৭৪	জিএসবি	১৮৯	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-২৬	মধ্যপাড়া	১৯৭৪	জিএসবি	২২৩	কঠিন শিলা

কূপ	স্থান	সাল	সংস্থা	গভীরতা (মিঃ)	ফলাফল
জিডিএইচ-২৭	মধ্যপাড়া	১৯৭৫	জিএসবি	১৯০	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-২৮	বড়াইপাড়া	১৯৭৭	জিএসবি	৪৫৮	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-২৯	জয়পুরহাট	১৯৭৮	জিএসবি	৬৭০	চুনাপাথর
জিডিএইচ-৩০	জয়পুরহাট	১৯৭৮	জিএসবি	৬৪০	চুনাপাথর
জিডিএইচ-৩১	গাইবান্দা	১৯৭৯	জিএসবি	১০৭০	-
জিডিএইচ-৩২	মধ্যপাড়া	১৯৮৩	জিএসবি	১৮৩	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-৩৩	মধ্যপাড়া	১৯৮৩	জিএসবি	১৬৩	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-৩৪	মধ্যপাড়া	১৯৮৩	জিএসবি	১৫৩	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-৩৫	মধ্যপাড়া	১৯৮৩	জিএসবি	১৬৮	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-৩৬	মধ্যপাড়া	১৯৮৩	জিএসবি	১৮৯	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-৩৭	মধ্যপাড়া	১৯৮৫	জিএসবি	২৪০	কঠিন শিলা
জিডিএইচ-৩৮	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৫	জিএসবি	৫২৪	কয়লা
জিডিএইচ-৩৯	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৫	জিএসবি	৩০০	কয়লা
জিডিএইচ-৪০		১৯৮৫	জিএসবি	৬৬৪	কয়লা
জিডিএইচ-৪১	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৬	জিএসবি	৩৫৭	কয়লা
জিডিএইচ-৪২	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৬	জিএসবি	৩৬০	কয়লা
জিডিএইচ-৪৩	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৬	জিএসবি	৪৮৭	কয়লা
জিডিএইচ-৪৪	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৬	জিএসবি	২০৪	কয়লা
জিডিএইচ-৪৫	খালাশপীর	১৯৮৯	জিএসবি	১১০০	কয়লা
জিডিএইচ-৪৬	খালাশপীর	১৯৮৯	জিএসবি	৪৭৯	কয়লা
জিডিএইচ-৪৭	খালাশপীর	১৯৮৯	জিএসবি	৪৫৭	কয়লা
জিডিএইচ-৪৮	খালাশপীর	১৯৮৯	জিএসবি	৩৬৬	কয়লা
জিডিএইচ-৪৯	দীঘিপাড়া	১৯৯৫	জিএসবি	৫১০	কয়লা
জিডিএইচ-৫০	বদরগঞ্জ	১৯৯৫	জিএসবি		কয়লা
ডিওবি-১	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৯	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	৩৪৯	কয়লা
ডিওবি-২	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৯	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	৩৪০	কয়লা

কূপ	স্থান	সাল	সংস্থা	গভীরতা (মিঃ)	ফলাফল
ডিওবি-৪	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৯	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	৩৮৫	কয়লা
ডিওবি-৫	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৯	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	৩১১	কয়লা
ডিওবি-৬	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৯	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	২০৪	কয়লা
ডিওবি-৭	বড়পুকুরিয়া	১৯৯০	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	২৫৪	কয়লা
ডিওবি-৮	বড়পুকুরিয়া	১৯৯০	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	২৩০	কয়লা
ডিওবি-৯	বড়পুকুরিয়া	১৯৯০	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	৪৩৫	কয়লা
ডিওবি-১০	বড়পুকুরিয়া	১৯৯০	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	৩৪১	কয়লা
ডিওবি-১১	বড়পুকুরিয়া	১৯৯০	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	৩৮০	কয়লা
ডিওবি-১২	বড়পুকুরিয়া	১৯৯০	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	১৬০	কয়লা
ডিওবি-১৩	বড়পুকুরিয়া	১৯৯০	ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং	২১০	কয়লা
জিএসবি-নামনাম-১	মধ্যপাড়া	১৯৯৫	জিএসবি	৩০০	কঠিন শিলা
জিএসবি-নামনাম-২	মধ্যপাড়া	১৯৯৫	জিএসবি	৩৫০	কঠিন শিলা
জিএসবি-নামনাম-৩	মধ্যপাড়া	১৯৯৫	জিএসবি	৩০০	কঠিন শিলা
জিএসবি-নামনাম-৪	মধ্যপাড়া	১৯৯৫	জিএসবি	৩০০	কঠিন শিলা
জিএসবি-নামনাম-৫	মধ্যপাড়া	১৯৯৫	জিএসবি	৩০০	কঠিন শিলা

BANSDOC Library
Dhaka

পাপু
৪